শিলং-পাহাড়

"জীবন সংগ্রাম" "মানব চিত্র" "সংসার চিত্র"
"ভবরামের উইল" "আমার ভ্রমণ" "আমার
ডায়েরী" ইত্যাদি গ্রন্থ-প্রণেতা—

শ্রীযুক্ত রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত।

কলিকাতা ;
৪০ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

১৩২৬।

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

পরমারাধ্য, ব্রহ্মনিষ্ঠ, ব্রহ্মচারী শ্রীশ্রীনারদবাবা মহারাজ সরস্বতী।

উৎসর্গ পত্র।

শাস্ত্রার্থতত্ত্বদর্শী

ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রহ্মচারী হিমালয় প্রবাসী

শ্রীশ্রীনারদ বাবা মহারাজ সরস্বতী

গুরুরূপী ভগবান।

দেব! আমি আজ আমার অতি আদরের "শিলং পাহাড়" করজোড়ে নতজানু হইয়া আপনার পবিত্র পাদপদ্মে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি দিতেছি। এই শিলং-পাহাড়ের স্মৃতি আপনার চরণ যুগলের সহিত জড়িত। তাই এই ক্ষুদ্র পুষ্পাঞ্জলি আপনার পবিত্র চরণে প্রদান করিতে সাহসী হইয়াছি।

লাগিলেন,—"দেখ এই ব্যক্তি অর্থ অপহরণ করিয়াছে, কিন্তু যত টাকা দাবী দিয়াছে, এই লোকটি তত টাকা চুরী করে নাই। কয়েক সহস্র টাকা চুরী করিয়াছে, এবং সেই টাকার এক পয়সাও ইহার স্ত্রীপুত্রকে দেয় নাই। নেশার বশে মহাজনের তহবিল হইতে দৈনিক কিছু কিছু টাকা লইয়া জুয়া খেলিয়াছে—ইহার ইচ্ছা ছিল জুয়া খেলিয়া লাভবান হইয়া তহবিলের টাকা পুর্ণ করিয়া রাখিবে। কিন্তু তাহা সে পারে নাই তাহার আন্তরিক উদ্দেশ্য চুরি ছিল না।"

উপরোক্ত কথাগুলি বলিতে বলিতে, চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল; আপনি সেই দণ্ডেই কলিকাতায় দুই জন ধনী মাড়োয়ারীকে পত্র লিখাইয়া দিলেন যে, ধৃত ব্যক্তি মনিবের যাহা ন্যায্য টাকা তস্করপাত করিয়াছে, সেই টাকাগুলি ইহার মনিবকে দিয়া ইহাকে মুক্ত করিয়া দাও। ভক্ত মাড়োয়ারীদ্বয় এই আদেশ পাইবামাত্র সেইদিনেই তাহার মনিবকে টাকা দিয়া আসামীকে ছাড়াইয়া লইল। তিনদিনের দিন ঠিক সেই সময়ে—যে সময়ে সেই মাড়োয়ারীকে পুলিশ ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল, সেই সন্ধ্যার প্রাক্কালে মৃদু হাসিয়া গুরুদেব বলিলেন, সেই মাড়োয়ারী মুক্তিলাভ করিয়াছে। সে জীবনে আর এরূপ অপকর্ম্ম কখনও করিবে না।

গুরুদেবের এরূপ শত সহস্র দয়ার কথা আমার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে।

একজন ধনী মাড়োয়ারীর একটি ভৃত্য ছিল। সে ৭।৮৲ টাকা বেতনে ধনী মাড়োয়ারীর গৃহে উচ্ছিষ্ট তৈজসাদি মার্জ্জনা, গৃহাদি পরিষ্কার প্রভৃতির কার্য্য করিত। এই ভৃত্য গুরুদেবকে খুব ভক্তি ও তাঁহার সেবা করিত। এই লোকটীর প্রতি জানি না, কেন গুরুদেব প্রসন্ন হইয়া একদিন হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি চাও?"

ভৃত্য বলিল "আমি কিছু টাকা পাইলে খুব সুখী হই।" গুরুদেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন "কত টাকা চাই? লক্ষ টাকা?" ভৃত্য হর্ষোৎফুল্ল প্রাণে বলিল "লাখ টাকা হোলে আমি স্ত্রীপুত্রকে দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আপনার সঙ্গে সঙ্গে ফিরি।" গুরুদেব ভৃত্যের কথা শুনিয়া বলিলেন "আচ্ছা হো যায়ে গা।" শুনিয়াছি সেই ভৃত্য লক্ষপতি হইয়াছে। কিন্তু সে গুরুদেবের সঙ্গে যাইতে পারে নাই। সে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর দৃঢ়বন্ধনে নিজেকে সংসারের সহিত বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। হায়! অর্থের মোহ কি ভয়ঙ্কর?

এই উৎসর্গ পত্র লিখিতে বসিয়া প্রাণের আবেগে কত কথাই আজ বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। পশুর অধম হইয়া

সংসারে বিচরণ করিতেছিলাম। অবলম্বন কিছুই ছিল না—আজ আপনাকে অবলম্বন পাইয়া—আপনার পবিত্র চরণযুগলে লক্ষ্য রাখিয়া সংসারে বিচরণ করিতেছি। ইহাতে কত শান্তিই না পাইতেছি।

জানি না কেন, বাল্যকাল হইতে আমার ইচ্ছা ছিল—

এই ইচ্ছা যত বয়স বাড়িয়াছে—ততই বলবতী হইয়াছে। ইচ্ছা ছিল—

গুরু যদি করি এমন গুরু করিব, যিনি সংসার বিরাগী পর্ব্বতগুহাবাসী মহাযোগী সিদ্ধপুরুষ হইবেন। যদি এমন গুরু না পাই, তবে গুরু করিব না। ইষ্টমন্ত্র লইব না; লক্ষ্যহীন অবস্থায় পশুর মতই সংসারে বিচরণ করিয়া ইহলীলা শেষ করিব। আমার পৈত্রিক গুরু না থাকায়—অতি সুপণ্ডিত ধার্ম্মিক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ "গণেশচন্দ্র সার্ব্বভৌম" মহাশয়ের নিকট দীক্ষিত হইবার জন্য আমার গুরুজনেরা আদেশ করিয়াছিলেন।

---

* ইনি আমার পিতার গুরুদেবের জামাতা। ইনি একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন এবং হুগলী জেলায় ইঁহার নামযশ ঘরে ঘরে বিঘোষিত হইত। ইঁহার সংসারে আসক্তি শূন্যতার অনেক গল্পই এখনও লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হইতেছে। একবার দামোদরের ভীষণ বন্যায় ইঁহার

হুগলী জেলার "মলয়পুর" গ্রামে ইঁহাকে পাথেয় পাঠাইয়া দুইবার মদীয় কুটীরে আনিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলাম। তিনিও কৃপাপরবশ হইয়া এই অধমের কুটীরে পদার্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু হায়! দুইবারেই তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইতে যাইয়া মন পশ্চাতের দিকে ফিরিয়া আসিল। বারবার মন বলিতে লাগিল, ত্যাগী যোগী, সংসারাসক্তি হীন, সিদ্ধপুরুষ ভিন্ন গুরু করিব

বাসগৃহ ভাসিয়া যায়—সেই সঙ্গে ইঁহার গৃহের মূল্যবান আসবাব পত্র সমস্তই ভাসিয়া যাইতেছিল। যথাসর্ব্বস্ব ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া সার্ব্বভৌমমহাশয়ের পত্নী ব্যাকুলিত অন্তরে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। পত্নীর এই অবস্থা দেখিয়া সার্ব্বভৌম মহাশয় তাঁহাকে ডাকিয়া নিজের কাছে বসাইলেন। ২।১ কথায় তাঁহাকে প্রকৃতিস্থা করিয়া বলিতে লাগিলেন "একদিন ঐ জিনিষগুলাকে ছাড়িয়া আমাদিগকে চলিয়া যাইতে হইত। আজ তাহারাই আমাদিগকে ছাড়িয়া অগ্রে চলিয়া যাইতেছে। দুইদিনের আগুপিছু মাত্র—ইহার জন্য দুঃখ করিবার কিছুই দেখিতে পাই না।" এই বলিয়া হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন। তাহার পর পত্নীকে বলিলেন "আজ আর রন্ধনাদির স্থানও নাই ও রন্ধনোপযোগী দ্রব্যাদিও কিছু নাই; সমস্ত বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে। কোনও ঝঞ্ঝটই নাই—এস তোমাকে গীতা শুনাই।"

না। দুইবারেই গৃহ ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছিলাম। ইহার কিছুদিন পরেই সার্ব্বভৌম মহাশয় স্বর্গধামে গমন করিলেন।

দেখিতে দেখিতে আমার চল্লিশ বৎসর বয়স উত্তীর্ণ হইয়া গেল। বড়ই অশান্তিতে কাল কাটাইতে লাগিলাম। অহঃরহঃ মনে হইতে লাগিল জীবন শেষ হইয়া আসিতেছে; গুরু তো মিলিল না; বোধ হয় গুরু কৃপাহীন শুষ্কজীবন লইয়াই মরিতে হইবে।

চল্লিশের পরে আমার পৈত্রিক গুরুর জ্ঞাতি পুজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দেবশর্ম্মার নিকট দীক্ষিত হইলাম এবং তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিলাম।

ইহার কিছুদিন পরে *"তিব্বতী" বাবার নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিলাম। ইনি কৃপা করিয়া শিষ্য

---

* তিব্বতীবাবাকে কেহ কেহ "ফুঙ্গীবাবা বলে। ইনি বহুকাল তিব্বতে ছিলেন; ইঁহার বয়স ১৭০ বৎসর একশত সত্তর বৎসর এই কথা লোক মুখেই শুনিয়াছিলাম। ইঁহাকে বয়সের কথা জিজ্ঞাসা করায় ইনি সঠিক কিছু বলেন নাই বটে, তবে আমার প্রশ্নে তিনি বলিয়াছিলেন, দেড়শত বৎসর অনেক দিন অতীত হইয়াছে। ইঁহার বর্ত্তমান বয়স ১৭০ বৎসর এই কথায় আমার আর কোনও সন্দেহ

সমভিব্যাহারে একদিন আমার কুটীরে অবস্থান করিয়া আমাকে ধন্য করিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি যেন কাহার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইতে লাগিল।

ঠিক এই সময়ে আমার গৃহ-চিকিৎসক পরমবন্ধু বিডন-ষ্ট্রীটের ডাক্তার এম, এন, বোস ; এল, এম, এস নারদবাবার কথা আমাকে শুনাইলেন এবং বলিলেন "তিনি এখন হিমালয় পর্ব্বতে আছেন ; যদি কখনও নামিয়া আসেন তবে আপনাকে দর্শন করাইব। আমার পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি ফলে আমি শ্রীনারদবাবাকে গুরুরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি।"

বন্ধুবর মুক্তেশবাবুর নিকট হইতে নারদবাবার কথা শুনিয়া অবধি জানি না কেন তাঁহার জন্য প্রাণ কাঁদিতে লাগিল। "কবে কোথায় দেখা পাইব" কেবল এই কথাই মনে সর্ব্বদা উদিত হইতে লাগিল। এই ঘটনার পর প্রায় দুই বৎসর অতিবাহিত হইল। নারদবাবার দর্শন আর পাইলাম না। দুই বৎসর পরে একদিন আমি "তপোবন পাহাড়ে"

রহিল না। কোনও কোনও পুস্তকে ইঁহার সংক্ষিপ্তজীবনী বাহির হইয়াছে। তাহাতেও এই ১৭০ বৎসর বয়স বলিয়া উল্লেখ আছে। তিব্বতীবাবার সহিত কথাবার্ত্তায় বুঝিয়াছি ইঁহার সংক্ষিপ্তজীবনীতে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা মিথ্যা নহে।

বালানন্দ ব্রহ্মচারীকে * দর্শন করিবার জন্য গিয়াছিলাম। তথায় যাইয়া দেখিলাম, পূজনীয় বালানন্দ ব্রহ্মচারীর প্রধান শিষ্য "পূর্ণানন্দ স্বামী" জনৈক সন্ন্যাসীকে কথোপকথনচ্ছলে বলিতেছেন, "নারদবাবা সিদ্ধপুরুষ; তিনি এখন করণীবাগে "জহরমলে"র দ্বিতল বাটীতে অবস্থান করিতেছেন।"

যাঁহার নাম হৃদয়ে এতদিন আমি জপ করিতেছিলাম তিনি এই করণীবাগেই অবস্থান করিতেছেন, জানিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিলাম।

বালানন্দ ব্রহ্মচারীকে দর্শনান্তর তপোবনপাহাড় হইতে প্রত্যাগমন করিয়াই শ্রীশ্রীনারদবাবা কোথায় আছেন জানিবার জন্য ছুটিলাম। সেদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিলাম না। ইহার দুই দিন পরে বাবার দর্শন পাইলাম। বাবাকে দর্শন করিয়াই মনে হইল, যেন কতবার কোথায় দেখিয়াছি, বুঝি পূর্ব্বজন্মে ইঁহার দর্শনলাভ অদৃষ্টে ঘটিয়াছিল।

---

* বালানন্দ ব্রহ্মচারীর আশ্রম দেওঘর করণীবাগে। ইনি যোগ আরাধনার জন্য তপোবনপাহাড়ে সময় সময় অবস্থান করেন। তপোবনপাহাড় দেওঘর হইতে ৪ মাইল দূরে। নির্জ্জন মনোরম স্থান।

বাবা স্নেহভরে আমাকে বসিতে বলিলেন, সেই দিনেই আমি আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা বাবার চরণে নিবেদন করিলাম। সেদিন তিনি আর আমাকে কিছু বলিলেন না।

আরও দুই দিন কাতরভাবে ছলছলনত্রে বাবাকে আমার মনের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলাম। কিন্তু এই দুই দিনও বাবার নিকট হইতে কোনও উত্তর পাইলাম না। প্রাণে বড়ই আঘাত পাইলাম। মনে হইল, আমি বুঝি বাবার কৃপা লাভ করিবার যোগ্য নহি।

তৃতীয় দিবসে আবার ব্যাকুলঅন্তরে ভবজ্বালার ঔষধি প্রার্থনা করিলাম। বাবা বলিলেন, "বালানন্দ ব্রহ্মচারী মহাযোগী পুরুষ। বালানন্দব্রহ্মচারী খুব বড় সাধু। আমি তোমাকে তাঁহার কাছে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া বলিয়া দিব, তুমি তাঁহার নিকট দীক্ষিত হও।"

বাবার কথা শুনিয়া আমার মস্তক ঘুরিতে লাগিল। নিরাশা ও দুঃখে হৃদয় অধীর হইয়া উঠিতে লাগিল। হায়! আমি এতই অধম যে, বাবা আমাকে কৃপা করিলেন না। আমি অধোবদন হইয়া বসিয়া রহিলাম। পৃথিবীটা বোঁ বোঁ করিয়া যেন আমার চক্ষের সম্মুখে ঘুরিতে লাগিল।

বাবা আবার বলিলেন, "তুমি কিছু টাকা চাও?"

আমি বলিলাম "বাবা, আমি অর্থ চাহি না; সম্পদ চাহি না, পার্থিব কোন সুখের বস্তু চাহি না। আজ বহু দিন ধরিয়া আপনার চরণদর্শনের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। আমি অন্য কাহাকেও গুরু করিতে চাহি না; আমি চাই আপনাকে। কৃপা করিয়া আমাকে মুক্তির পথ দেখাইয়া দিন।"

বাবার বুঝি দয়ার উদ্রেক হইল। তিনি কেন উপরোক্ত কথাগুলি বলিয়াছিলেন, আজও তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। গুরুদেব আমাকে একটী নির্দ্দিষ্ট দিন বলিয়া দিলেন, সেই নির্দ্দিষ্টদিনে প্রত্যূষে স্নান করিয়া তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইতে হইবে, ইহাও তিনি বলিলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিন কবে আসিবে, এই চিন্তা আমি প্রতি মুহূর্ত্তে করিতে লাগিলাম। এক দিন আমার এক বৎসর মনে হইতে লাগিল। আমার আহার নিদ্রা ত্যাগ হইয়া গেল।

নির্দ্দিষ্ট দিনের তখনও দুই দিন অবশিষ্ট আছে, আমি শয্যাত্যাগ করিয়া নদীর ধারে প্রাতঃকৃত্যাদি সম্পন্ন করিতে যাইয়া রোদন করিতে লাগিলাম। প্রাণের সেই ব্যাকুলতা ভাষায় বুঝাইবার নহে। কাঁদিতে কাঁদিতে, বলিতে লাগিলাম, হায়! এখনও দুই দিন অবশিষ্ট রহিয়াছে। এই দুইদিনের

মধ্যে মৃত্যু আসিয়া আমাকে লইয়া যাইতে পারে। যদি দুই দিনের মধ্যে মৃত্যু হয়, তবে তো আর আমার নারদবাবাকে গুরুপদে বরণ করা হইল না। তবে তো আর আমি গুরুর কৃপাকণা লাভ করিতে পারিলাম না। একটী প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া আমি কাঁদিতে লাগিলাম। সমস্ত দিন কি ভাবে আমার অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহা লেখনীতে প্রকাশযোগ্য নহে।

সেই দিন অপরাহ্নে আমি নারদবাবার সমীপে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। সন্ধ্যার পর কাহারও বাবার কাছে থাকিবার আদেশ নাই। সুতরাং সূর্য্যদেব অস্তাচলে যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই অপর সকলে চলিয়া গেল। আমি একধারে ব্যাকুলঅন্তরে বসিয়া রহিলাম।

সেই শুভসন্ধ্যার শুভমুহূর্ত্ত জন্মজন্মান্তরেও ভুলিতে পারিব না। বাবা যে অন্তর্য্যামী, সকলের মনের কথাই বুঝিতে পারেন এবং তিনি যে দয়ার আধার— তাহা সেই দিনের সেই মঙ্গল সন্ধ্যায় বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলাম।

বাবা আমাকে একটী আসন দেখাইয়া দিলেন এবং বলিয়া দিলেন, যাহা তোমাকে দিলাম ইহা শয়নে, স্বপনে, প্রতি মুহূর্ত্তেই সকল সময়েই জপ করিবে।

উৎসর্গ পত্র।

হায়! বাবা আমার সাধ্য নাই যে, আপনার দয়ার কথা লেখনীতে ব্যক্ত করিতে পারি। যাঁহারা আপনার কৃপাকণা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, আপনি দয়ার সিন্ধুতুল্য।

পান, তামাক, মৎস্য, মাংস আমার অতীব প্রিয় বস্তু ছিল। তাম্রকূট একঘণ্টা সেবন না করিলে আমার অসহনীয় কষ্ট হইত। অপর্য্যাপ্ত পান খাইতাম, মৎস্য মাংস না হইলে, আহারে তৃপ্তি হইত না। এইগুলি যে আমি জীবনে কখনও ত্যাগ করিতে পারিব, ইহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। কিন্তু হায়! আশ্চর্য্য বাবার করুণা, যে বস্তুগুলি আমার জগতে প্রিয়বস্তু ছিল, জানি না কাহার প্রভাবে, কাহার ইঙ্গিতে, কাহার করুণায়, সেগুলি আমি ত্যাগ করিতে পারিয়াছি। হায়! গুরুদেবের করুণা ও ভক্তের উপর তাঁহার প্রভাবের কথা বলিতে হইলে, বৃহৎ একখানি পুস্তক হইয়া পড়ে। প্রাণের আবেগে তবুও অনেক কথাই বলিয়া ফেলিলাম।

হায় গুরুদেব! আমি আপনার কাছে বড়ই অপরাধী হইয়া রহিয়াছি। জানি না গুরুদেব! এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি? দুর্ব্বল মানব আমি। আপনার কাছে স্বীকার করিয়াও যাহা করিতে পারিতেছি না, তাহার জন্য আমাকে ক্ষমা করিও দেব!

আপনি একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন, "রামবাবু তুমি আমাকে গুরুদক্ষিণা দাও নাই; আজ গুরুদক্ষিণা দাও।"

আমি বলিলাম, "গুরুদেব! আমার কি আছে যে গুরু-দক্ষিণা দিব; অথবা আমার যাহা কিছু সবই আপনার।"

গুরুদেব বলিলেন, "তোমার ক্রোধ ও লোভ আমাকে গুরুদক্ষিণারূপে দান কর—আমি তোমার কাছে আর কিছু চাহি না। ক্রোধ ও লোভই মুক্তির পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।"

আমি বলিলাম, "আচ্ছা বাবা, আমি আপনাকে লোভ ও ক্রোধ দান করিলাম। আর আমি ইহাদিগকে আমার সঙ্গে রাখিব না।"

হায় গুরুদেব! দুই চারি দিন পালন করিয়া আমি ইহা আর পারি নাই। যে দুইটী রিপুকে আমি আপনাকে দান করিয়াছিলাম, তাহারা আবার আমার কাছে আসিয়া আমাকে ক্রীতদাস করিয়া ফেলিয়াছে। গুরু-আজ্ঞা আমি লঙ্ঘন করিয়াছি; আপনি কৃপা করিয়া আমাকে রক্ষা করুন।

আপনি বলিয়াছিলেন, "ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, তৃষ্ণার্ত্তকে জলদান; বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, সাধ্যমত এই তিনটী কার্য্য

উৎসর্গ পত্র

করিবে।" তাহাও আমি সব সময় পালন করিতে পারিতেছি কি না জানি না। আমার শক্তি কিছুই নাই গুরুদেব আমি যেন আপনার আজ্ঞাপালন করিতে পারি, এই শক্তি ও মন আমাকে প্রদান করুন

গুরুদেব! আপনি করুণার আধার, দয়ার সিন্ধু নতজানু হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে আমার অতি আদরের ও যত্নের "শিলং-পাহাড়" আপনার পবিত্রচরণে উৎসর্গ করিলাম। বারেক কৃপাদৃষ্টি করিয়া আমাকে ধন্য ও কৃতার্থ করুন। ইতি—

জন্মাষ্টমী,
১লা ভাদ্র, ১৩২৬।

কৃপাকণা প্রার্থী—
গ্রন্থকার।

"জীবন সংগ্রাম" পড়িবার ও পড়াইবার জিনিস। স্ত্রী পুত্র কন্যা ইহাদের চক্ষের সম্মুখে যদি কোনও আদর্শ স্থাপিত করিতে চান "জীবনসংগ্রাম পাঠ করিতে দিন। গৃহস্থের রমণী আদর্শ গৃহিনী হইবেন সুখ ও শান্তি সংসারে সদা বিরাজ করিবে। স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি বঙ্গভাষায় এই প্রকার পুস্তক আর বাহির হয় নাই। মূল্য ১।০ সিকা মাত্র। ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

জীবন-সংগ্রাম সম্বন্ধে সংবাদ পত্রের অভিমত।

সুপ্রসিদ্ধ দেশনেতা মাননীয় মনস্বী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত বঙ্গের শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র বেঙ্গলীতে লিখিয়াছেন ঃ—

The above is the title of a book from the pen of Babu Rampada Bandopadhya author of Manab Chitra. It is stated that the story is not a fiction, but based on real facts. The object of the author in placing this book before the public is to show how one can attain the great object of life by constantly tradıng the path of duty combating the difficuties that lie on the way. How far he has.

succeeded in his object, it is for the readers to judge. One may find in it many things instructive and interesting. It is well got up and nicely bound in cloth.

Calcutta, 20th September 1910.

বঙ্গের বিখ্যাত ইংরাজী দৈনিক "অমৃত-বাজার পত্রিকার" সুবিখ্যাত সম্পাদক জ্ঞান-বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন—

This is a story in Bengali by Babu Rampada Banerji. The book is nicely bound and is priced at Rs, 1 and annas 4 only. We are told that the story is drawn from actual life. But whether it is a fact or not, it is quite natural and life-like. The characters are deliniated in such a manner as to make them not only attractive, but highly instructive to the reader. The author himself seems to be a man of piety and has shown in his Book quite successfully how a really good man with honest intention to serve himself and others is bound to be rewarded by God with the fulfilment of his object. It is a book of

446 pages every page being replete with useful matters which every body will find both interesting and instructive. We recommend it to all house-holders, as it is book of this nature which may produce real good to society. In a short narrative which forms an off-shoot of the main story the author has held up to the gaze of the reader four brothers who shew the ideal of brotherly love in a family which was doomed but is saved by love alone. We wish the publication every success.

Calcutta, 7th August 1910.

মুসলমান সমাজের মুখপত্র দেশবিখ্যাত ইংরাজী সাপ্তাহিক "মুসলমান" ইংরাজীতে কি লিখিয়াছেন দেখুন—

This is a novel written by Babu Rampada Banerji published by Messrs Mani Lal & Co. of 40 Garanhatta Street, Calcutta. Price Re. 1-4. It purports to give a picture of the social life of the Bengalee Hindus and we have no hesitation in saying that he has spared on pains to avail himself of every

possible opportunity in making the **book up** to the mark. The book is really worth **read-ing.** The distinguishing feature of the **book** is its easy style. The printing and **got up** are all that is disirable.

Calcutta, 4th November **1910.**

কলিকাতা স্কটীশ চর্চ কলেজের অধ্যক্ষ এবং ব্রহ্মবিদ্যা প্রকাশক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম, এ, মহাশয় লিখিয়াছেন,

আমি শ্রীরামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত জীবন সংগ্রাম পাঠ করিয়া বড়ই তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ভক্ত ও ভাবুক। তিনি সে কালের বাঙ্গালার যে মনোহর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি বঙ্গবাসী মাত্রেরই ধন্যবাদার্হা। পুস্তকখানি পড়িতে পড়িতে আমি অশ্রু সংবরণ করিতে পারি নাই, কেবল মনে হইয়াছে আমরা কি ছিলাম কি হইয়াছি * * * * * *। এ দুর্দশার দিনে গ্রন্থকার আমাদের সম্মুখে সেই পুরাতন মহান আদর্শ ধরিয়া বাস্তবিকই সমাজের মহদুপকার সাধন করিয়াছেন। বর্ণিত চিত্রগুলি এতই সজীব, যে নানা অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ সত্ত্বেও সকলেই যেন প্রকৃত বলিয়া ভ্রম

হয়—বোধ হয় যেন গ্রন্থকার প্রত্যক্ষ দেখিয়া লিখিয়াছেন। * * * * আমি বঙ্গের আধুনিক শিক্ষিত সমাজের প্রত্যেক নর নারী কই এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি এবং আমার বিশ্বাস তাহাতে তাঁহাদের লাভ বই লোকসান নাই।

বিখ্যাত বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্রিকা "শ্রীশ্রী বিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার পত্রিকা" লিখিয়াছেন।

সাহিত্য সমাজে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত জীবন সংগ্রাম নামক একখানি সুন্দর পুস্তক আমরা সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত হইয়াছি। পুস্তকখানির ছাপা, কাগজ, বাইণ্ডিং অতি সুন্দর। ইহাতে গ্রন্থকারের একখানি হাফটোন ছবি আছে। আজকাল যে ধরণের নাটক নভেল বাহির হইতেছে, জীবন সংগ্রাম সে ধরণের পুস্তক নহে! ১০০ বৎসর পূর্ব্বে শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির কিরূপ অবস্থা ছিল; বাঙ্গালীর কিরূপ বলবীর্য্য, সামর্থ্য, ধর্ম্মভাব, পরোপকার প্রবৃত্তি ছিল, তাহার সুন্দর চিত্র গ্রন্থকার অঙ্কিত করিয়াছেন। পুস্তকখানি পাঠকবর্গকে একবার পাঠ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। ইহা পড়িবার জিনিস, কন্যা, ভগিনী, স্ত্রী, পুত্রকে পড়াইবার জিনিস। ইহাতে

শিক্ষার বিষয় অনেক আছে। * * * * বর্ত্তমান সময়ে রামপদ বাবু এই পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়া দেশ ও সমাজের বহু উপকার করিয়াছেন। বালক, যুবক ও তাঁহাদের অভিভাবকবর্গকে এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে আমরা বার বার অনুরোধ করিতেছি।

সুবিখ্যাত সাপ্তাহিক হিতবাদী বলেন :—

জীবন সংগ্রাম—শ্রীযুক্ত রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত মূল্য ১।০ সিকা। ইহা একখানি উপন্যাস। বেশ লেখা—লেখকের যথেষ্ট প্রতিভা আছে। * * * * জীবন সংগ্রাম খানি বালক যুবা এবং তাহাদের অভিভাবক-বর্গকে আমরা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। আমরা জানি বাঙ্গালীর এখনও মনুষ্যত্ব আছে, সুতরাং জীবন সংগ্রামের আদর হইবে এবং জীবনের উন্নতির জন্য সকলেই ইহা ক্রয় করিবেন।

হিন্দু সমাজের একমাত্র মুখপত্র প্রসিদ্ধ “বঙ্গবাসী” পত্রিকা বিস্তৃত সমালোচনায় লিখি-য়াছেন—

জীবন সংগ্রাম—মানব চিত্র প্রণেতা শ্রীযুক্ত রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত। আলোচ্য গ্রন্থখানি উপন্যাস।

বেশ তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে বাঁধান। কাগজ ছাপা সুন্দর। গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্য সাধু। নানা চিত্রে ও ভাষা ভাববৈচিত্রে হৃদয়গ্রাহী। পড়িতে পড়িতে অনেক স্থলে চক্ষে জল আইসে। * * * *

বঙ্গের একমাত্র প্রসিদ্ধ দৈনিক "নায়ক" পত্রের সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন—

জীবন সংগ্রাম উপন্যাস জাতীয় পুস্তক হইলেও ইহা ঠিক আধুনিক উপন্যাস নহে। এই পুস্তকে একশত বৎসর পূর্ব্বে আমাদের বঙ্গসমাজ কিরূপ ছিল তাহার সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে। পুস্তকে লিখিত ঘটনাবলী মনোরম চিত্তাকর্ষক পরন্তু শিক্ষাপ্রদও বটে। ভাষ সরল ও আড়ম্বর শূন্য। * ॰ *

কলিকাতার বিখ্যাত মুসলমান সাপ্তাহিক মোহাম্মদী কি লিখিয়াছেন দেখুন :—

যদিচ উপন্যাস খানিতে হিন্দু নায়ক নায়িকার চিত্রই অঙ্কিত হইয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া পুস্তকখানি মুসলমান সমাজের অপাঠ্য নহে। পুস্তকখানি পাঠ করিলে গভীর শিক্ষা লাভ করিতে পারা যায়, এইরূপ শিক্ষাপূর্ণ পুস্তকই

দেশে ও সমাজে বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। "জীবন সংগ্রাম" জীবন সংগ্রামেরই পথ প্রদর্শক। পাঠক যদি আপনার জীবন সংগ্রামে জয়লাভ করিতে ইচ্ছা হয়; একবার জীবন সংগ্রাম পাঠ করুন। পুস্তকে যেমন ভাষার লালিত্য তেমনি ভাবে পরিপূর্ণ, ছাপা এবং কাগজও অতি সুন্দর। এক কথায় বলিতে গেলে এই বলা যাইতে পারে যে, পুস্তকখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে। সুতরাং বঙ্গ সাহিত্যে পুস্তকখানি প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাইবার যোগ্য।

সুবিখ্যাত বসুমতী পত্রিকা দীর্ঘ সমালোচনায় লিখিয়াছেন :—

* * * * * আজকাল শিক্ষিত সমাজ বঙ্গদেশের প্রাচীন ইতিবৃত্ত ও তদনীন্তন সামাজিক তত্ত্বানুসন্ধানে অবহিত হইয়াছেন; ইহা আশার বিষয়—আনন্দের বিষয় তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। গ্রন্থকার রামপদ বাবু আলোচ্য গ্রন্থখানিতে প্রাচীন বঙ্গের অবস্থা এবং তদানীন্তন বাঙ্গালীর সংসার ও সমাজ সম্বন্ধে নানা জ্ঞাতব্য তথ্যের অবতারণা করিয়াছেন। ইহাতে এক শত বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালীর সংসার, সমাজ, শিক্ষা, দীক্ষা, সাধনা ও বলবীর্য্যের পরিচয় আছে। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ

কৃষ্ণমোহনের চরিত্র আদর্শস্থানীয়। বাঙ্গালী যে এক সময়ে মহা বলবান ছিলেন, বাঙ্গালীর বাহুতে যে, এক সময়ে মত্ত হস্তীর বল ছিল, পাপীর দমনের জন্য, নারীর মর্য্যাদা রক্ষার জন্য যে সে হস্ত উত্থিত হইত, গ্রন্থকার কৃষ্ণমোহনের চরিত্রে তাহার সম্যক পরিচয় দিয়াছেন। * * * * লেখকের লিখিবার যথেষ্ট শক্তি আছে। পুস্তকখানির আকার সুবৃহৎ—পৌনে পাঁচশত পৃষ্ঠায় সম্পুর্ণ, কাগজ ছাপা ও বাঁধাই অতি সুন্দর।

পুরুলিয়া হইতে প্রকাশিত বিখ্যাত "পুরুলিয়া দর্পণ" লিখিয়াছেন :—

জীবনসংগ্রাম বাঙ্গালা ভাষায় একখানি উপাদেয় পুস্তক। একাধারে উপন্যাস, গল্প, নীতি, এবং শাস্ত্র কথায় পরিপুর্ণ মহাগ্রন্থ। কতকগুলি সৎউপদেশ মূলক গল্প পুস্তকমধ্যে সন্নিবেশিত হওয়ায় বহিখানি পাঠ করা উচিত। ইহা সম্পদে বিপদে সকল সময়ে মানবের পথ প্রদর্শক ও গুরু। সংসারের ঘটনা সকল লিপিবদ্ধ করিয়া ও বাঙ্গালীর অবলম্বিত পথ প্রদর্শন করিয়া গ্রন্থকার অতীব যশস্বী হইয়াছেন। পুস্তক মধ্যে বহু শাস্ত্রীয় উপদেশ ও হিন্দুত্বের জলন্ত দৃষ্টান্ত প্রতিফলিত দেখিয়া মনে হয় রামপদ বাবু হিন্দুধর্ম্ম ও শাস্ত্র-

দর্শী মহাপুরুষ, তাঁহার ন্যায় ধার্ম্মিক ও পতনোন্মুখ হিন্দু জাতির উপদেষ্টা ব্যক্তি যে, এখনও আছেন ইহা হিন্দু মাত্রেরই গৌরবের বিষয়। অলস এবং বিলাসিতার স্রোতে ভাসমান, ধর্ম্ম ও আচার ভ্রষ্ট বাঙ্গালীর সম্মুখে পুস্তকে বর্ণিত কৃষ্ণমোহন, দুর্গাপ্রসন্ন, রামতনু, শরৎকুমারী প্রভৃতি মহাত্মাদিগের সংসার জীবনে ধর্ম্মজ্ঞান, পরোপকার ও ধার্ম্মিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া যে কর্ম্মপথ অবলম্বন করিতে বাঙ্গালী জাতিকে সঙ্কেত করিয়াছেন তজ্জন; তিনি বাঙ্গালী মাত্রেরই উপদেষ্টা ও গুরুর আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন। রাম-পদ বাবুর জীবন সংগ্রাম রচনায় তাঁহার পরিশ্রম সফল হইয়াছে।

বঙ্গের প্রাচীন মাসিক পত্র "জন্মভূমি" লিখিয়াছেন :—

* * * * * পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। পুরাতত্ত্বদর্শী উপযুক্ত পণ্ডিতের হস্তে এইরূপ দুই চারি খানি পুস্তক প্রস্তুত হইলে বর্ত্তমান বঙ্গের যথেষ্ট উপকার হইতে পারে।

মানব চিত্র।

এরূপ পাঁচশত পৃষ্ঠা ব্যাপি সুবৃহৎ জ্ঞানগর্ভ ও ধর্ম্মভাব পূর্ণ পুস্তক এ পর্য্যন্ত বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। যদি সংসারে থাকিয়া জ্ঞানলাভ করিতে চান, তবে "মানব চিত্র" পাঠ করুন।

সাতকড়ির দুঃখময় জীবনী পাঠে অশ্রুধারার সহিত যাহা শিক্ষা পাইবেন, লক্ষ মুদ্রা বিনিময়ে ও এরূপ শিক্ষা কোথায় পাইবেন না। সুরেন্দ্র নাথ, শৈলবালা, ও হিরণ্ময়ীর চরিত্র পাঠ করিতে করিতে চিত্রগুলি আপনার হৃদয়ে এরূপ ভাবে অঙ্কিত হইবে যে, জীবনে তাহা বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। গ্রন্থকার চিত্রগুলি যেরূপভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে মানব চিত্রের নাম সার্থক হইয়াছে। সমালোচকগণ যথার্থই বলিয়াছেন যে, রামপদ বাবুর মানব চিত্র হিন্দু হইয়া যিনি না পড়িবেন তাঁহার ক্ষতি ভিন্ন লাভ নাই।

সমস্ত সংবাদপত্র ও নেতৃবর্গ কর্তৃক একবাক্যে প্রশংসিত।

স্থানাভাবে কেবল কতিপয় সংবাদপত্রের মতামত নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

দেশমান্য শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয় "অমৃতবাজার" পত্রিকায় সুদীর্ঘ সমালোচনায় লিখিয়াছেন :—

Manab Chitra. The long expected volume by Babu Rampada Banerji, Proprietor Messrs Mani Lal & Co. 40 Garanhatta Street, Calcutta is just out. The author gives in the book a beautiful and life like story of a family villagers consisting of parents and children, brothers and sisters, husbands and wives etc. etc. To the credit of Rampada Babu it must be said that in all his books he has sought to establish the happiness which one may derive by loving his near and dear ones and the present publication is no exception. He has very effectively shown how in spite of abject penury one may enjoy heavenly bliss by cultivating love—love between brothers, between sisters, between husband aud wife etc. The present publication undoubtedly be an object lesson to many; the high sentiments running through its pages may bring many to the right path. The book therefore deserves to be very widely read.

Calcutta, 24th August. 1911.

প্রজাপতি :—

"এ খানি ভীষণ শোকাবহ পুস্তক। ইহা পাঠ করিয়া আমরা অন্তরে অন্তরে কাতর হইয়াছি সত্য—কিন্তু ইহার লিপি কৌশল দর্শনে যারপর নাই সন্তোষ লাভ করিয়াছি। বাবু রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের সাহিত্য সংসারে সুপরিচিত, তাঁহার জীবন সংগ্রাম সাধারণ্যে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছে।"

ব্যবসায়ী :—

রামপদ বাবু সুলেখক ও সাহিত্য সমাজে বিশেষ সুপরিচিত। ইহার প্রণীত জীবন সংগ্রাম নামক পুস্তকখানি ছয় মাসের মধ্যেই দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইতে চলিল, ইহাতেই সাধারণের নিকট রামপদ বাবুর পুস্তকের আদর যত্নের পরিচয় পাওয়া যায়। "সংসার চিত্র" খানি পাঠ করিয়া আমরা যারপর নাই প্রীতি লাভ করিয়াছি—যাহারা সংসারে দুঃখ দুর্দ্দশার সহিত যুদ্ধ করিতে চান—তাঁহারা মানবচিত্র খানি পাঠ করুন।

মোহাম্মদী :—

"মানব চিত্র" লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক বাবু রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত। কোন জাতীর বা কোন সমাজের জাতির বা সাম্প্রতিক জীবন গঠিত করিতে হইলে

এইরূপ সৎসাহিত্যের প্রচারই আবশ্যক। রামপদ বাবু যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, আমরা সকল গ্রন্থকারকেই সেই পথের অনুসরণ করিতে অনুরোধ করি: পুস্তকের ভাষা আরও সুন্দর।

আলোচনা :—

"মানব চিত্র" গ্রন্থকার সাহিত্য সমাজে সুপরিচিত। চরিত্র চিত্রণে তিনি সিদ্ধহস্ত। এই পুস্তকে শৈলবালার চরিত্র হিন্দুর সংসারের আদর্শ। সুরেন্দ্রনাথের চরিত্র দেবভাবে পূর্ণ। এরূপ সাহিত্য যত প্রচারিত হয় ততই মঙ্গল।

বঙ্গবাসী :—

"মানব চিত্র"—শ্রীযুক্ত রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত। শ্রীযুক্ত হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ৪০ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট কলিকাতা। মূল্য ১৷০ সিকা। গ্রন্থকার সাহিত্য-সংসারে সুপরিচিত। মানবচরিত্রের বৈচিত্রে এ গ্রন্থ সুপাঠ্য, শোকের পর শোকে মানুষ আপনি কাঁদিয়া পরকে কেমন করিয়া কাঁদাইতে পারে, শেষে ধর্ম্মবুদ্ধিবলে কিরূপে শান্তিলাভে সমর্থ হয়, এ গ্রন্থে তাহার পরিচয়। মধ্যে মধ্যে সংসার চরিত্রের দার্শনিক বিশ্লেষণ সুখদ

জাহ্নবী :—

"মানব চিত্র" যাঁহারা রামপদ বাবুর জীবন সংগ্রাম পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট এ পুস্তকের পরিচয় দিবার আবশ্যক নাই। পাঠে আমরা অশ্রুসংবরণ করিতে পারি নাই।

আনন্দবাজার পত্রিকা :—

"মানব চিত্র", "জীবন সংগ্রাম" "সংসার চিত্র" প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত। মানবচিত্র খান পড়িতে পড়িতে ধর্ম্মভাবে প্রাণ ভরিয়া যায়। আমাদের অন্তঃপুরে হিন্দু-ললনাদের সমক্ষে এরূপ চিত্র যিনি ধরিতে পারেন, তাঁহার পুস্তক রচনা সার্থক হইয়াছে।

জন্মভূমি :—

"মানব চিত্র"—জীবন সংগ্রাম প্রণেতা শ্রীযুক্ত রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত। মূল্য ১।০ সিকা মাত্র।

একটী শিশু পুত্রের শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া গ্রন্থকার মহাশয় এই পুস্তকখানি রচনা করিয়াছেন। তিনি দেখিতে পাইতেন শিশু তাঁহাকে উপদেশ দিত ঐশী শক্তিতে জীবের জন্ম, ঐশী শক্তির ইচ্ছাতেই মানবের মৃত্যু, মানবের

শক্তি, সাধ্য অথবা ইচ্ছার সহিত ইহার কোনও সম্পর্ক নাই। পড়িলে অশ্রু সংবরণ করে কাহার সাধ্য।"

পুরুলিয়া দর্পণ :—

"মানব চিত্র"—সুপ্রসিদ্ধ জুয়েলার্স মণিলাল এণ্ড কোংর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ১।০ সিকা মাত্র। রামপদ বাবুর জীবন সংগ্রাম পাঠ করিয়া হৃদয়ে অতীব আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম। পুস্তকে তাঁহার আদর্শ হিন্দুত্বের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে ভক্তির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, বঙ্গভাষায় বুঝি এমন উপাদেয় পুস্তক আর নাই ; কিন্তু এক্ষণে তাঁহার মানব চিত্র পাঠ করিয়া কোন পুস্তকখানি শ্রেষ্ঠ, তাহা বিবেচনা করা কঠিন হইয়াছে। পুস্তকে বর্ণিত নায়ক নায়িকার আদর্শ চরিত্র ও সংসার চক্রে দুঃখ জর্জরিত অভাব নিপীড়িত অবস্থা পাঠ করিয়া অতীব ব্যথিত হইয়াছি। স্থানে স্থানে দুঃখ বর্ণনা পাঠ করিয়া অশ্রুপ্রবাহে বক্ষ প্লাবিত করিয়াছি। রামপদ বাবুর মানবচিত্র হিন্দু মাত্রেরই পড়া উচিত। ইহার প্রত্যেক পৃষ্ঠায় জ্ঞান উপার্জ্জন করিবার, উপভোগ করিবার অনেক কথা আছে

বিশেষ দ্রষ্টব্য ।

সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক রামপদ বাবুর গ্রন্থগুলি সাধারণ্যে এত সমাদর লাভ করিয়াছে যে, ইতিমধ্যেই তাঁহার পুস্তকগুলি নানা ভাষায় অনুবাদিত হইতেছে। ভবরামের উইলখানি উর্দ্দু ভাষায় অনুবাদিত হইতেছে—এই সংবাদ বাঙ্গালীর পক্ষে শ্লাঘার বিষয় সন্দেহ নাই।

"জীবন সংগ্রাম" "মানব চিত্র" "ভবরামের উইল', প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

সংসার চিত্র ।

এরূপ ছোট ছোট গল্পের সমষ্টি অথচ সারগর্ভ উপন্যাস এ পর্য্যন্ত বঙ্গভাষায় বাহির হয় নাই। এই পুস্তক পাঠে যাহা শিক্ষা পাইবেন,—জীবন সংগ্রামের পথে তাহা বহু উপকারে আসিবে, ইহাতে হিন্দুধর্ম্মের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিবেন, কি করিয়া সংসার ধর্ম্ম করিতে হয়, তাহা জানিতে পারিবেন, দেশ ভ্রমণের উপকারিতা ও ভ্রমণ কাহিনী ও

শুনিতে পাইবেন। ইহাতে "প্রবাসে আটদিন" পড়িয়া হিন্দুধর্ম্মের মধুরত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। "সংসার চিত্র" খাঁটি হিন্দুর "সংসার চিত্র"। সংসারচিত্রের "আমাদের ঝি" আলাময়ী স্মৃতি পাঠ করিলে অশ্রু সংবরণ করিতে পারিবেন না। "সন্ন্যাসী" "ভারতভূমির চিত্র" প্রভৃতি পাঠ করিলে ১৫০ বৎসরের পূর্ব্বের হিন্দুর সংসারের প্রকৃত চিত্র নয়ন সমক্ষে দেখিতে পাইবেন। "সংসার চিত্র" কিরূপ উপাদেয় গ্রন্থ তাহা লিখিয়া বুঝাইবার নহে। যদি ক্রয় করিবার সাধ্য না হয় অপরের নিকট হইতে বা লাইব্রেরী হইতে আনাইয়া একবার পাঠ করুন। ইহা নাটক নভে বা গল্পের বহি নয়, গ্রন্থকারের সংসারের কথা,—নিজের কথা ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। "মৃত্যু মিলন" পড়িয়া অনেক সংসারে আবার শান্তি ফিরিয়া আসিয়াছে। সামান্য স্বার্থের মায়া যাহারা পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া ভ্রাতৃত্ব জ্ঞাতিত্বে পরিণত করিয়াছিল, আবার তাহারা "ভাই" ভাই" মিলিত হইয়াছে। "সংসার চিত্রের" একটী লেখাও অতিরঞ্জিত নহে, মিথ্যা নহে, কাল্পনিক নহে—ইহা খাঁটি সত্য ঘটনা। পাঠক তাহা পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধাই; সোনার জলে নাম লেখা, গ্রন্থকারের হাফটোন চিত্রসহ মূল্য ১।০ সিকা মাত্র। গ্রন্থকারের

"জীবন সংগ্রাম" নামক পুস্তকের ছয় মাসের মধ্যেই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে; সুতরাং তাঁহার সংসার চিত্রের অধিক পরিচয় প্রদান করা অনাবশ্যক।

যাবতীয় ইংরাজী ও বাঙ্গালা সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ "সংসার" চিত্রের" প্রশংসা করিয়াছেন; স্থানাভাবে ২।১ খানি সংবাদ পত্রের অভিমত উদ্ধৃত হইল।

Sansar Chitra.—This is a book containing eight short stories in Bengali by Babu Rampada Benerjee the well-known author of "Jiban Sangram" "Manab Chitra" etc. Rampada babu is the proprietor of Messrs, Mani Lal & Co. now a well-known firm of Jewellers and Diamond Merchants of this city. Though thoroughly engaged in business, Rampada Babu unlike many of our countrymen devotes his leisure hours to the culture of his mother tongue. Rampada Babu's style is very chaste and simple and his stories are always attractive. The stories "Our maid Servent" "Mritu Milan" "Bijoa" "Sannyashy" have been very well written. It is a good sized book covering 314 pages at Re. 1/4 per copy. We recommend the new book to every lover of short stories.

AMRITA BAZAR PATRIKA.

Calcutta 10th February 1913.

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার পত্রিকা লিখিয়াছেন—

কলিকাতা গরাণহাটার সুপ্রসিদ্ধ জুয়েলার্স মণিলাল কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী এবং সাহিত্য জগতে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত মূল্য ১।০ মাত্র। রামপদ বাবুর "জীবন সংগ্রাম" "মানব চিত্র" প্রভৃতি গ্রন্থগুলি যিনি পাঠ করিয়াছেন, তিনিই অবগত আছেন, সমাজ ও গার্হস্থ্য চিত্র অঙ্কনে রামপদ বাবু কিরূপ সিদ্ধহস্ত। "সংসার চিত্রে" যে কয়টী গল্প আছে, ইহার মধ্যে "আমাদের ঝি" "প্রবাসে আটদিন" প্রভৃতি কয়েকটী ইতিপূর্ব্বে "আনন্দবাজার" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। * * * * রামপদ বাবুর লেখার একটা আকর্ষণী শক্তি আছে যে, ইহা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে আত্মহারা হইয়া যাইতে হয় এবং শেষ না করিয়া থাকা যায় না। * * * *

পুরুলিয়া দর্পণ লিখিয়াছেন—

"আমরা সমালোচনার জন্য "সংসার চিত্র" নামক একখানি পুস্তক পাইয়াছি। পুস্তকখানি বিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মুল্য ১।০ মাত্র। পুস্তকে তাঁহার হিন্দুত্বেরও মহাপ্রাণের আদর্শ অনুভব করিয়া পুলকে রোমাঞ্চিত হইতে হয়। "সংসার চিত্রের" গল্পগুলি সংসারের কয়েকটী সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। গল্পগুলি লোকলোচনের সম্মুখে প্রত্যহ সর্ব্বস্থানেই অনুষ্ঠিত হইতেছে, কিন্তু গ্রন্থকার এরূপ ভাষায় ও ভাবে বিষয়গুলি লিখিয়াছেন যে, তাহা প্রত্যেক

গৃহস্থের আলোচ্য ও জ্ঞাতব্যের বিষয় হইয়া উপস্থিত হইয়াছে।

আলোচনা বলেন—

"সংসার চিত্র"। শ্রীযুক্ত রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত একখানি ছোট গল্পের বই। মূল্য ১।• সিকা, সুন্দর বিলাতিবঃ বাঁধাই। রামপদ বাবুর উপন্যাস বা গল্প রচনায় বেশ কৃতিত্ব আছে। এ কৃতিত্ব আর কিছুই নহে, তিনি আজগুবি গল্পের অবতারণা করিয়া পুস্তকের অঙ্গ পরিপুষ্ট করেন না, সত্য ঘটনা মূলক গল্পই তাঁহার অবলম্বন, তাহাতে আবার ধর্ম্মের রসান দিয়া তিনি গল্পগুলিকে এত মধুময় করিয়া তুলেন যে, পাঠ করিলে হিন্দু পাঠক মাত্রেই মুগ্ধ হইবেন।

ভবরামের উইল।

ভবরামের উইল আজকালকার উপন্যাস নহে। হিন্দুত্ব কি ছিল কি নাই যদি জানিতে চান ও বুঝিতে চান ইহা পাঠ করুন। হিন্দু সংসার ধর্ম্ম করিয়া শেষ জীবনে কিরূপ উইল করিবেন "ভবরাম"তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন। বাঙ্গালী পাশ্চাত্য ভাবে জীবন যাপন করিতে গিয়া কি প্রকারে দিন দিন অধঃপতিত হইয়াছে—তাহারই উজ্জ্বল চিত্র এই পুস্তকে চিত্রিত হইয়াছে। ভবরাম, করুণাময়, সাগরবালা, ঝামেরিয়া রামপ্রসাদ প্রভৃতি চরিত্র সৃষ্টি অপূর্ব্ব। ভাষার মাধুর্য্যে, লিপিচাতুর্য্যে, বর্ণনা কৌশলে গ্রন্থখানি পড়িতে গেলে শেষ না করিয়া থাকা যায় না। বর্ণনা পাঠ করিয়া সুপ্রসিদ্ধ গল্প-

লেখক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন যে "আপনার বিরোহীর বর্ণনা পাঠ করিয়া, তথায় গিয়া কিয়দ্দিবস বাস করিতে ইচ্ছা করে।" ভবরাম নিষ্ঠাবান হিন্দু—তিনি আদর্শ হিন্দু পরিবার স্থাপিত করিয়া, দেশবাসীর সম্মুখে ধরিয়াছেন। সংসারে কিসে প্রকৃত শান্তিলাভ করা যায় তাহার উজ্জ্বল উদাহরণ এই পুস্তকে পাওয়া যায়। বঙ্গের শ্রেষ্ঠ সমালোচক ও সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ একবাক্যে বলিয়াছেন যে, "বঙ্কিম বাবুর কৃষ্ণকান্তের উইল এক দিকে আর ভবরামের উইল অপর দিকে।" যিনি হিন্দু বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন—তাঁহাদের প্রত্যেকেরই এই গ্রন্থখানি পড়া কর্ত্তব্য। যদি হিন্দুর আদর্শ—ভ্রাতৃ প্রেমের আদর্শ—দাম্পত্য প্রেম—হিন্দুর তপঃপ্রভাব, জন্মান্তর যোগ প্রভাব জানিতে চান, তবে ভবরামের উইল পাঠ করুন। গ্রন্থখানি ছাপা, কাগজ অতি উত্তম। বাঁধাই মূল্যবান বিলাতি সিল্কের কাপড়ে অতি সুদৃশ্য। আকার ডবল ফুলিস্কেপ, ১৬ পেজী ২১ ফর্ম্মায় দুই খণ্ডে সমাপ্ত। একত্রে দুইখণ্ড বাঁধান মূল্য ১া০ সিকা মাত্র। এরূপ পুস্তক বঙ্গভাষায় আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই।

মতামত।

"BHABARAM'S WILL—This is a Bengali novel by Babu Rampada Banerji, the proprietor Mani Lal & Co., Jewellers and Diamond Merchants, 40 Garanhatta Calcutta. Babu

Rampada has now become a well known novelist having his few other works well received by the Bengali reading public. The author, in the midst of a well developed story, his tried to prove that the old order of things prevalent in our society was well conceived by the Hindu Seers and largely contributed to the well being of the ancient Hindu society, the present day transgressor of the old order having to pay dearly for their adopted customs. The book is also interspersed with delightful gems from Hindu Shastras which every Hindu and non-Hindu should read for his spiritual advancement. The author has taken a good deal of pains to show the true meaning of the theory of incarnation and why it is necessary. This is perhaps the reason why the book has been dedicated to Babu Piyus Kanti Ghosh, who is generally believed to entertain quite an opposite view. As a great controversy is going on the west over this theory and a full discussion of this important question is undoubtedly very opportune and timely. Bhabaram and few other characters in the book are typical. Hindus and many would wish a recurrence of the same in our society. Before we conclude, we cannot but refer to the homely and captivating style of Rampada Babu to which mainly the success of all his books is due. Himself a loving soul he has all along shewn the devine

nature of love. We doubt not his book will be widely read and read with both pleasure and profit. The book is priced at Re 1/4 per copy.

THE AMRITA BAZAR PATRIKA.
The 19th September 1913.

BHABARAM'S WILL.—This is a novel in Bengali by Babu Rampada Banerji, the reputed author of "Jiban Sangram" "Manab Chitra" "Sansar Chitra" etc. unlike much of the trash that passes for books of romance in the market this book is designed not merely to gratify the idle curiosities of average readers for romantic fictions but sketches with a left hand through the characters a high ideal for its readers to live and preach. He diagnoses with the skill of a clever social doctor the maladies that he supposes to be eating into the very vitals of our society and though to the diagnosis one may not agree the author has certainly succeeded in pointing out the disintergrating forces that are at work in our midst owing to the want any ideal for the society to live upto. The bliss of living the life of an ideal Hindu., the dangers of leading a reckless life, the glory of honesty and truthfulness even under the midst of trying circumstances have been portreged with a living touch through his charcters specially Bhabaram. the hero of the book, whose life of sacrifice and devotion embodies the ideal the

author seeks to place before his readers. In short with excellent get up and its interesting plot we have no doubt the book will find the patronage it deserves, "BENGALEE".

জন্মভূমি বলেন :—

শ্রীযুক্ত রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত এইচ ব্যানার্জ্জি কর্ত্তৃক প্রকাশিত, গিরিশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস দ্বারা মুদ্রিত, মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা। পুস্তকখানি ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্ত শ্রীপিযূষকান্তি ঘোষ মহাশয়ের নামে উৎসর্গীকৃত। উপযুক্তই হইয়াছে—কৌস্তুভ ভগবান বই আর কার কণ্ঠে শোভা পায়।

আজি কালকার দিনে গাউন পরা, বনেঠ মাথায় প্রেয়সীর প্রণয় সম্ভাষণ না থাকিলে উপন্যাস জমিয়া উঠে না—প্রেমের হলাহলি চলাচলি না থাকিলে বঙ্গীয় পাঠকের তাহা পড়িতে মন চায় না, প্রেম ভাল, প্রেমেই সংসার চলিতেছে, প্রেম ব্যতিরেকে সংসার অন্ধকারময় শিথিল ও অশান্তির স্থান হইয়া উঠে। কিন্তু তাহার বিশেষত্ব আছে। আলোচ্য গ্রন্থের পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহাতে গন্নাংশের আড়ম্বর মাত্র নাই। ভবরাম এই উপন্যাসের নায়ক, তাহার পত্নী সাগরবালা ভ্রাতা করুণাময় এবং ঝামেরিয়া নাম্নী চিরকুমারী এই কয়েকটী ইহাতে চিত্রিত হইয়াছে। ভবরাম মহাতেজস্বী চরিত্রবান পুরুষ। তাঁহার চরিত্রের সর্ব্বত্র ধর্ম্মপ্রাণতার জাজ্জ্বল্যমান ছবি প্রত্যক্ষ করা যায়। গ্রন্থকার আপনার চিত্র আপনি

এরূপ আঁকিয়াছেন সিদ্ধহস্তে চিত্রকরও সেরূপ অঙ্কিত করিতে সমর্থ হইবেন না, আমরা এ চিত্র দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। সাগরবালা অন্তঃপুরচারিণী তাহাকে দেখি নাই, তাঁহার চিত্র দেখিয়া মনে হয় পতিপ্রাণা হিন্দু গৃহিণী স্বামী ধ্যান স্বামী জ্ঞান, স্বামীই সংসারের সার, মহাকবি কবিকঙ্কন ব্যাধবধূ ফুল্লরায়—যথার্থ বলিয়াছেন,—

স্বামী বনিতার পতি স্বামী বনিতার গতি,
স্বামী যে বিধাতা বনিতা।
স্বামীই পরম ধন, স্বামী বিনা অন্যজন,
কেহ নহে সুখ মোক্ষদাতা।
সন্তোষে বসয়ে খাটে, অপরা বিনাক কাটে
দাও রাজা বনিতার পতি।
শুনগো শুনগো সই, হিত উপদেশ কই,
ইতিহাসে কর অবগতি॥

কবিকঙ্কণ চণ্ডী, বঙ্গবাসী সং।

সাগরবালা স্বামীকে দেবতা জ্ঞান করিতেন, পদোদক পান না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। এখানকার অনেক রমণীই হয়ত এ কথা শুনিয়া হাসিবেন, স্বামীরও দুই হাত দুই পা তাঁহারও দুই হাত দুই পা—স্বামী ক্ষুধা তৃষ্ণার অধীন —তিনিও কোন মতে তাহার কম নহেন,—তবে আর তিনি কিসের দেবতা, পাশ্চাত্য সভ্যতায় কি মহিমা! পত্নী বাড়ীর সর্ব্বেশ্বরী অনুগ্রহ করিয়া এক মুঠা দিলে তবে পতির ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়, নতুবা উপবাসী থাকিলেও কাতর নহেন। পুরুষ পত্নীগত প্রাণ। পুরুষ সমস্ত দিন মুখে

রক্ত তুলিয়া যাহা কিছু পাইবেন, পত্নীর হস্তে দিবেন, পত্নীর আজ্ঞাধীন হইয়া চলিবেন, ইচ্ছা করিলে ধন অর্থ সব কাড়িয়া লইয়া তাড়াইয়া দিলেও কিছু বলিবার নাই।

এ সমাজ উন্নত হইবে না ত কোন সমাজ উন্নত হইবে। হিন্দু রমণী এখন সতী সাবিত্রী দময়ন্তী প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়-দিগকে ভুলিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থকার আজিকালিকার দুর্দিনে দুঃসময়ে সাগরবালার চরিত্র চিত্রণে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। স্বামীর কারবারের উন্নতির জন্য আপনার সখের নেকলেস ছড়াটী অকাতরে খুলিয়া দেবরের হাতে দিলেন। এখনকার সাধারণ স্ত্রীলোকদিগকে বলিলেই "রেখে দাও তোমার ব্যবসা বাণিজ্য, যদি ফিরেই দিতে হবে তবে দাও কেন।" সাগরবালা আদর্শ হিন্দুরমণী ত্যাগ স্বীকার করিতে না পারিলে তাহার মত নারী হওয়া যায় না।

স্বামী ভবরাম তাঁহাকে আপন ভ্রমণকাহিনী শুনাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মনস্বিতা, ন্যায়নিষ্ঠা এবং ধর্ম্মপ্রাণতার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সকলেরই অনুকরণীয়। যখন তাঁহার সহিত পাগলের সাক্ষাৎকার হইল, তখন তিনি তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া যে ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহার তুলনা নাই—লোকটী কি সত্যই পাগল। তবে ইহার সহিত আলাপ করিব, একটী গান শুনিব, ইহার অঙ্গের ছাই ভস্ম ও অঙ্গের ধূলাগুলি মুছাইয়া দিব। জগতে পাগল নয় কে? কেহ অর্থের জন্য পাগল, কেহ স্বার্থের জন্য পাগল, কেহ সন্তান সন্ততি লইয়া পাগল, ঈশ সম্বন্ধে পাগল। সংসারটা পাগলেরই ছাট

দাজার, যিনি পেটের জন্য ধরাচূড়া পরিয়া ওকালতী করিতেছেন তিনিও যেরূপ পাগল, পেটের জালায় ক্ষুধার যন্ত্রণায় যে চীৎকার করিতেছে সেও সেইরূপ পাগল। নাম কিনিবার জন্য উন্নতি উন্নতি করিয়া যিনি গগন বিদীর্ণ করিয়া বক্তৃতা করিতেছেন, তিনিও তদ্রূপ পাগল। দার্শনিক পণ্ডিত—বৈজ্ঞানিক—শিল্পকার—কবি—গ্রন্থকার—ভাবুক পর্য্যটক সকলেই আপনার ধ্যানেই আপনি মগ্ন বাহ্যজ্ঞান রহিত। বড় হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট পর্য্যন্ত যখন একই প্রকার ঘুরিতেছে—তখন জগতে পাগল নয় কে? ইত্যাদি সমস্তটা খুলিয়া দেখাইবার ইচ্ছা থাকিলেও স্থানাভাব। পাগল পরিণামে তাঁহার অভীষ্টদেব হইয়াছেন। গুরুভক্তি আপনা হইতেই এইরূপে জন্মিয়া থাকে। কাহাকেও শিখাইতে হয় না, ইহা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত, সময়ে আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়।

গ্রন্থকার হিন্দুধর্ম্মের সারধর্ম্ম বুঝাইবার জন্য অশেষ চেষ্টা করিয়াছেন—তাহাতে বিলক্ষণ কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। গুরুদেবের উদ্যোগ অনুষ্ঠান প্রশংসার যোগ্য, তিনি যেরূপ ব্রাহ্মণসন্তানের শিক্ষা দীক্ষার ১১টী প্রস্তাব করিয়াছেন, এইকালে সেই সদনুষ্ঠানগুলি সিদ্ধ করিতে পারিলে আবার ভারতে ব্রহ্মতেজের বিমল জ্যোতিঃ দেখিতে পাওয়া যায়— আবার ব্রাহ্মণ প্রাধান্য ভারতভূমির সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, আবার হিন্দুধর্ম্মে যে নিগূড় তত্ত্ব নিহীত আছে, তাহা বুঝিবার সুযোগ পাইতে পারি। রাদপদ বাবুর উদ্যম উৎসাহ প্রশংসার যোগ্য, এজন্য আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না।

হিন্দুসমাজের মুখপত্র আলোচনা লিখিয়াছেন—

ভবরামের উইল। শ্রীযুক্ত রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত একখানি উপন্যাস। রামপদ বাবু সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ পরিচিত। রামপদ বাবুর উপন্যাস লিখিতে বেশ শক্তি জন্মিয়াছে। তাঁহার উপন্যাস যে এত মধুর হয়, তাহার কারণ দুইটী। প্রথম কারণ তিনি প্রায়ই সত্য ঘটনামূলক উপন্যাস লিখিয়া থাকেন, দ্বিতীয় কারণ তাঁহার উপন্যাস-গুলি সমস্তই ধর্ম্মমূলক। হিন্দুর আদর্শ গৃহচিত্র অঙ্কিত করাই তাহার লেখনীধারণের উদ্দেশ্য। এইরূপ উদ্দেশ্যে যত উপন্যাস প্রচার হয়, ততই মঙ্গল। রামপদ বাবু দীর্ঘজীবী হইয়া এইরূপ গ্রন্থ প্রণয়ণে ব্রতী থাকুন। ভগবানের নিকট ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা। পুস্তকের কাগজ ছবি ও বাঁধাই মনোজ্ঞ। মূল্য ১।০ সিকা।

সাহিত্য সংবাদ লিখিয়াছেন—

সাহিত্যিক রামপদ বাবু কয়েকখানি সামাজিক ভাবের উপন্যাস লিখিয়াছেন। সকলগুলিরই বেশ আদর হইয়াছে। ভবরামের উইলও যে সমাদৃত হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য, রামপদ বাবু অল্পদিন মধ্যেই উপন্যাসক্ষেত্রে যশস্বী হইয়াছেন। তাঁহার উপন্যাস আকর্ষণী শক্তিবিশিষ্ট—সুতরাং অধিক পরিচয় দেওয়া বাহুল্য।

বঙ্গবাসী বলেন—

ভবরামের উইল। জীবন সংগ্রাম, মানবচিত্র, সংসার-চিত্র প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীযুক্ত রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। এইচ, পি, ব্যানার্জ্জি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য

১৷০ সিকা। উপন্যাস রচনায় গ্রন্থকার পূর্ব্বে যে হাত দেখাইয়াছেন আলোচ্য গ্রন্থে সে হাত দেখিলাম : আদর্শ হিন্দু চরিত্র চিত্রাঙ্কণে এ গ্রন্থ আমাদের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছে। অধুনা পাশ্চাত্য ভাবপ্লাবনে প্লাবিত বঙ্গে গ্রন্থকার সুপথ প্রদর্শক।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার পত্রিকা বলেন,

ভবরামের উইল। শ্রীযুক্ত রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত মূল্য ১৷০ মাত্র। ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে গুরুদাস বাবুর লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য।

পুস্তকখানি অতি সুন্দররূপে মুদ্রিত এবং সিল্কের কাপড়ে বাঁধান। প্রায় চারিশত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। রামপদ বাবুর জীবন সংগ্রাম ও সংসারচিত্র সাহিত্য জগতে সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে।

রামপদ বাবু সুবিখ্যাত জুয়েলার্স মণিলাল কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী। তিনি ব্যবসাতে লিপ্ত থাকিয়াও যে বঙ্গ সাহিত্যের আলোচনা করিয়া থাকেন, ইহা বাস্তবিক প্রশংসার্হ্য। আলোচ্য গ্রন্থখানি গ্রন্থকার অতি প্রাঞ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার ভাব, ভাষা, কল্পনা, লিপিকুশলতা, দেখিলে শতকণ্ঠে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম প্রতিষ্ঠার সংকল্প প্রত্যেক হিন্দু আদরের সহিত গ্রহণ করিবে। গ্রন্থের নায়ক ভবরাম একজন আদর্শ নিষ্ঠাবান হিন্দু। সুতরাং তাঁহার সংসারেরও আদর্শ হিন্দু সংসার। ভবরাম, পত্নী শ্যামবালা, ঝামেরিয়া ভ্রাতৃগত প্রাণ করুণাময় প্রভৃতির

পরিচয় পুস্তকখানি পাঠ না করিলে বলিতে পারা যায় না। স্বাধীন ভাবে জীবন পরিচালিত করিলে তাহার কি ফল উৎপন্ন হয়, গ্রন্থকার তাহা সুন্দররূপে বিবৃত করিয়াছেন। আমরা পুস্তকখানি সকলকেই একবার পাঠ করিতে অনুরোধ করি। রামপদ বাবুর লেখনী স্বার্থক, ভগবান তাঁহাকে দীর্ঘজীবি করুন, আমরা তাঁহার নিকট হইতে অনেক আশা করি।

সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—

"ভবরামের উইল" উপন্যাস উপহার প্রাপ্ত হইয়া পরম আপ্যায়িত হইলাম। তজ্জন্য আমার কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। * * *

"ভবরামের উইল" পাঠ করিয়া অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করিলাম। আপনি কৃতী লেখক, হইবেন না কেন। বিসোহির বর্ণনা পাঠ করিয়া সেখানে গিয়া কিছুকাল যাপন করিতে ইচ্ছা করে।

The Hindu Spiritual Magazine.

Vol. VIII. No. 7, September 1913.

We have received a Bengali novel with the title of "Bhabram's Will for review, It is written by Babu Rampada Banerjee the proprietor of Mani Lal & Co, jewellers and diamond merchants, 40. Garanhatta Street, Calcutta. Though it is a honest story the real object of the author seems to be to preach the doctrine of re-birth, the discussion of which

takes up a large portion of the birth and the superiority of the ancient Hindu manners and customs over those that have been adopted in our country. This is perhaps the reason why the book has been dedicated to Babu Piyus Kanti Ghosh who believe that the theory of reincarnation has not yet been satisfactorly proved without speaking anything in nispuragement of the argument used by the author in support of that theory what stikcs us is that tee author has practically showed only one side of the shield. The religious vein which pernades throughout the book is specially noteworthy and makes it a really useful and elevating publication.

পুরুলিয়া দর্পণ লিখিয়াছেন—

ভবরামের উইল—

বঙ্গ সাহিত্যে সুপরিচিত স্বধর্ম্মনিষ্ঠ প্রতিভাবান, লেখক শ্রীরামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ভবরামের উইল নামক একখানি উপন্যাস পুস্তক পাইয়াছি, এ পুস্তকে আধুনিক সভ্য নায়ক নায়িকার মিলন কাহিনী, দাম্পত্য জীবনের নিরাবিল সুখ পাইবেন না।

ইহা আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ঋষিগণের প্রদর্শিত ও অবলম্বিত সাংসারিক জীবনের পুত্র, পৌত্র কলত্রাদি, সহোদর সহোদরা, দূরস্থ ও নিকটস্থ আত্মীয় স্বজন, কোলাহল প্রখরিত খাঁটি হিন্দু সংসারের আদর্শ চিত্র। সদা প্রফুল্ল

নায়কের চিত্র অঙ্কন করিয়া আর সর্ব্বদা, হাহা হুহু সংক্ষিপ্ত হিষ্টিরিয়াগ্রস্থা অপ্রসন্না নায়িকার পরিবর্ত্তে পতিগতপ্রাণা আত্মীয় স্বজনের সেবানুগতা, পরিশ্রমী গৃহকর্ম্মে লক্ষ্মী স্বরূপিণী, সিন্দুরশোভিতা কেশা, নায়িকার চিত্র, অঙ্কনে বাস্তবিকই গ্রন্থকার এক অসাধারণ নৈপুণ্যতার পরিচয় দিয়াছেন। গৃহস্থধর্ম্মের যে সুপ্রথাগুলি আমরা অনেক দিন ত্যাগ করিয়াছি, হিন্দু সংসারের উন্নতি লাভের উপায়--একান্নবর্ত্তিতা আত্মীয় স্বজন বরীয়সী গৃহিণী পরিবৃত যে সংসার আমরা বহুদিন ভুলিয়া গিয়াছি। ধর্ম্মপ্রাণ রামপদ বাবু স্বার্থপর বাঙ্গালীর সম্মুখে সেই আদর্শ সংসার চিত্র চিত্রিত করিয়া অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন।

ভবরামের উইল পাঠ করিলে সংসারিকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পথ ভ্রান্ত হইতে হইবে না। হৃদয় হইতে হিংসা, দ্বেষ, অহঙ্কার প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তিগুলি বিদূরিত হইয়া যাইবে। গ্রন্থকার, উপন্যাসের নায়ক ভবরামকে লক্ষ্য করিয়া যে আদর্শ চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন এবং দুঃস্থ, ক্লিষ্ট ও অভাবগ্রস্থ হিন্দুকে যে সহজ পথ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা হিন্দু মাত্রেরই পাঠ করা উচিত ও গৃহে গৃহে এরূপ আদর্শ গঠন করিতে সচেষ্ট হওয়া উচিত।

হিতবাদী।

ভবরামের উইল—

শ্রীযুক্ত রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত মূল্য পাঁচসিকা মাত্র। গ্রন্থকার সত্য ঘটনা অবলম্বনে উপন্যাসাকারে ইহা

রচনা করিয়াছেন। ধর্ম্মের বল, সুনীতির মাহাত্ম্য, সনাতন ধর্ম্মের প্রাধান্য প্রকাশ করাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য যে সম্যকরূপে সুসিদ্ধ হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য! আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া প্রকৃতই পরিতৃপ্ত হইয়াছি।

সম্মিলনী।

ভবরামের উইল, উপন্যাস। শ্রীযুক্ত রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত বিখ্যাত জুয়েলার্স মণিলাল কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী সুসাহিত্যিক রামপদবাবুর পরিচয় নিষ্প্রয়োজন।

আজকাল বাঙ্গালা সাহিত্যে উপন্যাসের কথা ভাবিলে বুক ফাটিয়া যায়। বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র উপন্যাসের অবাধ গতি প্রত্যহ শুদ্ধান্তচারিণীদের উপাধানতল হইতে রেলগাড়ীর কক্ষ পর্য্যন্ত উপন্যাসের গতি। রামপদ বাবু ইতিপূর্ব্বে কয়েকখানি উচ্চাঙ্গের উপন্যাস প্রণয়ণ করিয়া ও কয়েকটী আদর্শ চরিত্র চিত্রিত করিয়া বঙ্গীয় পাঠক সমাজের নিকট যশলাভ করিয়াছেন। গ্রন্থ প্রণেতা অতি সুন্দরভাবে গ্রন্থের ঘটনাগুলি হিন্দুর সনাতন ধর্ম্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া পাঠকবর্গের ধন্যবাদার্হ্য হইয়াছেন। কোন কোন মহৎ কর্ম্মে আমাদের জীবনের চরমোৎকর্ষ লাভ হইতে পারে, কিরূপে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিলে আমরা জগতের সর্ব্ব জাতির পূজ্য হইতে পারি, তাহা রামপদ বাবু গল্পের ঘটনাবলীর মধ্য দিয়া বেশ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। হিন্দুর প্রাচীন সমাজ নীতিগুলি আমাদের সুখ, সন্তোষ ও স্বাস্থ্য লাভের পক্ষে কিরূপ অনুকূল, তাহা অতি সুন্দর

ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। দীন দুঃখীর বিপদে অশ্রুপাত, প্রাণপাত করিয়া প্রভুর জীবনরক্ষার প্রয়াস, বিশ্বের সামান্য পদার্থও আমাদের অবহেল বা উপেক্ষার জিনিষ নয়, তাহা গ্রন্থকার গল্পের মধ্য দিয়া আমাদিগকে বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

বিদেশিনী ঝামেরিয়া একটী আদর্শ দেব চরিত্র। হিন্দু দম্পতীর স্নেহবেষ্টনের মধ্যে আসিয়া আপনার হৃদয়টীকে কেমন বৃহৎ ও উদার করিয়া তুলিল, সে যেন বিদেশিনী নয়।

আর তার প্রতি ভবরামের স্নেহ গোমুখীর ধারাবৎ অশ্রান্তধারে ঝরিয়া পড়িতেছে—শেষ পর্য্যন্ত গ্রন্থকার তাহার চরিত্রগুলি বেশ স্বাভাবিক ভাবে ও উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। ভবরামের মত আদর্শ, উদারচেতা হিন্দু আজকাল বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। যিনি আপনার প্রতিভার সাহায্যে শস্য শ্যামলা বঙ্গদেশে, কিংবা দ্বেষ পূর্ণ বাঙ্গালায় এইরূপ দেব চরিত্র চিত্রিত করিতে পারেন তিনি সকলের ধন্যবাদের পাত্র। ভবরাম যে উইলখানি করিয়া গেলেন তাহার সারমর্ম্ম আমরা পাঠক বর্গকে সময়ান্তরে উপহার দিব।

"জীবন সংগ্রাম" "ভবরামের উইল" "মানব চিত্র" "সংসার-চিত্র" প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক

শ্রীযুক্ত রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

অভিনব ভ্রমণ বৃত্তান্ত

আমার ভ্রমণ

বাহির হইয়াছে। ইহা উপন্যাসের মত সরস ও চিত্তা-কর্ষক। ইহাতে মুঙ্গের, গয়া, কাশী, লক্ষ্ণৌ, হরিদ্বার, ডেরাডুন কনখাল প্রভৃতি স্থানের বর্ণনা ও ভ্রমণ কথা আছে, পড়িতে পড়িতে আত্মহারা হইবেন। মনে হইবে স্বচক্ষে সব দেখি-তেছি। দেবালয় ও সাধু সন্ন্যাসীদের কথা পড়িলে কেবল সাত্ত্বিকভাবে হৃদয় পূর্ণ হইবে না ভক্তিরসেও হৃদয় পূর্ণ হইবে। মাতুল কাহিনী পাঠ করিলে হাসিতে হাসিতে পেটের নাড়ী ছিঁড়িবে। ইহা ভ্রমণবৃত্তান্ত হইলেও ব্যক্তিগত কথার সহিত এরূপভাবে লিখিত যে, উপন্যাস পাঠের সাধ মিটিবে। ইহাতে হরিদ্বার, ডেরাডুন, অযোধ্যা প্রভৃতির পথের কথা আছে। তীর্থযাত্রী ও ভ্রমণকারীর নিত্য প্রয়োজনীয়। মূল্য ১৲০ পাঁচ সিকা।

"জীবন সংগ্রাম" "মানব চিত্র" "সংসার চিত্র" ভবরামের উইল" "আমার ভ্রমণ" ইত্যাদি গ্রন্থপ্রণেতা—

শ্রীযুক্ত রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

আমার ডায়েরী।

ইহা একপ্রকার অভিনব গ্রন্থ। দিন দিন বঙ্গ সমাজের কত পরিবর্ত্তন হইতেছে—তাহা এই পুস্তক পাঠ করিলে হৃদয়ঙ্গম হইবে। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গের পল্লীসমাজ কি প্রকার ছিল—পল্লীজীবন কত মধুময় ছিল—তাহা গ্রন্থকার নিজজীবনের ইতিহাস হইতে উদ্ধৃত করিয়া এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা বাস্তব ঘটনায় পূর্ণ। গ্রন্থকার স্বয়ং, যে সকল ঘটনার স্মারক-লিপি রাখিয়াছিলেন —তাহারই মধ্যে কিয়দংশ লইয়া এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। পাঠে বিমল আনন্দ উপভোগ করিবেন। মনে হইবে যে, বুঝি উপন্যাস পাঠ করিতেছি। পুস্তকের ভাষা অতি প্রাঞ্জল। সুন্দর সিল্কের বাঁধাই—সোনার জলে নাম লেখা—মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।
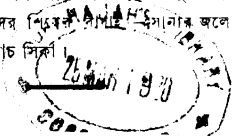
শিলং-পাহাড়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সে বোধ হয় আজ বিংশতি বর্ষের কথা। বিশ বৎসরের কথা হইলেও বিগত দিবসের কথা বলিয়াই মনে হইতেছে। তখন আসামে রেল হয় নাই। সে দিন আসাম হইতে ব্রহ্মপুত্রের উপর দিয়া ষ্টীমারে আসিতে আসিতে মা কামাখ্যা-দেবীর মন্দির দেখিতে পাইয়াছিলাম। দূর হইতে মন্দির-দর্শনে হৃদয়ের মধ্যে দেবী-দর্শনের যে আকাঙ্খা জাগিয়াছিল, দীর্ঘ বিশ বৎসরে তাহার এতটুকুও ম্লান হয় নাই। তখন হইতেই প্রাণে সাধ ছিল যে, মা কামাখ্যা-দেবীকে দর্শন করিতে আসিব এবং সেই সঙ্গে শিলং-পাহাড় দেখিয়া যাইব।

বিশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। সেই বিশ বৎসর পূর্ব্বে আমি যাহা ছিলাম, এখন আর আমি সে আমি নাই বিশ বৎসর পূর্ব্বের সেই অসীম সাহস, সেই অদম্য উৎসাহ সমস্তই চলিয়া গিয়াছে। সেই অতীত শৈশব, সেই যৌবন আজ তাহারা আমাকে বার্দ্ধক্য-হস্তে অর্পণ করিয়া কোথায় লুকাইয়াছে তাহার সন্ধান কে বলিয়া দিবে? বিশ বৎসর কাল স্রোতে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে, কত সুখ-দুঃখ কত হর্ষ-বিষাদ কালস্রোতে এই বিশ বৎসরের সঙ্গে কোন অজানা দেশে চলিয়া গিয়াছে, কে তাহার উত্তর দিবে? নীল-পর্ব্বতে কামাখ্যা-দেবীর দর্শন, এই বিশ বৎসরের মধ্যে ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই।

যখন আসামে গিয়াছিলাম তখন শিলংএর কত অভূতপূর্ব্ব কাহিনী, কত সৌন্দর্য্য-বর্ণনা লোক মুখে শুনিতাম; আর শিলং যাইবার জন্য অসহ্য আগ্রহ আমাকে অধীর করিয়া তুলিত। তখন বুঝি নাই বিধাতৃবিধান কেহ খণ্ডন করিতে পারে না, তখন বুঝি নাই, ইচ্ছা করিলেই তাহা তখনই পূরণ হয় না; তখন বুঝি নাই আজিকার সাধ পূর্ণ হইতে বিশ বৎসর বিলম্ব হইতে পারে? শিলং-পাহাড়ের কাহিনী, খাসিয়াদের কত অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প, তাহাদের আচার-ব্যবহার, তাহাদের উৎসব-আনন্দ, তাহাদের পজা-পার্ব্বণের

কথা শুনিতে শুনিতে তাহাদের দেশের এক অপূর্ব্ব দৃশ্য আমার মনকে উধাও করিয়া লইয়া যাইত। শিলং-দর্শনের আকাঙ্খাও অতি তীব্রবেগে হৃদয়ে জাগিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এই বিশ বৎসরের মধ্যে কামাখ্যা-দর্শনের ন্যায় শিলং-পাহাড় গমনের সুবিধা সুযোগ ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। কর্ম্মকোলাহলের মধ্যে মাঝে-মাঝে শিলং-পাহাড় ও নীল-পর্ব্বতে যাইবার বাসনা কতবার জাগিয়া উঠিতেছিল।

জ্যৈষ্ঠ মাসের বিষম গরমে কলিকাতায় প্রাণ ছট্‌ফট্ করিতেছিল। মস্তকের পীড়ায় কাতর হইয়া কোথায় যাই কোথায় যাই রব অহরহঃ প্রাণের নিভৃত প্রদেশ হইতে উত্থিত হইতেছিল। সে রব কেহ শুনিতে পায় নাই—কেবল শুনিতেছিলাম আমি আর সেই অন্তর্য্যামী।

জ্যৈষ্ঠের ভীষণ গরমে অসহনীয় মাথার যন্ত্রণায় একদিন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম শিলং যাইব। কেন এই প্রতিজ্ঞা তাহা পরে বলিব। এই সঙ্গে আজ বিংশতি বর্ষের আকাঙ্খা মা কামাখ্যাদেবীকে দর্শন করিয়া ধন্য হইব।

শিলং-পাহাড় ও কামাখ্যা গমনের সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ হইয়া গেল। যাত্রা করিবার দিনও স্থির করিলাম। এক ভৃত্য ও সাঁওতাল পরগণার কুণ্ডাবাসী আমার পুরাতন পাচকব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইব ইহাও স্থির করা হইল।

শিলং-পাহাড়।

বিশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। সেই বিশ বৎসর পূর্ব্বে আমি যাহা ছিলাম, এখন আর আমি সে আমি নাই। বিশ বৎসর পূর্ব্বের সেই অসীম সাহস, সেই অদম্য উৎসাহ সমস্তই চলিয়া গিয়াছে। সেই অতীত শৈশব, সেই যৌবন, আজ তাহারা আমাকে বার্দ্ধক্য-হস্তে অর্পণ করিয়া কোথায় লুকাইয়াছে তাহার সন্ধান কে বলিয়া দিবে? বিশ বৎসর কাল স্রোতে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে, কত সুখ-দুঃখ; কত হর্ষ-বিষাদ কালস্রোতে এই বিশ বৎসরের সঙ্গে কোন অজানা দেশে চলিয়া গিয়াছে, কে তাহার উত্তর দিবে? নীল-পর্ব্বতে কামাখ্যা-দেবীর দর্শন, এই বিশ বৎসরের মধ্যে ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই।

যখন আসামে গিয়াছিলাম তখন শিলংএর কত অভূত-পূর্ব্ব কাহিনী, কত সৌন্দর্য্য-বর্ণনা লোক মুখে শুনিতাম; আর শিলং যাইবার জন্য অসহ্য আগ্রহ আমাকে অধীর করিয়া তুলিত। তখন বুঝি নাই বিধাতৃবিধান কেহ খণ্ডন করিতে পারে না, তখন বুঝি নাই, ইচ্ছা করিলেই তাহা তখনই পূরণ হয় না; তখন বুঝি নাই আজিকার সাধ পূর্ণ হইতে বিশ বৎসর বিলম্ব হইতে পারে? শিলং-পাহাড়ের কাহিনী, খাসিয়াদের কত অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প, তাহাদের আচার-ব্যবহার, তাহাদের উৎসব-আনন্দ, তাহাদের পূজা-পার্ব্বণের

কথা শুনিতে শুনিতে তাহাদের দেশের এক অপূর্ব্ব দৃশ্য আমার মনকে উধাও করিয়া লইয়া যাইত। শিলং-দর্শনের আকাঙ্খাও অতি তীব্রবেগে হৃদয়ে জাগিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এই বিশ বৎসরের মধ্যে কামাখ্যা-দর্শনের ন্যায় শিলং-পাহাড় গমনের সুবিধা সুযোগ ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। কর্ম্মকোলাহলের মধ্যে মাঝে-মাঝে শিলং-পাহাড় ও নীল-পর্ব্বতে যাইবার বাসনা কতবার জাগিয়া উঠিতেছিল।

জ্যৈষ্ঠ মাসের বিষম গরমে কলিকাতায় প্রাণ ছট্‌ ফট্‌ করিতেছিল। মস্তকের পীড়ায় কাতর হইয়া কোথায় যাই কোথায় যাই রব অহরহঃ প্রাণের নিভৃত প্রদেশ হইতে উত্থিত হইতেছিল। সে রব কেহ শুনিতে পায় নাই—কেবল শুনিতেছিলাম আমি আর সেই অন্তর্য্যামী।

জ্যৈষ্ঠের ভীষণ গরমে অসহনীয় মাথার যন্ত্রণায় একদিন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম শিলং যাইব। কেন এই প্রতিজ্ঞা তাহা পরে বলিব। এই সঙ্গে আজ বিংশতি বর্ষের আকাঙ্খা মা কামাখ্যাদেবীকে দর্শন করিয়া ধন্য হইব।

শিলং-পাহাড় ও কামাখ্যা গমনের সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ হইয়া গেল। যাত্রা করিবার দিনও স্থির করিলাম। এক ভৃত্য ও সাঁওতাল পরগণার কুণ্ডাবাসী আমার পুরাতন পাচকব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইব ইহাও স্থির করা হইল।

গৃহিনী একটু বাঁকিয়া বসিলেন। "বলিলেন তুমি এসব দেখিয়া আসিবে; আমার ভাগ্যে ঘটিল না। আর তুমি কবে আমায় লইয়া যাইবে ইত্যাদি ইত্যাদি।"

স্ত্রী লইয়া সকলেই ঘর করেন সুতরাং ইত্যাদির ভাষান্তরিত করিবার প্রয়োজন নাই। সকলের ন্যায় আমিও দাম্পত্যকলহের বিরাট কাণ্ড হইতে নিবৃত্ত হইবার প্রয়াসী হইলাম। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যুক্তি-তর্ক যতটা যোগাইল তাহা প্রয়োগ করিতে বিন্দুমাত্রও ত্রুটী করি নাই; ইহা পাঠকগণকে না বলিলেও হয় তো এখন বুঝিয়াছেন। অবশেষে শেষ অস্ত্র অনুনয় বিনয় তাহাও যথাসম্ভব নিয়োগ করিলাম। প্রবল বন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণের ন্যায় আমার যুক্তি-তর্ক উপদেশ অবশেষে অনুনয়-বিনয় সব একে একে ভাসিয়া গেল।

স্বয়ং মহাদেব যাহা পারেন নাই—আমি তুচ্ছ মানব তাহাদের জয় করিব কেমন করিয়া সুতরাং অবশেষে গৃহিণীরই জয় হইল।

গৃহিণী, পুত্র, কন্যা, পাচক, ভৃত্য, এক কথায় সপরিবারেই যাত্রা করা স্থির হইয়া গেল। কারবারাদি পর্য্যাবেক্ষণের জন্য কেবল কনিষ্ঠভ্রাতা কলিকাতায় থাকিবেন স্থির হইল।

শুভদিনে শুভ-মুহূর্ত্তে শিলং-পাহাড় গমনের জন্ত বাহির হইলাম। লগেজ, জিনিষপত্র ও লোকজন শিয়ালদহের ষ্টেসনে ৭টার পূর্ব্বেই রওয়ানা হইয়া গেল। আমরা পরে গাড়ীর সময় গিয়া জুটিব স্থির হইল। ৪।৪৫ মিনিটে দার্জ্জিলিংমেলে আমাদিগকে যাইতে হইবে। আমরাও যথা সময়ে বন্ধু ও কনিষ্ঠের নিকট বিদায় লইয়া ঘোড়ার গাড়ীতে উঠিলাম। গাড়ী ছাড়িবার পূর্ব্বে এক বৎসরের শিশু পুত্র "টাকু" ক্ষুদ্র হাত দুটী দিয়া তাহার কাকার গলা জড়াইয়া ধরিল। জোর জবরদস্তী, টানা হেঁচড়াতেও সে গাড়ীতে উঠিতে চাহিল না। খোকার সেই কাঁদ কাঁদ ব্যাকুল-নয়নে তাহার কাকার মুখের দিকের একদৃষ্টে চাহনিতে সে আমাদের সেদিনকার যাত্রা পণ্ড করিয়া দিল। এত সাধের শিলং-পাহাড় সেদিন আমাদের যাওয়া হইল না। এদিন চিৎপুররোড পর্য্যন্তই আমাদের শিলং-যাত্রা শেষ হইল। ভাবিলাম মানুষ যাহা ভাবে তাহা কখনও হয় না। মানুষের অলক্ষিতে যে শক্তি কার্য্য করিতেছে, সেই শক্তির দ্বারাই মানুষ সর্ব্বদা পরিচালিত। আমাদের লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী জন্মের কর্ম্মফল ও সংস্কার আমাদের জীবন মরণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছে; আমাদের সাধ্য কি, আমাদের কতটুকু শক্তি যে, তাহা তাড়াইয়া স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে পারি। কত দিন কত প্রকার কার্য্য

করিব ভাবিয়াছি, তাহা করিতে পারি নাই। কিন্তু কখনও ভাবি নাই, কেন পারি নাই এবং দেখিয়াছি যাহা মুহূর্ত্তের জন্যও কখনও মনে উদিত হয় নাই, সেই কার্য্য মুহূর্ত্তে সমাধা হইয়া গিয়াছে। বলিতে পার কেন এমন হয়? বলিতে পার মানুষের স্বাধীনতা কতখানি? বলিতে পার যে কার্য্য করিবে বলিয়া মনে করিয়াছিলে, চিরজীবন পুনঃ পুনঃ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া সে কার্য্য করিতে পার নাই কেন? ইহাদের পশ্চাতে প্রাক্তন; কর্ম্মফল, সংস্কার। আমাদের যাহার যেমন সংস্কার বা কর্ম্মফল সময় হইলেই সেই সংস্কার ও কর্ম্মফলেই নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন হইয়া যায়।

এত উদ্যোগ আয়োজন সত্ত্বেও আমাদের শিলং-পাহাড় যাওয়া হইল না। পথে রেলগাড়ীতে খাবার জন্য যে খাবারগুলি হইয়াছিল রাত্রে খাইতে বসিলে গৃহিণী মৃদু হাসিয়া বলিলেন যে, মনে কর রেলে যাইতে যাইতেই খাইতেছ। এ টিপ্পনি মন্দ লাগিল না। আমার প্রাণের ভিতর তখন প্রাক্তন ও কর্ম্মফলের তুমুল দ্বন্দ্ব উঠিয়াছিল। মানুষের স্বাধীনতা কত টুকু মনে মনে তুলাদণ্ডে তখন মাপ করিতেছিলাম। গৃহিণীর কথায় কোনও উত্তর দিলাম না,— ভয় রাখিত? কিন্তু যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়—"উল্টা বুঝিলি রাম" হইয়া গেল। গৃহিণী বিষণ্নবদনে

বলিলেন, "আমাকে লইয়া যাওয়ার যদি এতই অনিচ্ছা, তুমি একাই যাও।"

স্বাধীনতা, কর্ম্মফল, প্রাক্তন সব আমার কর্পূরের মত মন হইতে উড়িয়া চলিয়া গেল। বলিলাম "না না, তুমি না গেলে আমার যাওয়াই হইবে না ; দূর দেশে কোথায় একা যাবো বল দেখি ?"

মানে মানে কলহের অঙ্কুর এইখানে বিনষ্ট করিলাম। কয়দিন অতি কষ্টেই কলিকাতাতে আমার দিন কাটিতে লাগিল। নীল-পর্ব্বত ও শিলং-পাহাড়ের ছবি অহরহঃ নয়ন সমক্ষে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ইংরাজী ১৯১৯ সালের ৩রা জুন শুক্রবারে গুরুদেব স্মরণ করিয়া গৃহের বাহির হইয়া পড়িলাম। গৃহিণী, আমি, তিনটী পুত্র, দুইটী কন্যা, একটী ভৃত্য, পাচক ও পুত্রের হ্যাটকোট পরা মাষ্টার ও আমার ভগ্নী ও তাহার কন্যা সর্ব্বসমেত বারটী প্রাণী বাহির হইলাম।

যাত্রাকালে মাষ্টার আমাকে বারবার অভয় প্রদান করিয়া বলিতে লাগিল,—"কুচ পরয়া নাই বাবু, জাহাজ ও রেল ঘুরিয়া ঘুরিয়াই আমি এত বড় হইয়াছি, আপনি কেবল গাড়ীতে চুপ্ চাপ বসিয়া থাকিবেন ; উঠা-নামা, লগেজ-করা, গাড়ী **Reserve** করা ; প্রয়োজন হইলে অভদ্র

যাত্রীর সঙ্গে ঘুসাঘুসি করিয়া বেঞ্চ অধিকার করা স
আমার কার্য্য রহিল।”

মাষ্টারের বক্তৃতায় তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আমি ভাবিতে লাগিলাম, বহুদূর ভ্রমণ করিতে হইবে, এমন এক জন লোক যদি সঙ্গী না পাইতাম তবে আমাকে হয়ত পথে কত অসুবিধাতেই পড়িতে হইত। মাষ্টারের বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া আমি ভগবানকে বারবার ধন্যবাদ দিতে লাগিলাম।

বেলা ৪।৪২ মিনিটে দার্জ্জিলিংমেলে আমরা উঠিয়া বসিলাম। গার্ড বাঁশী বাজাইয়া দিল; ড্রাইভার জোরে দুইবার বংশীধ্বনি করিল; দেখিতে দেখিতে গাড়ী ছুটিতে লাগিল।

আমার হৃদয়ে আনন্দ আর ধরে না। আজ বিংশতি বর্ষ যে আশা ও আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলাম, আজ তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে, ভগবানের অসীম দয়া মনে করিয়া বার বার তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। গাড়ীতে বসিয়া আমার সেই বিশ বৎসরের পূর্ব্বকার অবস্থার কথা ভাবিতে লাগিলাম। হায়! মানুষের কত পরিবর্ত্তন। আমাদের প্রতি বর্ষে; প্রতি মাসে, প্রতি দিনে, প্রতিদণ্ডে, প্রতি মুহূর্ত্তে যে পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, তাহা যদি আমরা দেখিতাম, বুঝিতাম ও প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে পারিতাম—তাহা হইলে আমাদিগকে ক্ষণস্থায়ী সুখের

আশায় সংসারে হাহারব করিতে করিতে জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে আসিয়া উপস্থিত হইতে হইত না। মানুষ কাল যাহা ছিল আজ তাহা নাই; একদিনে তাহার কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। আবার কাল তাহার কত পরিবর্ত্তন ঘটিবে।

কতক্ষণ কত কি ভাবিতেছিলাম মনে নাই, কুলীগুলা হাঁকিয়া উঠিল "সান্তাহার"। হঠাৎ আমার চমক ভাঙ্গিল। সান্তাহারে গাড়ী বদল করিয়া আমাদিগকে শিলংমেলে উঠিতে হইবে। আমি সকলকে লইয়া 'ওভার-ব্রিজ' পার হইতে লাগিলাম, মাষ্টার লগেজপত্র লইয়া অগ্রে গাড়ীর বন্দোবস্ত করিতে চলিয়া গেল। তাড়াতাড়ি আসিয়া অতি কষ্টে সকলকে গাড়ীতে উঠাইয়া বসাইলাম; গাড়ী ছাড়িতে আর বিলম্ব নাই, কিন্তু মাষ্টারকে দেখিতে পাইলাম না। অনেক কষ্টে পাচক ছুটিয়া গিয়া তাহাকে বাহির করিল এবং 'গাড়ী ছাড়িতে আর বিলম্ব নাই,' উচ্চৈঃস্বরে এই কথাগুলি তাহার কর্ণে প্রবেশ করাইয়া দিল। মাষ্টার বলিল "অত তাড়াতাড়ি করিও না; বসিয়া আরাম করিয়া এক কাপ চা খাইতে দাও।"

সমস্ত রাত্রির অন্ধকারের মধ্য দিয়া গাড়ী ছুটিতে লাগিল; গভীর রাত্রে আমরাও গাড়ীতে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নিদ্রাভঙ্গে দেখিলাম তখন ভোর হইয়া গিয়াছে। বেশ মৃদু মৃদু ঠাণ্ডা বাতাস আসিয়া গায়ে লাগিতেছে। চারিদিক ফর্শা হইয়া গিয়াছে। গাড়ী মাঠের মধ্য দিয়া শোঁ শোঁ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। বন্যবৃক্ষ ও লতাগুলি বাতাসে হেলিতেছে দুলিতেছে। মনে হইল যেন তাহারা মনের আনন্দে প্রভাতে বিভুর উদ্দেশে মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করিতেছে। মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। গাড়ী আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে দেখিলাম মাঠ হু হু করিতেছে, বোরো ধান্যগুলি বাতাসে হেলিয়া দুলিয়া অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। দেখিতে দেখিতে গাড়ী রঙ্গিলাষ্টেশনে আসিয়া পৌছিল। তখনও সূর্য্যোদয় হয় নাই। দূর গ্রাম হইতে গ্রামবাসীরা ষ্টেশনে দুগ্ধ বিক্রয় করিতে আসিয়াছে। ধর্ম্মভীরু গ্রামবাসীদের নিকট হইতে চারি আনায় দুই সের খাঁটী দুগ্ধ ক্রয় করিয়া কলিকাতার গোয়ালাদের কথা মনে পড়িল। হায়! ঐশ্বর্য্যময়ী বিলাস-স্রোত প্রবাহিতা কলিকাতা নগরী! কত পাপই না, বিনা

১১।২৭ মিনিটের সময় আমাদের গাড়ী আমিন-গাঁয়ে আসিয়া পৌছিল।

আমরা তাড়াতাড়ি লগেজপত্র লইয়া ষ্টীমারে উঠিলাম। মাষ্টার বিলম্বে আসিয়া ষ্টীমারে পৌছিল। বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসায় জানিলাম, তিনি চায়ের অনুসন্ধানে গিয়াছিলেন; এখানে একখানিও বাঙ্গালীর চায়ের দোকান না থাকায় বাঙ্গালীকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করিতেছিলেন। গোলামের জাতি, চিরকাল গোলামী করিয়া খাইবে তথাপি স্বাধীন ব্যবসা করিবে না ইত্যাদি বলিয়া তিনি গায়ের ঝাল মিটাইতে লাগিলেন।

ষ্টীমারে ব্রহ্মপুত্র পার হইতে হইতে গৌহাটীর জনৈক প্রসিদ্ধ উকীলের সহিত পরিচয় হইল। তাঁহার নিকট কামাখ্যা-পাহাড়ের জলকষ্টের কথা শুনিয়া আমার প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। নদীর জন্মস্থান পাহাড়ে, আজ সেই পাহাড়েই জলকষ্ট শুনিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলাম। লীলাময়ের সর্ব্বস্থানেই বিচিত্র লীলা! পরক্ষণে ভাবিলাম গত বিশ বৎসর ধরিয়া যে আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছি; জলাভাবে প্রাণ যাইলেও নীল-পর্ব্বতে গমন করিব।

জলকষ্টের আতঙ্কে নানারূপ চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে

আমরা ষ্টীমার হইতে তীরে অবতরণ করিলাম। দেখিলাম সেইখানে লেখা আছে "পাণ্ডু-ষ্টেশন"। এই পাণ্ডুষ্টেশনে কামাখ্যা যাইবার রেলগাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল। দেখিলাম একজন কামাখ্যার পাণ্ডা ব্রাহ্মণ একখানা টেলিগ্রাম হস্তে লইয়া ইতস্ততঃ ব্যস্ত হইয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে। বুঝিলাম পাণ্ডা আমাদেরই অনুসন্ধানে আসিয়াছে। আমাদের আগমন বার্ত্তা আমার অনুজ পূর্ব্বেই ইহাদিগকে তারযোগে জ্ঞাপন করিয়াছে।

ব্রহ্মপুত্রে স্নানাদি করিয়া আমরা গাড়ীতে উঠিলাম। অর্দ্ধ ঘণ্টা মধ্যেই আমরা কামাখ্যা-ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন বেলা দ্বিপ্রহর। রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে; ভীষণ গরম, পাহাড় তাতিয়া লাল হইয়া উঠিয়াছে। পাহাড়ের নিম্নে এক বৃক্ষতলে বসিয়া আমরা বিশ্রাম করিবার সঙ্কল্প করিলাম। সারা জীবন যাঁহারা হর্ম্ম্যাট্টালিকা ও সুখৈশ্বর্য্যের মধ্যে দিনাতিপাত করিয়া আসিয়াছেন, দুগ্ধফেন-নিভ শয্যা যাঁহাদের নিদ্রার অন্তরায় বলিয়া কতদিন মনে হইয়াছে, নানাবিধ মিষ্টান্ন যাঁহাদের রসনায় অতৃপ্তিকর ও কষ্টদায়ক বলিয়া উপেক্ষিত হইয়াছে, তাঁহাদের পক্ষে প্রবাসে বৃক্ষতলে বিশ্রাম, একটানা জীবনস্রোতে প্রকৃতি, কি যে স্বর্গীয় আনন্দ আনিয়া ঢালিয়া দেয় তাহা লিখিয়া জানাইতে

পারা যায় না। পাণ্ডা বারবার আমাদের সে সঙ্কল্পে বাধা দিতে লাগিল। "এই যে বাবু এখনই উঠিয়া পড়িব; আমরা দিনে দশবার উঠিতেছি নামিতেছি; সোজা পথ"। গৃহিনী বলিলেন "যে, পাণ্ডা যখন এতটা সাহস দিতেছে তখন অনর্থক গাছের তলায় বসিয়া সময় নষ্ট করা কেন?" কিন্তু এক্ষেত্রে গৃহিনীর কথা রক্ষা করিতে পারিলাম না। সকলেই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং বৃক্ষতলে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর পাহাড়ে গিয়া উঠিলাম; পাণ্ডা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

পাণ্ডার যত্নের সীমা নাই, প্রত্যেক কথাতেই "মা" "মা" করিয়া গৃহিনীর বাক্যের পোষকতা করিতেছে। পাণ্ডারা কিরূপ জীব, যাঁহারা তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছেন তাঁহারা বিশেষরূপে জানেন। সুতরাং আমাদের এই নবীন তীর্থ-গুরুর পরিচয় অনাবশ্যক। পাহাড়ে উঠিতে উঠিতে পাণ্ডা যেন কত আপনার জন হইয়া উঠিল। সে বার বার বলিতে লাগিল "বাবু একটু কষ্ট করিয়া উপরে চলুন; সেইখানে গিয়া বিশ্রাম করিবেন; আপনাদের আহারাদির জন্য পূর্ব্বেই আমার গৃহে বলিয়া পাঠাইয়াছি। কোনও কষ্ট হইবে না; জলকষ্টের জন্য ভয় পাইবেন না বাবু, ব্রহ্মপুত্র হইতে জল তুলাইয়া দিব"।

পাণ্ডা স্বর্গ আনিয়া হাতে দিতে লাগিল। আমি মনে মনে হাসিতে লাগিলাম। জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড রৌদ্রে, দিবা দ্বিপ্রহরে, অনাহারে রৌদ্রদগ্ধ পাহাড়ের উপর দিয়া গলদঘর্ম্ম হইয়া চড়াই ভাঙ্গিতে লাগিলাম। কিয়দ্দূর উঠিয়াই হাঁফাইতে হাঁফাইতে আমরা সকলে পাহাড়ের উপরে বসিয়া পড়িলাম। একটু উঠি, আবার বসিয়া পড়ি, আর পরস্পর মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে থাকি।

আবার কিয়দ্দূর উঠিলাম, আবার বসিয়া পড়িলাম। যাহারা গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রৌদ্রে, দ্বিপ্রহরে—অনাহারে—কখনও পাহাড়ের চড়াই ভাঙ্গিয়াছেন তাঁহাদিগকে আমাদের এই কষ্টের পরিচয় দিবার আবশ্যক হইবে না। যাঁহারা কখনও এ অবস্থায় পড়েন নাই তাঁহাদিগকে পরিচয় দিলেও তাঁহারা বোধ হয় ইহা কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না।

প্রাণঘাতী কষ্টে গলদঘর্ম্ম কলেবরে—আমরা পাহাড়ের অর্দ্ধাংশ অতিক্রম করিলাম। তখন সূর্য্য প্রায় পশ্চিমগগনে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। আমাদের কাহারও এমন শক্তি নাই যে, আমরা পাহাড়ে আর উঠিতে পারি—ভাবিলাম এই স্থানেই আমাদিগকে আজ থাকিতে হইবে। পিপাসায় তখন আমাদের প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। প্রাণ বুঝি বাহির হইয়া যায়। পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে কেবল চাহিতে লাগিলাম,

কথা কহিবার শক্তি পর্য্যন্ত তখন লোপ হইয়া গিয়াছে। কোথায় একটু জল পাওয়া যায়—কিন্তু পাহাড়ের উপর জল প্রাপ্তির সম্ভাবনা একেবারেই নাই। গৃহিণী আমার অবস্থা বুঝিতে পারিয়া একটী শঁসা ভাঙ্গিয়া তাহার অর্দ্ধাংশ আমার হস্তে দিলেন। আমি শঁসার অর্দ্ধাংশ অমূল্য বস্তু জ্ঞানে যখন খাইতেছিলাম, তখন গৃহিণী একটু হাসিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বুঝিলাম এই হাসি ও চাহনি তাঁহার তিরস্কার। ষ্টীমার হইতে নামিয়া গৃহিণী যখন কতকগুলি শঁসা কিনিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন আমি তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়াছিলাম। এখন তিনি চাহনি ও হাঁসিতে বলিলেন "তখন যদি শঁসা না কিনিতাম, তাহা হইলে মহাশয় এখন যে কি করিতেন তাহা একবার ভাবিয়া দেখুন।"

গৃহিণীর মনোভাব বুঝিয়া তাঁহাকে প্রশংসা করিতে লাগিলাম। তখন তিনি আনন্দচিত্তে আর একটী শঁসা বাহির করিয়া তাহার অর্দ্ধাংশ অতি আদরের সহিত পুনর্ব্বার প্রদান করিলেন। তাহার পর—আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সকলকেই শঁসা বিতরণ করিয়া সেই বিজন পাহাড়ের মধ্যে সে দিন প্রাণ বাঁচাইয়াছিলেন। দরিদ্রের অর্থ প্রাপ্তির ন্যায় সকলেরই হাত পাতিয়া শঁসা গ্রহণ ও কচি শঁসার শীতল রসে রসনা সিক্ত করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন, সে এক অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার।

জীবনে এই স্মরণীয় দিনের কথা কখনও বিস্মৃত হইতে পারিব না।

বহুক্ষণ বিশ্রাম করিবার পর আমরা আবার ধীরে ধীরে কামাখ্যা-পাহাড়ে উঠিলাম, তখন বেলা শেষ হইয়া আসিয়াছে। সূর্য্যদেব যেন কাহার আগমনে আত্মগোপন করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। যখন আমরা পাহাড়ে উঠিলাম, তখন আর আমাদের আনন্দের সীমা নাই। কামাখ্যামন্দিরের চূড়া দর্শন করিয়া আনন্দে প্রাণ বিহ্বল হইয়া উঠিল। বহু দিনের সাধ আজ বুঝি পূর্ণ হইল। দূর হইতে মাকে ভক্তিভরে করজোড়ে প্রণাম করিতে লাগিলাম।

কামাখ্যা-দেবীর মন্দির দর্শন করিয়া আমাদের সকল কষ্ট, সকল অবসাদ অচিরে বিদূরিত হইয়া গেল। মায়ের মন্দির যে দর্শন করিতে পাইব, পর্ব্বতের অর্দ্ধ পথে আসিয়া সে আশা আমাদের ছিল না।

কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর স্ত্রীলোকেরা স্নান করিতে গেলেন। আমি এক দৃষ্টে মায়ের মন্দিরের দিকে চাহিয়া রহিলাম। আজ আমি মহা পীঠস্থানে আসিয়াছি, মাকে দর্শন করিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল। ভাবিতে লাগিলাম হিন্দুর সব গিয়াছে, কিন্তু এমনও তীর্থস্থান আছে,—আছে বলিয়াই মধ্যে মধ্যে হিন্দু তাহার চির সন্তপ্ত-প্রাণ

নীল পর্ব্বতোপরি শ্রীশ্রী৺কামাখ্যা দেবীর মন্দির।

জড়াইতে পায়। কি অপরূপ স্থান মাহাত্ম্য। তীর্থে আসিলেই প্রাণ এই ধুলা মাটীর সংসার হইতে কোন এক আনন্দরাজ্যে যাত্রা করে তাহা বলিতে পারি না। দ্বেষ, হিংসা, আসক্তির বন্ধন ক্ষণেকের তরে নিস্তব্ধ হইয়া থাকে। ভাবিতে ভাবিতে প্রাণ কেমন এক রকম হইয়া গেল। উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলাম "মা কবে আমার আসক্তির বন্ধন শিথিল করিয়া দিবি মা। বুঝিতেছি, এতো আমাদের চির আবাসভূমি নহে; বুঝিতেছি কোটী জন্ম আসিতেছি যাইতেছি; তবু ভাবি কেন মা এইটাই আমার ঘর, ভাবি কেন মা, স্ত্রীপুত্র, ভাইভগ্নী আত্মীয়স্বজন সবই আমার; বুঝাইয়া দে মা, তাহারা আমার কে? আমি কোনটার? কেন মা নিত্য ভুলিয়া যাই—কেন ভুলিয়া যাই সংসারে যাওয়া-আসার কথা"।

"জলের কি হবে গো পিপাসায় যে মলাম?" হঠাৎ এই কাতরধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিয়া আমার চিন্তাস্রোতে বাধা প্রদান করিল। স্ত্রীলোকেরা স্নান করিতে যাইয়া যে জলকষ্টের বিষয় বর্ণনা করিলেন শুনিয়া আমার প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। পাহাড়ের উপর একটী মাত্র কূপ, তাহাতে একহাত পরিমিত জল। শতাধিক নরনারী সেই জলটুকু গ্রহণ করিবার জন্য ব্যাকুল অন্তরে তীরে দণ্ডায়মান।

সে এক অপরূপ দৃশ্য। কাড়াকাড়ি মারামারি। কেহ বলিতেছে "আজ সমস্ত দিন আমরা এক বিন্দু জল পান করিতে পাই নাই," "কেহ বলিতেছে "একটু জল না পাইলে, আজ আর আমাদের অন্নব্যঞ্জন পাক হইবে না"। জলকষ্টের কাহিনী শ্রবণ করিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলাম। পাহাড়ের উপর জল প্রাপ্তির আশা একেবারে ত্যাগ করিয়া দ্বিগুণ পারিশ্রমিক দিয়া আমরা ব্রহ্মপুত্রে জল আনিতে পাঠাইলাম। ব্রহ্মপুত্র হইতে জল আনয়ন করাও এক ভীষণ ব্যাপার। দুইমাইলের অধিক পাহাড়ের গা বাহিয়া নীচে অবতরণ করিতে হইবে। কুলীরা তাহাদের অভ্যাসবশতঃ কলসী স্কন্ধে লইয়া নামিয়া যায় বটে—কিন্তু জলপূর্ণ কলসী লইয়া উঠিবার সময় তাহারা গলদঘর্ম্ম হইয়া যায়। যাহারা খুব কষ্টসহিষ্ণু এবং বলবান তাহারাও সমস্ত দিনে দুইবারের অধিক জল লইয়া আসিতে পারে না।

বহু চেষ্টা করিয়াও আমরা সেদিন দুই কলসীর অধিক জল সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। সুতরাং সেই দুই কলসী জলের দ্বারাই আমাদের স্নান আহার, হস্ত-পদ প্রাক্ষালন ইত্যাদি সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইল। পুস্তকে মরুভূমির কথা পড়িয়াছিলাম, কিন্তু তাহার মধ্যে পথিকের জলকষ্টের কথা ঠিক উপলব্ধি করিতে পারিতাম না। আজ দুই কলসী জলের

উপর নির্ভর করিয়া অতি কষ্টে আমরা সেই রাত্রে আহারাদি সমাধা করিয়া মরুভূমির কষ্টের কথা কিয়দংশ অনুভব করিলাম। শয্যা প্রস্তুত করিবামাত্র শয়ন করিতেই কঠিন শ্রমজনিত অবসাদে অভিভূত হইয়া তৎক্ষণাৎ নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলাম। নিদ্রাদেবী তাঁহার শান্তিপূর্ণ সুকোমল ক্রোড়ে সমস্ত রজনী আমাদিগকে স্থান প্রদান করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অতি প্রত্যূষে আমাদের নিদ্রাভঙ্গ হইল। আমরা সকলে ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিবার জন্য বাসা হইতে বাহির হইলাম। জঙ্গলের মধ্য দিয়া পর্ব্বতের গাত্র বাহিয়া যে পথ নীচে নামিয়াছে, সেই পথ ধরিয়া আমরা অবতরণ করিতে লাগিলাম। একটু পা পিছলিয়া পড়িলেই, একটু অসাবধান হইলেই একেবারে পর্ব্বতনিম্নে ব্রহ্মপুত্রে আসিয়া পড়িতে হইবে। অতি সন্তর্পণে আমরা ধীরে ধীরে ব্রহ্মপুত্র স্নানের উদ্দেশ্যে নামিতে লাগিলাম। দুইপার্শ্বে অবশ্য নানাবিধ ফল ও ফুলের গাছ, পাখীর কলরব; সেই কষ্টের উপরেও আমাদিগকে আনন্দদান করিতেছিল। পথে কত সাধুসন্ন্যাসী, আমাদের ন্যায় কত তীর্থযাত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইল, তাঁহারাও ব্রহ্মপুত্রে স্নানের নিমিত্ত নিম্নে অবতরণ করিতেছেন। দেখিলাম একটী অশীতিবর্ষবয়স্কা বৃদ্ধা তাঁহার এক পুত্র ও দুই পুত্র বধূর সাহায্যে ব্রহ্মপুত্রে স্নানের জন্য অবতরণ করিতেছেন। হিন্দুরমণীর অপূর্ব্ব ধর্ম্মবিশ্বাস ও সাহস দেখিয়া আমাদের প্রাণে নববলের সঞ্চার হইল। ব্রহ্মপুত্রে অবতরণ করিয়া

দেখিলাম স্নানের কোনও ঘাট নাই! সেইখানে কতকগুলি বৃহদাকার পাথর পড়িয়া আছে। পাথরগুলির অর্দ্ধাংশ তীরে ও অপরাংশ জলে ডুবিয়া রহিয়াছে। তাহারই উপর বসিয়া আমরা স্নান ও আহ্নিক সমাধা করিলাম।

স্নানান্তে আমরা পর্ব্বতারোহণ করিতে আরম্ভ করিলাম। একটু উঠি, আবার বসি, আবার একটু উঠি, আবার বসি। এইরূপে কষ্ট ও আনন্দের মধ্য দিয়া আমরা পর্ব্বতের উপর উঠিলাম। তখন সকলেরই গাত্র হইতে প্রবল বেগে স্বেদ নির্গত হইতেছিল। একটী বৃক্ষতলে কিছুক্ষণ আমরা বিশ্রাম করিয়া মায়ের মন্দিরের সমীপে উপস্থিত হইলাম। মন্দির দ্বারে উপস্থিত হইতেই কি এক অপূর্ব্ব আনন্দে হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠিল তাহা বর্ণনা করিবার মত শক্তি আমার নাই।

মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, পাণ্ডা পূজার সমস্ত আয়োজন করিয়া রাখিয়াছে। বস্ত্র, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, হোমকাষ্ঠ ও ঘৃত ইত্যাদি সকলই আমাদের উপদেশ মত পাণ্ডা সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিল। প্রাণ ভরিয়া মায়ের পূজা করিলাম। তখনকার হৃদয়ের ভাব, সাধ থাকিলেও ভাষায় ব্যক্ত করিবার সাধ্য নাই। বিশবৎসরকাল যে আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলাম, আজ সেই আশা পূর্ণ করিয়া জীবন সার্থক ও দেহ পবিত্র হইল জ্ঞান করিলাম।

পূজান্তে মায়ের মন্দিরে চণ্ডীপাঠ ও হোম করাইলাম। পীঠস্থানে মায়ের মন্দিরে চণ্ডীপাঠ ও হোম করাইবার ইচ্ছা বহুদিন হইতেই ছিল। জগজ্জননী আজ সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিলেন। মায়ের মন্দিরের ভিতরে কোথাও চণ্ডীপাঠ হইতেছে, কোথাও বা যোগী সন্ন্যাসীগণ একান্ত মনে ধ্যানে রত হইয়াছেন। সে এক অপূর্ব্ব পবিত্র দৃশ্য। একস্থানে দেখিলাম কয়েকটী বিধবা ধ্যানস্থা হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। মায়ের মন্দিরে মায়ের মত পবিত্র বিধবাগণকে পূজানিরতা দেখিয়া আনন্দাশ্রুতে নয়ন ভরিয়া আসিল। এই সমস্ত দর্শন করিয়া আমার আর মন্দির হইতে বাহির হইবার ইচ্ছা রহিল না। এই এক অপূর্ব্বভাবের মিলন দেখিয়া মন্দির মধ্যে বসিয়া রহিলাম। আমার সঙ্গের সঙ্গীরা একে একে সকলেই বাসায় চলিয়া গেলেন। আমি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া মন্দির মধ্যে বসিয়া রহিলাম।

মন্দিরে কতক্ষণ এই ভাবে বসিয়াছিলাম ঠিক জানি না। যখন পাণ্ডা আসিয়া আমাকে উঠাইল তখন দিবা অবসান প্রায়।

আহারাদি সমাপনান্তে মায়ের মন্দিরের ভিতর যাইয়া বসিয়া আছি, তখন সকলেই একবাক্যে জলকষ্টের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। সকলেরই ইচ্ছা পাহাড়ের নিম্নে

যাইয়া যেখানে জলকষ্ট নাই, পিপাসার জল যেখানে মিলিবে, সেই স্থানে যাইয়া বাসা লওয়া। সকলেরই আগ্রহদর্শনে অন্যত্র যাওয়াই স্থির হইল। নানা পরামর্শ ও জল্পনাকল্পনার পর ব্রহ্মপুত্রের সন্নিকটে একটী বাসা ঠিক করিবার জন্য মাষ্টার পূর্ব্বাহ্নে চলিয়া গেলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে পাণ্ডাকে লইয়া আমরা পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিতে আরম্ভ করিলাম।

পর্ব্বতের উপর হইতে কিয়দ্দূর অবতরণ করিতে না করিতে, সূর্য্যদেব ধীরে ধীরে পাহাড়ের পশ্চিম দিকে ডুবিয়া যাইতে লাগিলেন। যতই তিনি সরিয়া যাইতেছিলেন, পাহাড়ও তত অন্ধকার হইয়া আসিতেছিল। ক্রমশঃ অন্ধকার ঘন হইতে ঘনতর হইয়া পাহাড়কে ঘিরিয়া ফেলিল। আমরা একটী মাত্র আলোকের সাহায্যে পাহাড়ের গাত্র বহিয়া অবতরণ করিতে লাগিলাম।

নামিতে নামিতে পরস্পর পরস্পরের ঘাড়ে আসিয়া পড়িতে লাগিলাম। কাহারও মাথা ঠুকিয়া গেল, কাহারও আশঙ্কায় পা জড়াইয়া আসিল, কেহ বা বলিয়া উঠিল "তীর্থ মাথায় থাক, একবার বাড়ী ফিরিতে পারিলে, আর নয়?" সেদিন্ সেই অন্ধকারে পাহাড় হইতে অতিকষ্টেই আমরা অবতরণ করিতে পারিয়াছিলাম। তখন রজনী প্রায় এক প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। আমরা দুইখানি অশ্বশকটে

আরোহণ করিয়া মাষ্টার নির্দ্দিষ্ট বাসার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। মাষ্টারবাবু যথাসময়ে চা না পাওয়ায় বোধ হয় তাঁহার মনটী তখন বিগড়াইয়াছিল, তিনি কিছুতেই সেই অন্ধকারের মধ্যে তাঁহার নির্দ্দিষ্টবাসা ঠিক করিতে পারিলেন না। বিপদের উপর বিপদ।

প্রায় একঘণ্টাকাল আমরা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিতে লাগিলাম। বাসার আর সন্ধান পাওয়া গেল না। ভাড়াটিয়া ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ানেরা কিরূপ ভদ্রব্যক্তি তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। কেহ যেন মনে না করেন, তীর্থস্থানের গাড়োয়ানগুলি বেশ ধার্ম্মিক ও ভদ্রলোক। তাহাদের উপদ্রব ও অত্যাচার খুব বেশী, কারণ তাহাদের চক্ষুলজ্জার ভয় করিবার কোন কারণ নাই, দুই দিনের জন্য আলাপ, দুই দিন পরে কোন সম্বন্ধ থাকিবে না, সেজন্য তাহারা যাত্রীদের নিকট হইতে একরূপ জুলুম করিয়া টাকা আদায় করে। তাহারা মাষ্টারবাবুকে উদ্দেশ করিয়া নানারূপ অভদ্রোচিত বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল। মাষ্টারবাবু তখন তাহার মাথার হ্যাট্‌টী একবার বাঁ হাতে করিয়া খুলিতেছিলেন, আবার পরিতেছিলেন। হাতের ছড়ি গাছটী কখনও মাটীতে ঠুকিতেছিলেন, কখনও গাড়োয়ানের দিকে তুলিয়া "চোপরাও" বলিয়া লাফাইয়া উঠিতেছিলেন। তিনি

যে রেলগাড়ী, জাহাজ, ও অশ্বযানে পৃথিবীর বহুস্থান পরিভ্রমণ করিয়াছেন, এ কথা চীৎকার করিয়া গাড়োয়ানদ্বয়কে শুনাইতে বিস্মৃত হইলেন না। ক্রমশঃ ব্যাপার গুরুতর হয় দেখিয়া আমি গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম। অদূরে একটী খড়ের বাঙ্গালায় আলো জ্বলিতেছিল। সেই আলো লক্ষ্য করিয়া আমি সেই দিকে অগ্রসর হইলাম। কিয়দ্দূর যাইয়াই দেখি, সেই বাঙ্গালার অধিবাসীও মাষ্টারের চীৎকার শুনিয়া ব্যাপারটা কি বুঝিবার জন্য ঘটনাস্থলে আসিতেছিলেন। মধ্যপথে তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। সেই ভদ্রলোকের সাহায্যে আমরা বাসার ঠিকানা পাইয়া সেই রাত্রের মত এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইলাম।

এই বাঙ্গালাটী একটী জমীদারবাবুর। তাঁহারা কখনও কখনও আসিয়া এই বাঙ্গালায় অবস্থান করেন, সুতরাং বাঙ্গালাটীতে থাকিবার উপযুক্ত কোনরূপ বন্দোবস্ত ছিল না। মাষ্টার তাহার জিনিষপত্র ফেলিয়াই তিনটী ইট আনিয়া চা চাপাইয়া দিলেন। চারিদিকে দীপ জ্বালিয়া সেই রাত্রি আমরা সেখানে কাটাইলাম। মাষ্টার যে বাসা ঠিক করিবার পক্ষে একজন উপযুক্ত লোক এবং এ সম্বন্ধে যে তাহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে, সকলেই তাহাকে এই সার্টিফিকেট দিয়াছিলেন।

জলকষ্টের আশঙ্কায় যেখান হইতে পলাইয়া আসিলাম, কেহ যেন মনে করিবেন না যে, সেখানে বার মাস এই প্রকারের জলকষ্ট। শুনিলাম, গ্রীষ্মের কয় মাস এইরূপ জলাভাব ঘটিয়া থাকে। তারপর বর্ষাসমাগমে পুনরায় তড়াগ, পুষ্করিণী, কূপ সমস্ত জলে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। আমরা কলিকাতার লোক, সামান্য জলাভাব সহ্য করিতে পারি না, কারণ মিউনিসিপ্যালিটীর কৃপায় বারমাস জল কিনিয়া খাই, সুতরাং জলকষ্ট সংবাদপত্রে পড়িয়া থাকি, অনুভব করিতে পারি না।

আমরা পর্ব্বত হইতে নামিয়া নীচে ব্রহ্মপুত্রতীরে বাসা লইলাম। এ পর্য্যন্ত নানাদেশে কত নদনদী দেখিয়াছি, কিন্তু,এত বড় বিস্তৃত নদ ইতিপূর্ব্বে আর কখনও দেখি নাই। ব্রহ্মপুত্রদর্শনে হৃদয়ের ক্ষুদ্রত্ব যেন এক নিমিষে কোথায় মিলাইয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে এক মহান্ বিরাটত্বের অভিনব কল্পনা আপনাআপনি অন্তরের মধ্যে জাগিয়া উঠে। উচ্ছৃঙ্খল চিন্তার স্রোত যেন সহসা এই বিরাটত্বের মধ্যে একাগ্রতার অভিনব সূত্রটী অবলম্বন করিয়া বিপুল আনন্দে তন্ময় হইয়া যায়। সত্যসত্যই এই নদে স্নান করিলে সর্ব্বপাপ হরণ হয়। ব্রহ্মপুত্র নদ গিরিশ্রেষ্ঠ হিমালয় পর্ব্বতের উত্তর কৈলাসপর্ব্বতের সন্নিহিত মানস-সরোবর

হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ভগবান্ পরশুরাম পিতৃ-আজ্ঞায় মাতৃহত্যা করায় যখন কুঠার কোন ক্রমেই তাঁহার হস্ত হইতে স্খলিত হইল না, যখন নানা তীর্থভ্রমণ করিয়া বহু তপস্যার দ্বারা মাতৃহত্যার চিহ্ন-স্বরূপ কুঠার নিজ হস্ত হইতে বিদূরিত করিতে পারিলেন না, তখন তিনি এই ব্রহ্মকুণ্ডে আসিয়া স্নান করিয়া তর্পণাদি করিলে পর, তাঁহার হস্তের কুঠার স্খলিত হইয়া পড়ে। ব্রহ্মকুণ্ডকে সেই অবধি অনেকেই পরশুরামকুণ্ড বলিয়া থাকেন। ভারতবর্ষের সকল তীর্থে স্নান করিয়া পরশুরামকুণ্ডে স্নান না করিলে যেন তীর্থ করার সার্থকতা হয় না। অনেক সাধুসন্ন্যাসী প্রতি বৎসর মেলা উপলক্ষে এখানে স্নান করিতে আসেন। এই ব্রহ্মপুত্র নদের সৌন্দর্য্য নয়নমনমুগ্ধকর। এক কথায় 'ব্রহ্মপুত্রে' দর্শনে মানবের চিরক্ষুদ্রত্ব যেন মুহূর্ত্তে লয় পাইয়া এক অভিনব আনন্দ-পুরুষের কথা বারম্বার মনে করাইয়া দেয়।

যদিও খুব শীঘ্র আমরা কামাখ্যা ত্যাগ করিয়া শিলং চলিয়া আসিলাম, তথাপি কামাখ্যার অপূর্ব্বসৌন্দর্য্য আমাদের অন্তরে চিরপ্রবিষ্ট হইয়া আছে। আমরা যে সময় কামাখ্যা ত্যাগ করি, তাহার অল্পদিন পরে 'অম্বুবাচী' উৎসব, সেজন্য বিপুল আয়োজন চলিতেছিল। আমার ইচ্ছা ছিল, যে এখানে অম্বুবাচী দেখিয়া পরে শিলং যাইব।

কিন্তু জলকষ্টের জন্য এবং মেলা উপলক্ষে আর বহুলোক
সমাগম হইলে এতগুলি প্রাণী লইয়া পাছে কষ্টে পড়ি,
ভাবিয়া চলিয়া আসিতে বাধ্য হইলাম।

কামাখ্যার মূল মন্দিরে প্রবেশ করিবার সময় মন্দির
দ্বারের বাম দিকের দেওয়ালের গাত্রে একখানি প্রস্তর ফলকে
নিম্নলিখিত শ্লোকটী খোদিত আছে।

"লোকানুগ্রহ কারকঃ করুণয়া, পার্থো ধনুর্বিদ্যয়া,
দানে নাপি দধিচি কর্ণ সদৃশো, মর্য্যাদয়াম্ভোনিধিঃ।
নানাশাস্ত্র বিচার চারুচরিতঃ কন্দর্প রূপোজ্জ্বলঃ
কামাখ্যাচরণার্থেকো বিজয়তে শ্রীমল্লদেব নৃপঃ॥
প্রসাদ মদ্রিদুহিতুশ্চরণারবিন্দং।
ভক্ত্যা করোত্তদমুজবর নীল শেলে শ্রীশুক্লদেব,
ইমযুগ্মসিতোপলেন শাকে তুরঙ্গগজ বেদশশাঙ্কসংখ্যে॥
তস্যৈব প্রিয়সোদর পৃথুযশাঃ বীরেন্দ্র মৌলীস্থলী
মাণিক্য ভজমান কল্পবিটপী নীলাচলে মঞ্জুলম্।
প্রাসাদম্ মণিনাগ বেদ শশভৃৎ শাকে শিলারাজিভিঃ
দেব ভক্তি মতান্নরো রচিতবান্ শ্রীশুক্লপূর্ব্বধ্বজঃ।"

এই শ্লোক পাঠে অবশ্য বুঝিতে পারা যায় যে, ১৪৮১
শকে রাজা মল্লধ্বজ এবং ১৪৮৭ শকে তাঁহার সহোদর ভ্রাতা
শুক্লধ্বজ এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করিলে, তাঁহার শরীরের এক এক অংশ যে যে স্থানে পতিত হইয়াছিল, সেই সকল স্থান পীঠ-স্থান বলিয়া পরিচিত। কামরূপে দেবীর মহামুদ্রা পতিত হইয়াছিল। ইহাও একান্নপীঠের এক পীঠ।

পর দিন প্রত্যুষে উঠিয়া ব্রহ্মপুত্রের তীরে বেড়াইতে বাহির হইলাম এবং এখানকার বাজার, ষ্টীমার ষ্টেশন; গৌহাটীকলেজ প্রভৃতি দেখিয়া আসিলাম। গৌহাটী সহরটী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও ব্রহ্মপুত্রের তীরে ইহা অবস্থিত বলিয়া ইহার শোভা অতি মনোরম।

অপরাহ্ণে আহারাদির পরে অফিস অঞ্চলের দিকে বেড়াইতে বাহির হইলাম। এখানের টেলিগ্রাফ্ অফিসটী অতি সুন্দর। বহু বাঙ্গালী ও ইংরেজ কর্ম্মচারী চাকরী উপলক্ষে এখানে বাস করিয়া রহিয়াছেন। এইস্থানে একটী ভদ্রলোকের সহিত আলাপ হইল। মানুষ যে এতটা অকপট, সরল ও পরোপকারী হইতে পারে, ইহা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। মনে হইল লোকটী বাহিরে যাহা দেখাইতেছে, তাহা ভাণ মাত্র। ভিতরে কিছু না কিছু একটা উদ্দেশ্য আছে।

ভদ্রলোকটীর নাম "অনন্তবাবু," জাতিতে আমার স্বজাতি, ব্রাহ্মণ। ইনি আমাদের শিলং-যাত্রার কথা শুনিয়াই জিজ্ঞাসা

করিলেন "সেখানে কি থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট আ :
নির্দ্দিষ্ট নাই শুনিয়াই বলিলেন "চলুন তবে একটা
টেলিগ্রাম করিয়া আসি" আমি আপত্তি না করিয়া তাঁহার
সঙ্গে চলিলাম। তিনি টেলিগ্রাম করিয়া দিলেন "Starting
with Calcutta friends, engage house Laban."

সন্দেহটা আমার আরও বৃদ্ধি পাইল। বিনা অনুরোধেই
তাড়াতাড়ি আসিয়া ইনি টেলিগ্রাম করিলেন কেন?
নিশ্চয়ই ইঁহার কোনও স্বার্থ আছে। অল্পক্ষণ মাত্র ইঁহার
সহিত পরিচয় হইয়াছে। ইহার মধ্যে friend হইয়া
গেলাম কিরূপে? মনে মনে ভাবিলাম, লোকটার কোনও
অসাধু 'মতলব' আছে নাকি?

মানুষ নিজের মন লইয়াই পরকে বিচার করে।
যাহার যেমন প্রবৃত্তি, যাহার যেরূপ মন, সে অপরকেও
তাহার সেই মনযন্ত্রে ফেলিয়া মাপ করিয়া লয়। ইহাই
মানুষের ধর্ম্ম। আমাদের মত সহস্র মানুষের মধ্যে যদি
একজন আনন্তবাবু থাকেন তবে তাঁহাকেও আমরা আমা-
দের মত মনে না করিব কেন? বাসায় রাত্রে আসিয়া
শয়ন করিলাম কিন্তু নিদ্রা হইল না। অনন্তবাবুর কথাই
বার বার মনে উদিত হইতে লাগিল। গৃহিণী আসিয়া
জিজ্ঞাসা করিলেন "শিলং-পাহাড়ে বাড়ী ভাড়ার কি হইল?"

আমি অনন্তবাবুর ক্ষুদ্র ইতিহাস বর্ণনা করিলাম। গৃহিণী একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "লোকটী জুয়াচোর।" শিহরিয়া উঠিলাম। ভাবিলাম হইতে পারে। মনে হইল হয় ত, স্ত্রীলোক পুরুষের চেয়ে শীঘ্র লোক চিনিতে পারে। গৃহিণী অনন্তবাবুকে বোধ হয় চিনিতে পারিয়াছেন। তন্দ্রাঘোরে বারবার মনে হইতে লাগিল সহস্রের মধ্যে, লক্ষের মধ্যে কি একটীও খাঁটী মানুষ নাই। বাহিরে যাহারা নিঃস্বার্থপরতা দেখায়—পরোপকারের ভাব দেখায়—সকলেরই কি তাহা ভাণমাত্র? চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গৌহাটীর মটর-ষ্টেশনে পৌঁছিতেই আমাদের একটু বিলম্ব হইয়াছিল। যাহারা "পথে নারী বিবর্জ্জিতা" ভুক্তভোগী তাঁহারা বোধ হয় এই বিলম্বে পৌঁছিবার জন্য আমাকে দোষ দিতে পারিবেন না। আমাদের গাড়ী যখন ষ্টেশনে পৌঁছিল, তখন মটর ছাড়িতে মাত্র দুই মিনিট বিলম্ব হইয়াছে। বুঝিলাম, আমাদের শিলংযাত্রা আজ এইখানেই শেষ করিতে হইল। দুই মিনিটের মধ্যে টিকিট করা; মালপত্র লগেজ করা একেবারেই অসম্ভব। অদূরে দেখিলাম একটী ফিরি-ওয়ালার নিকট হইতে মাষ্টার চা লইয়া চোঁ চোঁ করিয়া গলাধঃকরণ করিতেছেন। আমাকে দেখিয়াই এক নিশ্বাসে বলিয়া উঠিলেন **"all complete"**। ব্যাপারটা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। মৃত্তিকানির্ম্মিত চায়ের গ্লাসটা ভূমে আছড়াইয়া দিয়া একলম্ফে মাষ্টার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন; "টিকিট লগেজ সব হইয়াছে—আপনারা মটরে উঠিয়া বসুন।" কৌতুহলদৃষ্টিতে মাষ্টারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। আমার অবস্থা বুঝিতে পারিয়া অনন্তবাবু

বিনয়নম্রস্বরে বলিলেন, "টাকা আমার কাছে ছিল, টিকিট, করিয়া রাখিয়াছি, তাহার জন্য কিছু মনে করিবেন না"। আমি তখন ব্যাপারটা সমস্ত বুঝিতে পারিলাম। এই ভদ্রলোক এরূপভাবে আমাদিগকে সাহায্য না করিলে, সে দিন আমাদের শিলং যাওয়া হইত না। গৃহিণী পূর্ব্বদিনের কথাটা আমাকে স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য কয়েক মুহূর্ত্ত আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। আবার মনে হইল, সকলেই কি আমাদেরই মত কেবল একটা মানুষের খোলস পরিয়া বেড়াইতেছে। ভিতরে কি সকলেরই পশুবৃত্তি কার্য্য করিতেছে? আমার চিন্তার কিছুই মীমাংসা হইল না। অনন্তবাবুকে অনুরোধ করিয়া আমার পার্শ্বে মটরে বসাইলাম। মটর বাঁশী বাজাইয়া ছুটিতে লাগিল। আমরা চারিদিকের নানারূপ শোভা দেখিতে দেখিতে, চলিতে লাগিলাম। মটর যখন তেইশ মাইল উর্দ্ধে উঠিয়াছে, তখন হঠাৎ মটরের কল খারাপ হইয়া গেল। গৌহাটী হইতে যাহা কিছু খাদ্য দ্রব্য আনিয়াছিলাম, এই তেইস মাইল আসিতে আসিতেই তাহা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। পাহাড়ের উপর খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিবার কোনও উপায় ছিল না। তেইশ মাইল আসিয়াই যে মটরের চাকা খারাপ হইয়া যাইবে এই দৈববিড়ম্বনার কথা তখন মনে করিতে পারি নাই।

ড্রাইভার ষ্টেশনে ভাঙ্গামটরখানা মেরামত করিল, কিন্তু তাহার পূর্ব্বশক্তি আর ফিরিয়া আসিল না। অতিকষ্টে ভাঙ্গামটরখানা জরাজীর্ণ বৃদ্ধের ন্যায় ধীরে ধীরে চলিয়া আমাদিগকে অর্দ্ধেকপথ লইয়া আসিল। তখন বেলা চারিটা। আমাদের তিনটার সময়—শিলং পৌঁছিয়া দিবার কথা।

আমরা যেখানে আসিয়া পৌঁছিলাম, সেটা একটা মটর ষ্টেশন। মটর সেইস্থানে আসিবামাত্র পুলিশের লোক আসিয়া দুইদিকের গেট বন্ধ করিয়া আমাদের সকলের নাম ধাম লিখিয়া লইতে লাগিল। এইস্থানে সাহেবদের জন্য একটা Tea Ho se আছে। হিন্দুদের জন্য কোনও ব্যবস্থা দেখিলাম না। অদূরে একটা খাসিয়া রমণীর চায়ের দোকান ছিল। মটর থামিবামাত্র মাষ্টার তাহার ছাত্রের হাত ধরিয়া খাসিয়া রমণীর দোকানের দিকে ছুটিল। ফিরিয়া আসিয়া চায়ের সুখ্যাতি মাষ্টারের মুখে আর ধরে না। হাত মুখ নাড়িয়া খাসিয়া রমণীর চায়ের অজস্র প্রশংসা মাষ্টারের মুখ হইতে বর্ষণ হইতে লাগিল। মটর কোম্পানী আমাদিগকে বেলা তিন ঘটিকার সময়ে শিলংএ পৌঁছিয়া দিবে এই সর্ত্তে আমাদিগের নিকট হইতে টাকা লইয়াছিল। কিন্তু কথায় ও কার্য্যে বিপরীত হইল। সমস্ত দিনই একপ্রকার সকলে অসহায় অবস্থায় মটরে বসিয়া ছট-ফট-করিতে

লাগিলাম। আমাদের গাড়ীতে জনৈক চট্টগ্রাম নিবাসী দরিদ্র কায়স্থ ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁহাকে ক্ষিপ্ত শৃগালে দংশন করিয়াছিল। ভদ্রলোকটী সরকারের সাহায্যে ও অনুকম্পায় পাথেয় পাইয়া শিলং হাসপাতালে চিকিৎসার্থ গমন করিতেছিলেন। ভদ্রলোকটীও আমাদের ন্যায় প্রথম শিলংয়ে আসিতেছেন। তাঁহার পথ-ঘাট কিছুই জানা ছিল না। মটর সম্বন্ধেও তাঁহার কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, মটরে চড়িয়া যখন শিলং যাইব, তখন পবনের বেগে উড়াইয়া লইয়া, হয় তো একঘণ্টায় শিলং পৌঁছাইয়া দিবে। ভদ্রলোকটীর সঙ্গে আহারীয় দ্রব্য কিছুই ছিল না। আমি সঙ্গের লোকজন ও সন্তানসন্ততি লইয়া ব্যস্ত; সত্য কথা বলিতে কি, তখন আমি নিজে ক্ষুধার যন্ত্রণায় অস্থির, পরের ভাবনা কে ভাবে। ভদ্রলোকটী খাইয়াছে না খাইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য আমার ব্যস্ততা মোটেই ছিল না। দেখিলাম, অনন্তবাবু ভদ্রলোকটীর জন্য মহা ব্যস্ত। যখন তিনি শুনিলেন যে, শৃগাল-দংষ্ট্রিত ভদ্রলোকটীর সমস্ত দিনের মধ্যে কিছু খাওয়া হয় নাই, তখন অনন্তবাবুর দয়ার্দ্রহৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া চক্ষু দুটী ছল ছল করিতে লাগিল। কিরূপে তাঁহাকে কিছু খাইতে দিতে পারেন এই চিন্তায় অনন্তবাবু

পাগলের ন্যায় চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। অনন্তবাবুর অবস্থা দেখিয়া ভাবিতে লাগিলাম, ইহার মধ্যেও কিছু স্বার্থ আছে নাকি ?

আমাদের স্বার্থান্ধ মন সর্ব্বদা সঙ্কীর্ণতার পঙ্কে নিমগ্ন আছে। নিঃস্বার্থ পরোপকারিতার সহিত যে মনের কস্মিন-কালে পরিচয় নাই ; যে মন একমাত্র আত্মসুখ ও স্ত্রীপুত্র পরিজন ব্যতীত জগৎসংসারটাকে চিরকাল পর বলিয়াই ভাবিয়া আসিয়াছে ; সেই মন বিচার করিয়া অনন্তবাবুর ন্যায় লোককে বলিবে না কেন, যে ইহার স্বার্থত্যাগের অন্তরালে একটা গুপ্ত অভিসন্ধি লুক্কায়িত আছে। আমরা যে মন লইয়া ঘর করিতেছি ; পর্ব্বত ও অরণ্যনিবাসী হিংস্র জন্তুর মন হইতে আমাদের মন উন্নত কিনা সে পক্ষে ঘোর সন্দেহ আছে।

দেখিতে দেখিতে, একখানা মটর শিলং হইতে ছুটিয়া আসিল। ড্রাইভার মটরের অবস্থা পর্য্যালোচনার জন্য তাহার দ্রুতগামী মটরের গতিরোধ করিল। শিলং আগত সেই মটর খানিতে কয়েকজন ভদ্রলোক যাত্রী ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে দুই জন বাঙ্গালীকেও দেখিলাম। মটরখানির গতিরোধ হইবামাত্র অনন্তবাবু লাফাইয়া পড়িয়া শিলং সমাগত মটরখানির সম্মুখে যাইয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন,

"আপনাদের কাহারও কাছে কিছু খাবার জিনিষ আছে কি? একটী ভদ্রলোকের সমস্ত দিন আহার হয় নাই, যদি থাকে তবে অনুগ্রহ করিয়া কিঞ্চিৎ আহার্য্য দ্রব্য আমাকে ভিক্ষা দিন।"

জনৈক ভদ্র বাঙ্গালী অনন্তবাবুকে ক্ষুধার্ত্ত মনে করিয়া কয়েকখানি রুটি, বিস্কুট ও কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন প্রদান করিলেন। অনন্তবাবুর তখনকার মুখের ভাব দেখিয়া বোধ হইল যে, লক্ষ মুদ্রা পাইলেও বোধ হয় মানুষ এতটা আনন্দিত হয় না। অনন্তবাবু জোর করিয়া শৃগাল-দংষ্ট্রিত সেই ভদ্রলোকটীকে সেগুলি আহার করাইলেন। অনন্তবাবুর প্রদত্ত আহারীয় দ্রব্যগুলি যে ভাবে সেই চট্টগ্রামবাসী ভদ্রলোকটী ক্ষুধার জ্বালায় উদরস্থ করিলেন, তাহাতে বোধ হইল, লোকটীর পুর্ব্বদিনেও আহার হয় নাই। আমরা সকলেই এক গাড়ীতে ছিলাম, কিন্তু এই ভদ্রলোকটীর অবস্থা কেহই তো হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই! অনন্তবাবু কিরূপে লক্ষ্য করিলেন? একবার মনে হইল, যাহার হৃদয় যতটা উন্নত ও নির্ম্মল, সে পরের অবস্থাটা বুঝিতে ততখানি সক্ষম। পরক্ষণে কিন্তু আবার মনে হইল, অনন্তবাবুর একটা কিছু স্বার্থ আছে। নচেৎ লোকটীর এতটা মাথা ব্যথা কেন?

আমাদের মটরখানা খারাপ হইবার সংবাদ পাইয়া গৌহাটী হইতে আর একখানা মটর প্রবল বেগে ছুটিয়া আসিল। মটর কোম্পানীর এই কার্য্যতৎপরতা দেখিয়া প্রকৃতই তখন মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম। মনে মনে ভাবিলাম, ইহাদের ব্যবসার উন্নতি হইবে না, ত কাহার হইবে ?

খরিদ্দারদের জন্য যাহারা এতটা কার্য্যতৎপরতা দেখাইতে পারে তাহারাই প্রকৃত সহৃদয় ব্যবসায়ী।

মটরখানা যেস্থানে আসিয়া পৌছিল, সেখান হইতে শিলং পঁচিশ মাইল দূরে। তখন রজনী আট ঘটিকা অতীত-প্রায়। মটর-চালক একজন শিখ। তাহার আজানুলম্বিতবাহু ; প্রশস্ত বক্ষঃস্থল, মস্তকে বৃহৎ পাকড়ী ; সৌম্যমূর্ত্তি, বয়সে বৃদ্ধ। দেখিলাম, মটর-কোংর কর্ত্তৃপক্ষ অবস্থা বুঝিয়া উপযুক্ত মটর চালকটী আমাদের জন্য পাঠাইয়াছেন। মটর কোম্পানীর প্রধান পরিচালক যে, বহুদর্শী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাঁহার এই কার্য্যেই আমাদের বেশ প্রতীয়মান হইয়াছিল। কার্য্যাধ্যক্ষ বুঝিয়াছিলেন, যে ভদ্রলোক যাত্রী স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া সমস্তদিন অনাহারে পর্ব্বতপথে ভগ্ন মটরেব উপর বসিয়া কত কষ্ট ও বিরক্তি না ভোগ করিতেছেন। তাঁহারা উপযুক্ত অর্থ দিয়া মটর ভাড়া করিয়াছেন। তিনটার সময় শিলং পৌছিয়া দিবার জন্য স্বীকার করিয়াছি, তাঁহারা যে

আজ অসহনীয় কষ্ট পাইতেছেন, এই জন্য আমরা একমাত্র দায়ী। এ সময়ে একজন যেসে লোক দিয়া মটর পাঠাইয়া দেওয়া তিনি সঙ্গত মনে করেন না।

মটরখানি আমাদের পার্শ্বে পৌঁছিবামাত্র সৌম্যমূর্ত্তি বৃদ্ধ শিখ-ড্রাইভারটী তাড়াতাড়ি মটর হইতে অবতরণ করিয়া করজোড়ে বলিতে লাগিল "বাবুসাব হামলোক আপলোককো বহুত তকলিব দিয়া; লেড়কাবাচ্ছা লেকে আপ্‌লোকক। বহুত দুঃখ হুয়া; কেয়া করে গা বাবুসাব" শেষে বাঙ্গালাভাষায় গৃহিণীকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিল, "মাজী! পুত্রের অপরাধ মাফ করবেন। আমি এই কোম্পানীর প্রধান ড্রাইভার, গাড়ী **Examine** করিয়া শিলং পাঠাইবার ভার আমারই উপর। যথাসাধ্য **Examine** করিয়া গাড়ী পাঠাইয়াছিলাম, আমার জ্ঞানবুদ্ধি যতটুকু তাহার মধ্যে আমি কোন ত্রুটী করি নাই। গাড়ী খারাপ হইবার জন্য আমিই দায়ী মাজী; আপনাদের এই কষ্টের জন্য বিশেষতঃ ছোট ছোট বালক বালিকাদের কষ্টের জন্য যে পাপ; যে অপরাধ হইয়াছে, সে সবই আমার। আমি আপনার একটী বুড়াছেলে; ছেলে বুড়া হোলেও, মায়ের কাছে বুড়া নয়; আমাকে মাপ কর মাজী।" দেখিলাম গৃহিণীর চক্ষের কোণ হইতে

দুই ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িল ; বোধ হয় গৃহিণীর মাতৃস্নেহ দ্রবীভূত হইয়া এই অশ্রু দুই ফোঁটা চক্ষু কোণে আসিয়া জমিয়াছিল।

শিখ-ড্রাইভারের অন্তরটী আমি তখন দেখিতে পাইতেছিলাম। তাহার হৃদয়ের কোমলতা, পবিত্রতা, মধুরতা ও সাধুতা ; সর্ব্বোপরি সহানুভূতি যাহা একমুহূর্ত্তে আমাকে শিখ ড্রাইভারের গুণমুগ্ধ করিয়া ফেলিল। আমি শিখ-ড্রাইভারের মুখের দিকে চাহিয়া তখন কত কি ভাবিয়াছিলাম, এখন আর তাহা মনে নাই। আমার বাহ্যজ্ঞান পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

"গাড়ীপর উঠিয়ে বাবুসাব" শিখ-ড্রাইভার এই কথা বলিয়া যখন তাহার মটরে উঠিয়া বসিতে অনুরোধ করিল, তখন দেখিলাম, শিখ-ড্রাইভার অতি যত্নের সহিত সকলকে তাহার মটরের উপর বসাইয়া দিয়াছে। কেবল আমি তাহার মটরে উঠি নাই, বলিয়া সে মটর ছাড়িতে পারিতেছে না। তাহার ভাব ও ভঙ্গী দেখিয়া বুঝিলাম যে, তিন ঘণ্টার পথ তিন মিনিটে লইয়া যাইবার জন্য সে যেন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। তাহার উজ্জ্বল চক্ষু দুটী যেন বলিতেছিল, "আপনাদিগকে কষ্ট দিয়া আজ যে পাপ করিয়াছি, আমার মটর চালনার যদি শিক্ষা, দীক্ষা ও সাধনা থাকে, তবে

তিন মিনিটে এই মটর শিলং পাহাড়ে উড়াইয়া লইয়া যাইয়া সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব"।

আমি ড্রাইভারের পার্শ্বে গিয়া বসিলাম। এই স্বার্থপূর্ণ দেহটা তাহার পবিত্র দেহে স্পর্শ করাইয়া বসিয়া পড়িলাম। শাস্ত্রে ও গুরুমুখে শুনিয়াছি, সৎসঙ্গ ব্যতীত মানুষের মুক্তি হয় না। আজ এই শিখ-ড্রাইভারের অঙ্গে অঙ্গ মিলাইয়া সেই গুরুবাক্য মনে হইতে লাগিল।

শিখ-ড্রাইভার দুইবার উচ্চৈঃস্বরে বংশীধ্বনি করিয়াছিল। তেমন বংশীধ্বনি আর কখনও শুনি নাই। শুনিব বলিয়াও আর মনে করি না। শিখ-ড্রাইভার বাছিয়া বাছিয়া, বুঝি এই মটরখানি আনিয়াছিল। পবনের বেগের সহিত এই মটরের বেগ যদি তুলনা করি, তাহা হইলে অত্যুক্তি হয় না। শিখ-ড্রাইভার মটর চালাইয়া দিল। ধন্য তাহার মটর চালনার শক্তি, ধন্য তাহার শিক্ষা ও সাধনা! পর্ব্বতের গা বাহিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া যখন মটর পবনকে পরাজয় করিয়া ছুটিতেছিল; তখন মনে হইতেছিল, মটর চালক বুঝি, মন্ত্রবলে আকাশে মটরখানিকে উড়াইয়া লইয়া যাইতেছে। একে অন্ধকার রজনী; তাহার উপর মটরের প্রবল গতিতে আমরা কিছুই আর দেখিতে পাইলাম না। মাঝে মাঝে, বালকবালিকারা নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া যাওয়াতে হাঁফাইয়া

উঠিতে লাগিল। "কিছু ভয় নাই মা জী; নিশ্চিন্ত হইয়া আপনারা বসিয়া থাকুন।" শিখ-ড্রাইভারের এই সান্ত্বনা-বাক্য দেবতার অভয়বাণীর মত মাঝে মাঝে, কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। তার স্বর যেমনই মধুর তেমনি আন্তরিক সহানুভূতিতে উহা পরিপূর্ণ।

ছয় মাসের পথ ছয় দণ্ডে আনিয়া রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় শিখ-ড্রাইভার, আমাদিগকে শিলংএ পৌঁছিয়া দিল। শিখ-ড্রাইভারর নিকট বিদায় লইবার সময় তাহার বাসার ঠিকানা আমি জানিয়া লইলাম এবং পরদিন প্রত্যুষে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব মনস্থ করিয়া বাসাভিমুখে চলিয়া গেলাম। কনকনে শীতের মধ্যে লেপ ও কম্বল মুড়ি দিয়া রাত্রে শয়ন করিলাম বটে, কিন্তু সেই শিখ-ড্রাইভারের পবিত্রমূর্ত্তি অহরহঃ আমার হৃদয়ের মাঝে ভাসিয়া উঠিল। সে রাত্রি সু-নিদ্রা হইল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রাতে উঠিয়াই শিখ-ড্রাইভারের বাসায় যাইয়া উপস্থিত হইলাম। আমি যাইবামাত্র আমাকে আদর করিয়া তাহার খাটিয়ার পার্শ্বে আমাকে বসাইল। নানা কথার পর আমি শিখ-ড্রাইভারের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম। শিখ-ড্রাই- ভার তাহার জীবনের যে পরিচয় প্রদান করিয়াছিল; তাহার দুই একটী সংক্ষিপ্ত কথা পাঠকগণকে শুনাইতেছি।

শিখ-ড্রাইভার বলিল "আমার বয়স ৭৬ বৎসর ৭ মাস চলিতেছে"। প্রথম তাহার বয়সের কথা শুনিয়াই আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। শিখ-ড্রাইভারের প্রশস্ত বক্ষঃস্থল, উজ্জ্বল চক্ষু; তেজপুঞ্জ দেহ দেখিলে, আমার ন্যায় চল্লিশে বৃদ্ধ বাঙ্গালী কি করিয়া বিশ্বাস করিবে, যে শিখ-ড্রাইভারের বয়স ৭৬ বৎসর ৭মাস।

আমার মনোভাব বুঝিয়া শিখ-ড্রাইভার বলিল—"অবিশ্বাস করিবেন না বাবু; চতুর্দ্দশবর্ষ বয়স হইতে আজ পর্য্যন্ত আমি কখনও মিথ্যা কথা বলি নাই। চতুর্দ্দশবর্ষ বয়সের সময় আমার পিতৃদেবের নিকট আমি একটী

প্রতারণাপূর্ণ মিথ্যা কথা কহিয়াছিলাম। তাহাতে তিনি ভীষণ বিপদজালে জড়িত হন। পিতার সেই ভীষণ দুর্গতি অবলোকন করিয়া আমি পিতৃদেবের পদস্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, জীবনে কখনও মিথ্যা কহিব না। আজ পর্য্যন্ত ভগবানের আশীর্ব্বাদে সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া আসিতেছি—জানি না, শেষ পর্য্যন্ত এ সত্য পালন করিতে পারিব কি না? যদি কোন দিন না পারি, এমন সন্দেহের ছায়া মনে আসে তবে আশীর্ব্বাদ করুন যেন এই বৃদ্ধ তাহার পূর্ব্বেই হাসিতে হাসিতে জীবন ত্যাগ করিতে পারে। সে মৃত্যু আমার গৌরব মৃত্যু বলিয়া অপূর্ব্ব আনন্দ হইবে। পিতা যে বিপদজালে জড়িত হইয়াছিলেন; অপমান ও অপদস্থ হইবার চিন্তাতেই তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। ইহার কিছুদিন পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুর আমিই একমাত্র কারণ বাবুসাব।"

বলিতে বলিতে, তাহার দুই নয়ন বহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল, ৭৬ বৎসরের বৃদ্ধ বালকের মত কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাহার অশ্রু দেখিয়া আমারও নয়ন আর্দ্র হইয়া উঠিল।

পরক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইয়া শিখ-ড্রাইভার বলিতে লাগিল, 'আমার পিতা দেশের জমীদার ছিলেন; পিতার

আমিই একমাত্র সন্তান, অল্পবয়সেই আমার জননী পিতার ক্রোড়ে আমাকে শয়ন করাইয়া অমরধামে চলিয়া গিয়াছিলেন। মাতা ও পিতার উভয়ের ভালবাসাই পিতৃদেবের নিকট আমি পাইতাম। পিতা আমাকে যখন ত্যাগ করিয়া গেলেন, তখন সংসার আমার বিষ বোধ হইতে লাগিল। মাসে তিন সহস্র টাকা পিতার জমীদারী ও বিষয়াদির আয় ছিল। আমার বাসভূমির উপর পিতার নামে এক অতিথিশালা খুলিয়া দিয়া আমার এক পিতৃ-বন্ধুর উপর অতিথিশালা পরিচালনের ভার অর্পণ করিয়া এক গভীর নিশীথে আমার স্বগ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলাম। বহুদিন আমি পৃথিবীর নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়াছি; কত নদ নদী, কত তড়াগ সরসী, কত বন উপবন; কত পর্ব্বত মরুভূমি, কত দেশ মহাদেশ; কত তীর্থস্থান দেবালয় আমি যে দর্শন করিয়াছি বাবুসাহেব তাহা আর কি বলিব। ভারতের উত্তর সীমায় ভ্রমণ করিতে করিতে, এক দিন দেখিলাম, এক জন ধনগর্ব্বিত বড়লোক তাহার মটরের চাকায় একটী দরিদ্র রমণীকে নিষ্পেষিত করিয়া চলিয়া গেল। ধনগর্ব্বিত মোহান্ধ জমিদার একবার পশ্চাতের দিকে ফিরিয়া চাহিল বটে—কিন্তু দরিদ্র রমণীও যে মানুষ; তাহারই ন্যায় তাহারও যে সুখ দুঃখ বোধ করিবার ক্ষমতা

আছে; দরিদ্ররমণীরও জীবন যে, তাহারই জীবনের মত, একথা সে বড়লোক বলিয়াই বোধ হয় চিন্তা করিল না। যুবক মটর হাঁকাইয়া চলিয়া গেল। দরিদ্র রমণীর স্বামী অদূর জঙ্গলে তখন কাষ্ঠ কাটিতে গিয়াছিল; ইহার স্ত্রী জঙ্গলে যাইয়া সেই কাষ্ঠ আনিয়া বাজারে বিক্রয় করিবে। একেই অনেক বেলা হইয়া গিয়াছে, তাহার উপর কাঠের বোঝা লইয়া বাজারে বিক্রয় করিতে হইবে তাহার পর গৃহে ফিরিয়া আসিয়া স্বামীর জন্য রন্ধন করিতে কতই বেলা হইয়া যাইবে, স্বামী কখন আহার করিবে, দরিদ্ররমণী অন্যমনস্কে এই বিষয় চিন্তা করিয়া স্বামীর সহিত মিলিত হইবার জন্যই দ্রুতপদে গমন করিতেছিল। তারপর এই আকস্মিক দুর্ঘটনা। আমি দরিদ্ররমণীকে স্কন্ধে লইয়া তিনমাইল দূরে হাঁসপাতালে চলিয়া গেলাম। তাহার স্বামী যখন এ সংবাদ পাইল তখন পাগলের মত কুঠার স্কন্ধে কাঁদিতে কাঁদিতে, আমার পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতে লাগিল।

বহু চিকিৎসায় বহু কষ্ট ও যন্ত্রণার মধ্যে দরিদ্ররমণীর জীবনরক্ষা হইল। সেইদিন হইতে আমার মনে হইতে লাগিল, মটর চালনা শিক্ষা করিলে, অনেক সময়ে অনেকের হয় তো জীবনরক্ষা ও উপকার করিতে পারিব। যে মুহূর্ত্তে দাম্ভিকজমিদার দরিদ্ররমণীকে মটরের চাকায় দলিত করিয়া

চলিয়া গেল সেই মুহূর্ত্তেই আমার মনে হইয়াছিল, যদি আমি মটর চালাইতে জানিতাম তাহা হইলে তুই লম্ফে ছুটিয়া যাইয়া দাম্ভিক পশুকে পদাঘাতে ভূলুণ্ঠিত করিয়া দরিদ্ররমণীকে মটরে বসাইয়া চিকিৎসকের অনুসন্ধানে ছুটিতাম। এই ঘটনার পর হইতে আমি মটরচালকেরবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি। বড় বড় মটর কোম্পানীতে আমি চাকরী করিয়াছি, মটর মেরামত বিদ্যাও আমি জানি। আমি এখানে সাড়ে চারি শত ৪৫০৲ বেতন পাই। আহারাদির জন্য মাসিক ১৫৲ টাকা মাত্র আমি নিজের কাছে রাখিয়া দিই।"

ঠিক এই সময়ে কতকগুলি দরিদ্র খাসিয়া আসিয়া শিখ-ড্রাইভারের সম্মুখে দাঁড়াইল।—ইঁহাদের মধ্যে তিন চার জনের পা নাই—কয়েকজন অক্ষম বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা।

"দয়া কোরে একটু বসুন বাবুসাহেব; আমি এখনই আসিতেছি" এই বলিয়া আমার উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া অন্ধ খঞ্জ ও বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে সঙ্গে লইয়া শিখ-ড্রাইভার চলিয়া গেল।

শিখ-ড্রাইভার কোথায় গেল জানিবার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইল; আমিও অতি সন্তর্পণে পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতে লাগিলাম। শিখ-ড্রাইভার আমাকে দেখিতে পাইল না।

শিখ-ড্রাইভার উহাদিগকে সঙ্গে লইয়া শিলংএর পুলিশ-বাজারের একটী খাসিয়ার মুদিরদোকানে যাইয়া উপস্থিত হইল। আমি দোকানের পশ্চাতে যাইয়া ব্যাপারটী কি দেখিবার জন্ত উদ্গ্রীব অন্তরে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম।

শিখ-ড্রাইভার কাহাকেও সাত দিনের উপযোগী, কাহাকেও দশ দিনের উপযোগী; কাহাকেও বা দুই সপ্তাহের উপযোগী চাউল, ডাউল ও আলু ক্রয় করিয়া দিল। খাসিয়া দোকানদার হিসাব করিয়া বলিল "ষোল টাকা নয় আনা হইয়াছে।" শিখ-ড্রাইভার দুইখানি দশটাকার নোট তাহার হাতে দিয়া বলিল, "বাকিটা তোমার কাছে জমা থাকুক; আর তিনজন আসিতে পারে নাই, তাহাদের চাল ডাল দিও। আমি আজই গৌহাটী ফিরিয়া যাইব।"

আমি ছুটিয়া যাইয়া শিখ-ড্রাইভারের বক্ষঃস্থলে মাথা দিয়া তাহাকে চাপিয়া ধরিলাম।

শিখ-ড্রাইভার বলিল "এত কষ্ট করে কেন এলে বাবু—আমিতো এখনই ফিরিয়া যাইতেছি, আপনাকে বসাইয়া রাখিয়া আসা আমার বড়ই অন্যায় হইয়াছে, আমাকে মাপ করুন। আমি মনে মনে, ড্রাইভারকে বলিলাম, ভাই আমার ন্যায় স্বার্থান্ধের কাছে তুমি ক্ষমা চাহিবার উপ-যুক্ত নও। সেদিন শিখ-ড্রাইভারের সঙ্গসুখে ও তাহার

দহবাসে যে সুখ ও শান্তি লাভ করিয়াছিলাম, তাহাতে আমার শিলংগমন সার্থক হইয়াছিল। শিখ-ড্রাইভার বলিয়াছিল "বাবু আমার ব্রত শেষ হইয়া আসিয়াছে— আমি আর অল্পদিন এখানে থাকিব; গুরুদেবের হুকুম আসিয়াছে—তাঁহার কাছে আমাকে যাইতে হইবে।" শিলং ত্যাগ করিবার সময় শিখ-ড্রাইভারকে অনেক খুঁজিলাম, অফিসে যাইয়া অনুসন্ধান করিলাম কিন্তু তাহাকে আর দেখিতে পাইলাম না। আর একবার শিখ-ড্রাইভারকে দেখিবার সাধ হইতেছে, কিন্তু আর বুঝি তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অনন্তবাবু পূর্ব্বে যে ভদ্রলোককে টেলিগ্রাম করি
ছিলেন, তিনি আমাদের জন্য একটি সুন্দর বাঙ্গালা ভা
করিয়াছিলেন। এই বাঙ্গালাটী লাবানে খুব উচ্চ পাহাড়ে
উপর নির্ম্মিত। আমরা বাঙ্গালায় বসিয়া শিলং-পাহাড়ে
নয়নাভিরাম দৃশ্য অবলোকন করিয়া মুগ্ধ হইতে লাগিলাম
অনন্তবাবু নিজের কি একটী কার্য্যের জন্য শিলংএ আসিয়
ছিলেন; ৪।৫ দিনের মধ্যে তাঁহার শিলং-পাহাড় হইতে
অবতরণ করিয়া যাইবার কথা; অনন্তবাবুর সঙ্গ ত্যা
করিতে আমার অসহনীয় কষ্ট হইতে লাগিল। আমে
অনুনয় বিনয় করিয়া অনন্তবাবুকে আমাদের বাসাতে
ধরিয়া রাখিলাম। সেদিন আহারাদির পর গৃহিণী আমা
একবার কাণে কাণে বলিলেন, "অনন্তবাবু লোকটা হ
অত্যন্ত বোকা, না হয় উহার কোনও স্বার্থ বা গু
অভিসন্ধি আছে"।

শিলংএর নিত্য নূতন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখি
আমাদের সময় আনন্দে অতিবাহিত হইতে লাগিল

হাবানপাহাড় হইতে নীচের সমুদয় বাঙ্গালাগুলি ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র শুভ্র কুটীরের ন্যায় দেখা যাইতেছিল।

সেই দিন আহারাদির পর অনন্তবাবুকে সঙ্গে লইয়া শিলং-বাজার ও উচু নীচু পাহাড় দিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত বেড়াইয়া আসিলাম। চারিদিকে ছোট বড়, নতোন্নত পর্ব্বতশ্রেণী দেখিতে অতি সুন্দর। স্থানে স্থানে গিরিশৃঙ্গগুলি পরস্পরে প্রতিযোগিতা করিয়া যেন সকলেই সকলকে নিম্নে রাখিয়া উপরে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে। এ যেন মেঘরাজ্য, আকাশ-পাহাড়ের মহা-সম্মিলন ক্ষেত্র।

বাজারে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই একটী খাসিয়া-রমণীর দোকান হইতে শাক-সব্জী তরীতরকারী ক্রয় করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। তাহার খাসিয়াভাষা বুঝিতে অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল, কেবল ইসারা ইঙ্গিতে তাহাকে মনোভাব বুঝাইতে লাগিলাম। সেও ইসারা ইঙ্গিতে আমাকে দর দাম বুঝাইয়া দিল। জ্যৈষ্ঠ মাসে কলিকাতার Municipal marketএ তখন একটী কপির মূল্য ।।০ হইতে ৸০ আনা। কড়াইসুটী ৸০ বার আনার কম নহে; আলু ৶০ আনার অধিক মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। এই তিনটী জিনিসই এখানে পর্য্যাপ্ত ও সুলভ। আমরা দুইটী বড় কপি ৶০ আনায়, ⁄৪ কড়াইসুটি ।৶০ আনায়; ⁄৫ সে

আলু ৶১৫ পয়সায় ও অন্যান্য কিছু শাক-সব্জী ক্র করিলাম।

আলু এখানকার প্রধান ফসল। আলুর ন্যায় কোনঃ ফসলই এখানে দেখিতে পাইবেন না। পাহাড়ের উপর ধানের চাষ হয় না, সুতরাং অন্য স্থান হইতে চাউল আসিলে তবে এখানকার লোকের জীবন ধারণ হয় আমাদের বাঙ্গালাদেশে যেরূপ চাষী লোকেরা ধানের চাষ করিয়া জীবন ধারণ ও সংসার নির্ব্বাহ করে— এখানে তদ্রূপ আলুর চাষেই খাসিয়াচাষীদের জীবন ধারণ ও সংসারনির্ব্বাহ হয়। গরীবলোকেরা কেবল আলু খাইয়াই এখানে জীবন ধারণ করে। পাহাড়ের গায়ে গায়ে কেবল আলুর চাষ। প্রথম শিলংএ যাইয়াই এই আলুর ক্ষেত্রগুলিকে দূর হইতে চা-বাগান বলিয়া আমার ভ্রম হইয়াছিল। শিলংএ কত লক্ষ মণ যে আলু উৎপন্ন হয় তাহা বলা কঠিন। জানি না আসাম গভর্নমেণ্টের সরকারী রিপোর্টে ইহার সংবাদ পাওয়া যায় কি না? হাটের দিন আমাদের বাঙ্গালার সম্মুখস্থ রাস্তা দিয়া পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় খাসিয়া ও খাসিয়ানীরা বড় বড় আলুর বস্তা পৃষ্ঠে ফেলিয়া হাটে চলিয়াছে। সে এক সুন্দর দৃশ্য। প্রত্যেক খাসিয়াদেরই কিছু কিছু আলুর ক্ষেত আছে—এবং ঐ

ক্ষেতের উপরেই তাহারা সংসারের ভারার্পণ করিয়া আলুর ফসলের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে। মটরশুটী ও কপির চাষ কাহারও কাহারও আছে। বেগুন ও অন্যান্য শাক-সব্জী এখানে প্রচুর দেখিতে পাইলাম না।

আমরা খাসিয়ানীর দোকানে শাক-সব্জী ক্রয় করিয়া কো-অপারেটিভ ষ্টোরে চাউল ডাউল লবণ তৈল ইত্যাদি ক্রয় করিতে গেলাম।

এই কো-অপারেটিভ ষ্টোর বাজারের মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং ইহা শিলংএর বাঙ্গালীদের এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। গভর্ণমেণ্ট অফিসার ও অন্যান্য চাকুরে বাঙ্গালী মিলিত হইয়া এই কো-অপারেটিভ ষ্টোরটী খুলিয়াছেন। শুনিলাম, পূর্বে মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী তাহাদের ইচ্ছামত দরে জিনিষপত্র বিক্রয় করিত। এই কষ্ট দূরীকরণার্থ শিক্ষিত বাঙ্গালীরা মিলিত হইয়া দশ সহস্র টাকা মূলধনে এই কো-অপারেটিভ ষ্টোর খুলিয়াছেন। অধিকাংশ বাঙ্গালী এই ষ্টোরের অংশ ক্রয় করিয়াছেন। একদর, বাজার অপেক্ষা সমস্ত জিনিষ সুলভ। দরদস্তুর নাই; ষোল আনা ওজন, জিনিষ টাট্‌কা ও খাঁটী। ফর্দ্দ ফেলিয়াদিবামাত্র আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিষ একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক ওজন করিয়া দিলেন। প্রবাসে ইহা কম সুবিধার কথা নয়?

একটী কথা পর্য্যন্ত আমাকে কহিতে হইল না। জিনিষ খারাপ হইলে ইঁহারা বদল দিয়া থাকেন। যিনি যত টাকার share ক্রয় করিয়াছেন, তিনি তদ্রূপ আশাতীত লাভও পাইতেছেন। ধন্য শিলংএর বাঙ্গালীগণ। সেদিন, তাঁহাদের এই একতা; একনিষ্ঠা ও ব্যবসায় বুদ্ধি দেখিয়া মনে মনে শত শত ধন্যবাদ দিয়াছিলাম। কলিকাতায় এরূপ হাজার হাজার ব্যবসা চলিতে পারে; আশাতীত লাভও হইতে পারে—কিন্তু কলিকাতার বাবু নামধারী বাঙ্গালীগণ সেদিকে অন্ধ ও বধির। আমার মনে হয়—কলিকাতার বাঙ্গালীগণ যখন প্রবাসে যান বা প্রবাসে বাস করেন তখন তাঁহাদের পরস্পরের একতা ও সহানুভূতি একটু দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতায় ইহা একেবারে বিরল, একথা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আজ কাল কলিকাতায় খাঁটী জিনিষ একেবারে পাওয়া যায় না। আমাদের মাড়োয়ারী ভায়ারা অধিকাংশ জিনিষেরই দর বাঁধিয়া বাজারে বিক্রয় করিতেছেন। খাঁটী ঘৃতের অভাবে আমরা কি উদরসাত করিতেছি, তাহা আর লিখিয়া লেখনী কলঙ্কিত করিব না। এ অবস্থায় শিলংএর বাঙ্গালীদের ন্যায় যদি কলিকাতার প্রত্যেক ষ্ট্রীটের উপর একটী করিয়া বাঙ্গালী কো-অপারেটিভ

ষ্টোর স্থাপিত হয়, তাহা হইলে একদিকে যেমন খাঁটী জিনিষ ব্যবহার করিয়া বাঙ্গালী অকালমৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইবেন ; অন্যদিকে সেইরূপ এই দুর্ম্মূল্যের বাজারে অনেক অর্থও বাঁচিয়া যাইবে এবং ষ্টোরের অংশীদারেরাও বিনা আয়াসে বিস্তর লাভ পাইতে পারিবেন। কেবল কলিকাতার কথাই বলি কেন, প্রত্যেক জেলায়, প্রত্যেক মহকুমায় ; প্রত্যেক গ্রামে এই দুর্ম্মূল্যের দিনে ও আমাদের এই দুর্দ্দিনে কো-অপারেটিভ ষ্টোর স্থাপিত হওয়া কর্ত্তব্য।

আমার অভিন্নহৃদয়বন্ধু সেদিন আমাকে এই পুস্তকখানিতে শিলংএর ব্যবসাবাণিজ্যের কথা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। বন্ধুবরের পবিত্র মহান্ উচ্চহৃদয় দেশের জন্য কাঁদিতেছে—তাই সেদিন তিনি অতি ব্যাকুলভাবে বলিতেছিলেন যে, ব্যবসাবাণিজ্যের কথা শুনিলেও দেশের লোকের বিশেষতঃ ভবিষ্যতের আশাস্থল যুবকবৃন্দের দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হইতে পারে।

যাহাদের বিলাসিতা অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে ; চাকরী তাহাদের প্রিয় হইবে না তো কি, ব্যবসায় তাহাদের প্রিয় হইবে ? না ভাবিয়া তাকিয়া, ঠেস দিয়া ঘুমাইয়া, গড়াইয়া যাহারা জীবন শেষ করিতে পারিলেই নিজেকে সুখী মনে করেন তাঁহাদের ইহা'র অধিক আর কি হইতে পারে ?

দশটার সময় অর্দ্ধসিদ্ধ অন্ন চারিটী মুখে দিয়া ছুটিয়া আসিয়া ট্রামের জন্য উর্দ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকা; তাহার পর ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া ট্রামে একটু স্থান করিয়া লইয়া গন্তব্য স্থানে পৌছান, সারাদিন অফিসে বসিয়া লেখনী চালান; সন্ধ্যার পর হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া গৃহাগমন। এই গেল অফিস-অধ্যায়। তাহার পর গৃহে কাহারও ত্রয়োদশ চতুর্দ্দশবর্ষের কন্যা অবিবাহিতা; তাহার উপর গৃহিণীর তাড়না ও গঞ্জনা; মুদির দোকানে দেনা; তাগাদায় বার বার অপমানিত হওয়া; তাহার উপর ডিস্‌পেপ্‌সিয়া; কাহারও বা বহুমূত্র হইয়া অকালমৃত্যু। মোটামুটি গৃহস্থ-বাঙ্গালীর জীবন ইহার অধিক আর কি বলিব? এইরূপ ভারবহ জীবন যে বাঙ্গালী ভালবাসিয়া আদরে গ্রহণ করিয়াছে।

যাহার পিতৃপিতামহগণ ছাতা-জুতার ব্যবহার জানিত না; কোট-কামিজ পরিত না; ষ্টকিং-প্যাণ্ট্‌লান পরার সহিত পুরুষানুক্রমে পরিচয় ছিল না; তাহারা কেহ তেজঃপুঞ্জ দেহে আজানুলম্বিত বাহু দোলাইয়া শতাধিক বর্ষ সুখ স্বচ্ছন্দ ও শান্তিতে এবং শেষজীবন যোগ ও সাধন ভজন করিয়া আনন্দচিত্তে হাসিতে হাসিতে পরপারে গিয়াছেন, তাহা কি স্মরণ হয় বাঙ্গালী? তাঁহাদেরই

বংশধর তোমরা। তোমাদের দুর্দ্দশায় —অগ্ন শৃগাল-কুকুরও উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে।

শিলংএ যে লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী মণ আলু উৎপন্ন হইতেছে, সেই আলু মাড়োয়ারী ভ্রাতারা গৌহাটী, কলিকাতা ও নানাস্থানে চালান দিয়া লক্ষপতি হইয়াছেন ও হইতেছেন। শিলংএ যখন ১৷৶০ ও ২৲ টাকা মণ আলু, তখন কলিকাতায় সেই আলুর দর ৬৲ টাকা হইতে ৭৲ টাকা মণ। মাড়োয়ারীরা এই আলু খাসিয়াদের নিকট ক্রয় করিয়া প্রথমতঃ মটরগাড়ীতে গৌহাটীতে চালান দেয়। তাহার পর গৌহাটী হইতে কলিকাতা প্রভৃতি নানাস্থানে রপ্তানী করে। যখন শিলং হইতে গৌহাটী পর্য্যন্ত মটর চলিত না, তখন প্রত্যহ শত শত গো-শকট দ্বারা শিলং হইতে গৌহাটীতে এই সকল মাল চালান হইত। এখন মটর হওয়ায় গো-শকটে আলু চালান দেওয়া প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। মাড়োয়ারীদে ব্যবসা-বুদ্ধি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম। পা বাঙ্গালী ও অন্য জাতি এই আলুর ব্যবসা আরম্ভ করে, এ জন্য তাহারা শিলংএ যে কয়খানি মটর আছে; তাহাদে আলু চালান দিবার জন্য সেই মটরগুলি একেবারে 'একচে করিয়া রাখিয়াছে। কেহ ১৫ দিন, কেহ তিন সপ্তাহ, কে এক মাসের জন্য কেবল তাহাদেরই মাল লইয়া যাইবে

দশটার সময় অৰ্দ্ধসিদ্ধ অন্ন চারিটী মুখে দিয়া ছুটিয়া আসিয়া ট্রামের জন্য উৰ্দ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকা; তাহার পর ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া ট্রামে একটু স্থান করিয়া লইয়া গন্তব্য স্থানে পৌঁছান, সারাদিন অফিসে বসিয়া লেখনী চালান। সন্ধ্যার পর হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া গৃহাগমন। এই গেল অফিস-অধ্যায়। তাহার পর গৃহে কাহারও ত্রয়োদশ চতুৰ্দ্দশবর্ষের কন্যা অবিবাহিতা; তাহার উপর গৃহিণীর তাড়না ও গঞ্জনা; মুদির দোকানে দেনা; তাগাদায় বার বার অপমানিত হওয়া; তাহার উপর ডিস্‌পেপ্‌সিয়া। কাহারও বা বহুমূত্র হইয়া অকালমৃত্যু। মোটামুটি গৃহস্থ-বাঙ্গালীর জীবন ইহার অধিক আর কি বলিব? এইরূপ ভারবহ জীবন যে বাঙ্গালী ভালবাসিয়া আদরে গ্রহণ করিয়াছে।

যাহার পিতৃপিতামহগণ ছাতা-জুতার ব্যবহার জানিত না; কোট-কামিজ পরিত না; ষ্টকিং-প্যাণ্টলান পরার সহিত পুরুষানুক্রমে পরিচয় ছিল না; তাহারা কেহ তেজঃপুঞ্জ দেহে আজানুলম্বিত বাহু দোলাইয়া শতাধিক বর্ষ সুখ স্বচ্ছন্দ ও শান্তিতে এবং শেষজীবন যোগ ও সাধন ভজন করিয়া আনন্দচিত্তে হাসিতে হাসিতে পরপারে গিয়াছেন, তাহা কি স্মরণ হয় বাঙ্গালী? তাঁহাদেরই

বংশধর তোমরা। তোমাদের দুর্দ্দশায়—অন্য শৃগাল-কুক্কুরও উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে।

শিলংএ যে লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী মণ আলু উৎপন্ন হইতেছে, সেই আলু মাড়োয়ারী ভ্রাতারা গৌহাটী, কলিকাতা ও নানাস্থানে চালান দিয়া লক্ষপতি হইয়াছেন ও হইতেছেন। শিলংএ যখন ১৸০ ও ২৲ টাকা মণ আলু, তখন কলিকাতায় সেই আলুর দর ৬৲ টাকা হইতে ৭৲ টাকা মণ। মাড়োয়ারীরা এই আলু খাসিয়াদের নিকট ক্রয় করিয়া প্রথমতঃ মটরগাড়ীতে গৌহাটীতে চালান দেয়। তাহার পর গৌহাটী হইতে কলিকাতা প্রভৃতি নানাস্থানে রপ্তানী করে। যখন শিলং হইতে গৌহাটী পর্য্যন্ত মটর চলিত না, তখন প্রত্যহ শত শত গো-শকট দ্বারা শিলং হইতে গৌহাটীতে এই সকল মাল চালান হইত। এখন মটর হওয়ায় গো-শকটে আলু চালান দেওয়া প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। মাড়োয়ারীদের ব্যবসা-বুদ্ধি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম। পাছে বাঙ্গালী ও অন্য জাতি এই আলুর ব্যবসা আরম্ভ করে, এই জন্য তাহারা শিলংএ যে কয়খানি মটর আছে; তাহাদের আলু চালান দিবার জন্য সেই মটরগুলি একেবারে 'একচেটে' করিয়া রাখিয়াছে। কেহ ১৫ দিন, কেহ তিন সপ্তাহ, কেহ এক মাসের জন্য কেবল তাহাদেরই মাল লইয়া যাইবে এই

contractএ অগ্রিম টাকা দিয়া লেখাপড়া করিয়া রাখেন, আবার সর্ত্তের সময় অতীত হইতে না হইতে, পুনর্ব্বার প্রচুর টাকা দিয়া পূর্ব্বোক্তরূপে লেখাপড়া করিয়া লন। আর বাঙ্গালী তাহাদের জীবনের একমাত্র অবলম্বন চাকুরীবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবনের কয়টী গোনা দিন কাটাইয়া দিতেছেন। শিলং থাকিতে এই সব দেখিয়া আমার মনে হইয়াছিল, বাঙ্গালীর জীবন এক অভিনব জীবন।

শুনিলাম একজন বাঙ্গালী শিলং হইতে গৌহাটী পর্য্যন্ত মটরের কার্য্য খুলিয়া মটর চালাইতেছিলেন। তিনি এই কার্য্যে মাসিক সহস্র সহস্র টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন। এখনও ইহার মটর শিলং হইতে গৌহাটী পর্য্যন্ত চলিতেছে, কিন্তু যাত্রী-মটর নহে, মাল-বাহী মটর। শুনিলাম, এই মাল-বাহী মটরেও ৮।১০ হাজার টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া মাড়োয়ারীর টাকায় আরও দুই একটি মটর চলাচল করিতেছে।

এখন লিমিটেড কোম্পানী করিয়া যে মটর চলিতেছে তাহারাই আসাম গভর্ণমেণ্ট হইতে প্যাসেঞ্জার লইয়া যাইবার অনুমতি পাইয়াছে। অপর কোনও কোম্পানী প্যাসেঞ্জার লইয়া যাইতে পায় না। বলা বাহুল্য এই লিমিটেড

কোম্পানী ইউরোপীয় দ্বারা পরিচালিত এবং তাহারাই এই লিমিটেড কোং প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

মাড়োয়ারীরা চাল আমদানী করিয়া রাশি রাশি অর্থোপার্জ্জন করিতেছে, পূর্ব্বেও করিয়াছে। শিলং এ ধানের চাষ হয় না। অন্যত্র হইতে চাল আসিলে তবে এখানের লোক খাইতে পায় একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এখানে আমদানী রপ্তানীর কার্য্য মাড়োয়ারীদেরই 'একচেটে' বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। বাঙ্গালীরা চাকরী ত্যাগ করিয়া এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন কি?

শিলং এ ঘুরিয়া একটীমাত্র বাঙ্গালীকে দেখিতে পাইলাম; ইহাকে দেখিয়া এবং আলাপ করিয়া ইহাকে বাঙ্গালীর "দলছাড়া" বলিয়া মনে হইল। ইহার ব্যবসা-বুদ্ধি, সাহস, উত্তম, অধ্যবসায় দেখিয়া আমাকে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হইয়াছে। ভদ্রলোকটীর নাম "রমানাথবাবু" তিনি পূর্ব্বে পুলিশের ইনস্পেক্টার ছিলেন। উপরওয়ালার নিকট হইতে তিনি এই কার্য্যে যথেষ্ট প্রশংসালাভ করিয়াছিলেন। উপরওয়ালাদের নিকট তিনি যথেষ্ট আদর যত্নও পাইতেন। শুনিয়াছি, এরূপ ধার্ম্মিকলোক পুলিশে আছেন কি না সন্দেহ। ইনি যদি পুলিশ কর্ম্মচারীদের ন্যায় অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিতেন তবে বোধ হয় লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিতেন।

কিন্তু জীবনে ইনি এক পয়সা, মাসিক বেতন ছাড়া অন্যরূপে উপার্জ্জন করেন নাই।

চাকরী করিতে করিতে, ইহার মনে অনুতাপের উদয় হয়। তিনি ভাবিলেন, আমি চাকরী ত্যাগ করিয়া যদি স্বাধীন ব্যবসায় প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে দেশের হয়তো অনেক উপকার করিতে পারিব। উপরওয়ালারা তাঁহাকে কার্য্যে রাখিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছেন। শিলং হইতে গৌহাটীতে যে প্রথম মটর চালান আরম্ভ হয়, ইনিই তাহার প্রথম ও প্রধান পরিচালক। ইনি পুলিশের কার্য্য ত্যাগ করিয়াই গৌহাটী হইতে শিলংএ যাওয়া কষ্টকর দেখিয়া এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। তিনি নিঃসম্বল অবস্থায় যে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, একজন অর্থবান ব্যক্তি তাঁহার হস্ত হইতে সেই কার্য্যটী গ্রাস করিলেন। ইহাতে তিনি দুঃখের পরিবর্ত্তে আনন্দিত হইয়া বলিলেন, "আমার ইহাতে কোনও স্বার্থ নাই থাকুক,—তবুও যে আমি এই কার্য্যে পথ দেখাইয়া দিলাম, ভবিষ্যতে বহুলোকের ইহাতে উপকার হইবে এবং অনেকেই লাভবান হইতে পারিবেন"। এই ভদ্রলোকটী একদিন আমাকে চা খাইবার নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সেইদিন, ইহার সহিত আমার অনেক কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। ইনি বিবাহ করেন নাই। চিরকুমার।

নিকট আত্মীয় বা আপনার বলিতেও ইঁহার কেহ নাই। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম "আপনি অহোরাত্র এত খাটিতেছেন কাহার জন্য?" তিনি ছল ছল নয়নে উত্তর করিলেন "দেশের জন্য।" আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন। "দেখিতেছেন না, আমাদের দেশের কি শোচনীয় অবস্থা। যাহা আমাদের নিত্য প্রয়োজন, সেই অন্নবস্ত্র মধ্যবিত্তদের জুটিয়া উঠিতেছে না। একটী পুত্র, দুইটী কন্যা ও স্ত্রী লইয়া যাহাদের সংসার, এরূপ ভদ্রলোকেরাও ৫০৲ টাকা বেতনের চাকরী করিয়া গ্রাসাচ্ছাদন জুটাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না। ইহাপেক্ষা দেশের দুর্দ্দিন আর কি হইতে পারে? প্রতি বৎসরে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহু বি এ এম এ, তৈয়ারী হইয়া বাহির হইতেছে বটে, কিন্তু তাহারা করিবে কি? চাকরী করিয়া কখনই স্ত্রীপুত্র ও আত্মীয় স্বজনের গ্রাসাচ্ছাদন করিতে তাহারা সক্ষম হইবে না। যদি আমাদের দেশের লোক ইংরাজদের ন্যায় ব্যবসা-বাণিজ্য শিক্ষা না করে বা ব্যবসায়ে পারদর্শী না হয়—তাহা হইলে সহস্র সহস্র উপাধিধারী বি, এ, এম, একে তাহাদের পরিজনবর্গের জন্য অন্নবস্ত্রের চিন্তায় অধীন হইয়া তিলতিল করিয়া মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। ঐ যে দেখিতেছেন রাস্তার উপর

যাহারা ফেরী করিয়া বেড়াইতেছে উহাদের মনের শান্তি ও শারীরিক শক্তি এই এম-এ, বি-এ, অপেক্ষাও অধিক। ইংরাজ রাজার জাতি,—ব্যবসাবাণিজ্য তাহাদের করতলগত বলিয়াই তাহারা আজ অর্দ্ধ পৃথিবীর অধীশ্বর ও সম্রাট।"

রমানাথবাবুর চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। যাহারা কাগজে কলমে স্বদেশহিতৈষীতার নাম প্রচার করেন, তাহাদিগকে কেহ কখনও এরূপভাবে চক্ষের জল ফেলিতে দেখিয়াছেন কি? যদি কখনও বাঙ্গালী ব্যবসা-বাণিজ্যে পারদর্শী হয়—তবে এই রমানাথবাবুর ন্যায় প্রকৃত স্বদেশহিতৈষীদের পুণ্য অশ্রুবারির জোরেই হইবে।

রমানাথবাবু নিঃসম্বল অবস্থায় শিলংএ যে কয়টী কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলাম। ইনি আমাকে সেইদিন সঙ্গে লইয়া প্রথমতঃ তাঁহার ছুরীর কারখানা দেখাইলেন। পার্ব্বত্য খাসিয়া-জাতিদিগকে ধরিয়া তিনি এই ছুরী প্রস্তুতের কার্য্যে যে প্রকারে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। আসামের চা-বাগানে চা-গাছে কলম বাঁধিবার জন্য যে তীক্ষ্ণধার ছুরীর প্রয়োজন, তাহা বিলাত হইতেই আমদানী হইয়া থাকে। এককোপে চা-গাছের ডাল কাটিয়া কলম করিতে হয়, নচেৎ কলম ভাল হয় না। এরূপ ছুরী আমা-

দের দেশে পূর্ব্বে প্রস্তুত হইত না। রমানাথবাবু ঐ ছুরীর কারখানা খুলিয়া বহু পরিমাণে সফলকাম হইয়াছেন। এখন তিনি অনেক চা-বাগান হইতেই অর্ডার পাইয়া থাকেন, কিন্তু মূলধন ও কল-কারখানা অভাবে এই কার্য্যে বেশী লাভবান হইতে পারেন নাই। কারণ ভারত বিলাত নহে।

রমানাথবাবু আর একটী লাভজনক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তাঁহার নিজের যে কয়েক সহস্র টাকা মূলধন ছিল তাহা তিনি এই কার্য্যে ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছেন। *বীডন ফল নামক ঝরণার জল ক্ষুদ্র নদীরূপে যেস্থান দিয়া প্রবল বেগে বহিয়া যাইতেছে—একস্থানে তিনি সেই জলস্রোতের গতিরোধ করিয়া ভিন্নদিক দিয়া সেই জলস্রোত প্রবাহিত করাইয়াছেন। এইখানে ইনি একটী আটাময়দার কল স্থাপন করিতেছেন, ইঞ্জিন ও ইলেকট্রিক সাহায্যে যেরূপ কল চলিয়া থাকে, এই কল বিনা ইঞ্জিন, বিনা ইলেকট্রিক সাহায্যেই সেইরূপ চলিবে। তিনি যেস্থান দিয়াই জলস্রোত প্রবাহিত করাইয়াছেন, ঠিক সেই স্থানে এই আটাময়দার কলের প্রকাণ্ড চাকা বসাইয়াছেন। স্রোতের জল সেই চাকায় গিয়া ধাক্কা লাগিয়া প্রবাহিত

* বীডন ফলের কথা পরে বলিব।

হইয়া যাইবে এবং এই জলস্রোতের প্রতিঘাতে সেই চাকা আপনাআপনি ঘুরিতে থাকিবে। ইহাতে মোটর-ইঞ্জিন ইলেকট্রিক পাওয়ারের যে ব্যয় তাহার প্রয়োজন হইবে না। যদি রমানাথবাবু এইকার্য্যে সফলকাম হইতে পারেন, তবে দেশের লোক ইহাতে বহুল পরিমাণে লাভবান হইতে পারিবেন। এই জলস্রোতের সাহায্যে ইনি শিলং সহরে বৈদ্যুতিক আলোক প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিতেছেন। কি উপায়ে তিনি এই কার্য্য করিবেন, তাহা এখন সাধারণে প্রকাশ করিতে ইনি ইচ্ছুক নহেন।

রমানাথবাবুর আর একটা কীর্ত্তি **Shillong Industrial Bank.** দেশের শিল্পবাণিজ্য অর্থাভাবে উন্নতি লাভ করে না--এই অন্তরায় নিবারণার্থে তিনি এই ব্যাঙ্কের টাকায় চা-বাগান, কলকারখানা প্রভৃতি নানারূপ দেশহিত-কর ব্যবসার প্রতিষ্ঠা করিবেন। আমি শিলং ত্যাগ করিবার পূর্ব্বদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। সেইদিন, এই ব্যাঙ্কের রসিদ ও চিঠিপত্রের প্রুফ ছাপাখানা হইতে আসিল। তিনি আমাকে কত আগ্রহভরে সেইগুলি দেখাইলেন। দেশহিত ও বাঙ্গালীর উন্নতির জন্য ইঁহার অহোরাত্র পরিশ্রম ও মস্তিষ্ক আলোড়ন দেখিয়া আমি ইঁহাকে কি বলিয়া ধন্যবাদ দিব, তাহা বুঝিতে পারি না।

ইঁহাকে ধন্যবাদ দিবার ভাষা অভিধানে নাই। শিলং হইতে বিদায় লইবার দিন, যখন মোটরে আসিয়া বসিয়াছি, তিনি আমাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে আসিলেন। তখন আনন্দে কি দুঃখে জানি না আমি তাহার সহিত কথা কহিতে পারি নাই। আমি নিত্যই এই সাধুচরিত্র, প্রকৃত দেশহিতৈষী মহাপুরুষের জন্য ভগবানের নিকট দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া থাকি। হায়! যদি সহস্র শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে একজন করিয়া দেশের উন্নতির জন্য রমানাথবাবুর ন্যায় চাকরীর মোহ ছিন্ন করিয়া ব্যবসা-ক্ষেত্রে আসিয়া দণ্ডায়মান হয়—তবে আমাদের এই দেশের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইবে। নচেৎ কেবল কাগজকলমে লেখালেখি করিলে, দারিদ্র্যতাই বৃদ্ধি পাইবে। শান্তি ও শক্তি সঞ্চয় হইবে না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পরদিন আহারাদির পর জলে ভিজিতে ভিজিতে আমরা শিলংএর হাট দেখিতে বহির্গত হইলাম। শিলং-পাহাড়ের অবিরাম মুষলধারে বৃষ্টির সহিত যাহারা পরিচিত নহেন, তাহাদিগকে এই অবিরাম বৃষ্টির কথা কি করিয়া বুঝাইব? আমরা শিলংএ যাওয়া অবধি একদিনমাত্র সূর্য্যের মুখ দেখিতে পাইয়াছিলাম, তাহার পর কেবল বৃষ্টি, অবিরাম বৃষ্টি। শুনিলাম জ্যৈষ্ঠমাসের শেষ হইতেই এখানে বৃষ্টি আরম্ভ হয়। অনেক সময় অহোরাত্রের মধ্যে এ বৃষ্টির আর বিরাম হয় না। আমাদের পূর্ব্বে শিলং সম্বন্ধে কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না সুতরাং ঠিক বৃষ্টির সময়েই শিলংএ গিয়া পৌঁছিয়াছিলাম।

আজ মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। তথাপি শিলংএর হাট দেখিবার অদম্য আকাঙ্ক্ষায় বৃষ্টির মধ্য দিয়া চলিতে লাগিলাম। সেইদিন বুঝিয়াছিলাম, দেহটা কিছুই নহে। মনের জোরেই মানুষ সকল কার্য্য করিয়া থাকে। মন আমাদিগকে হাটের পথে দ্রুতপদে টানিয়া লইয়া যাইতে

লাগিল। অজস্র বারিপাত আমাদিগকে গ্রাহ্য করিতেও দিল না। ওয়াটারপ্রুফের উপর বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা পড়িয়া কর্ণ বধির করিয়া দিতে লাগিল বটে, কিন্তু মনের আনন্দকে বাধা দিতে পারিল না। সেইদিন মনকে বলিয়াছিলাম "তোমার যখন এত শক্তি, তখন আমাদিগকে এত দুর্গতিতে রাখিয়াছ কেন? তুমি স্বর্গে লইয়া যাইতে পার,—মানবকে মুক্তি প্রদান করিতে পার। আবার তুমিই আমাদের সর্ব্বনাশ ঘটাইতেছ—লক্ষ যোজনের পথ চক্ষের পলক ফেলিতে না ফেলিতে অতিক্রম করিয়া আমাদের শান্তিময়ের আশ্রয় লাভের ব্যাঘাত ঘটাইয়া দিতেছ। যাহারা এই মনকে জয় করিয়াছেন, তাহারাই সিদ্ধপুরুষ মহাযোগী। আমাদের মন কেবল পদে পদে অনর্থ ঘটাইয়া দিতেছে এবং এই নশ্বর সংসারে কেবল ধূলামাটি লইয়া খেলা করাইতেছে।

পাগলের ন্যায় এইরূপ কত কি ভাবিতে ভাবিতে যাইতেছিলাম। মনে পড়ে হাটের ভীষণ কোলাহলে আমার চমক ভাঙ্গিয়া গেল। হাটে গিয়া যাহা দেখিলাম তাহা এ জীবনে কখনও দেখি নাই। ভাবিলাম এস্থান সত্যই একটী রমণীর রাজ্য। দেখিলাম হাটে অসংখ্য রূপবতী যুবতী আপন আপন দোকান খুলিয়া বসিয়াছে। কোন রমণী কাপড় বেচাকেনা করিতেছে; কোন যুবতী রাশি রাশি

পান ও কাটা সুপারি লইয়া বিক্রয় করিতেছে—কাহারও বা আলু ও নানাবিধ শাকসব্জীর দোকান; কেহ বা অন্যান্য রমণীর সাহায্যে চা প্রস্তুত করিয়া কাপে কাপে চা সাজাইয়া খরিদ্দারদিগকে বিক্রয় করিতেছে।

হাটের অপর দিকে চক্ষু ফিরাইয়া দেখিলাম কেবল গরম কাপড়ের দোকান। ইহারা ধনী মহাজন। সহস্র সহস্র টাকার গরমকাপড়ের জামা ও গরমকাপড়ের থান লইয়া বিক্রয় করিতেছে। যুবতীরা স্থির গম্ভীরভাবে কেবল কেনাবেচা করিতেছে। কেনাবেচা সম্বন্ধীয় কথা ব্যতীত ইহাদের মুখে অন্য কোনও কথা শুনিতে পাইলাম না। বহু পুরুষক্রেতা ইহাদের দোকানে বসিয়া দ্রব্যাদি ক্রয় করিতেছে। কিন্তু সেই একমাত্র কেনা-বেচার কথা ভিন্ন অন্য বাজে কথা নাই। নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে ইহারা পুরুষ ক্রেতার মুখের দিকে চাহিয়াও কথা কহে না। দেখিলাম নিম্নে মাটীর দিকে দৃষ্টি সংবদ্ধ করিয়া ইহারা কথাবার্ত্তা কহিতেছে। খাসিয়া রমণীরা যে এরূপ ব্যবসাদার, ইহাদের ব্যবসা বুদ্ধি যে এত প্রখর তাহা আমি এই প্রথম দেখিলাম।

আর এক দিকে দেখিলাম, খাসিয়া যুবতীরমণীরা কলে সেলাইয়ের কার্য্য করিতেছে। ইহারা যে এরূপ সেলাইএর

কার্য্য জানে, তাহা এই প্রথম দেখিলাম। আর এক দিকে দেখিলাম, চাউলের দোকান। খাসিয়া রমণীরা ওজন করিয়া চাউল বিক্রয় করিতেছে। শত সহস্র দোকানের মধ্যে সংখ্যায় খাসিয়া পুরুষের দোকান অতি অল্প, নাই বলিলেই হয়। ব্যবসা বাণিজ্যের—প্রধান ভার খাসিয়া রমণীরাই গ্রহণ করিয়া থাকে। *

খাসিয়ারমণীদের ন্যায়—কর্মঠ রমণী আর কোথাও আছে কি না জানি না। খাসিয়ারমণী ও পুরুষ ইহারা উভয়েই ব্যবসা-বাণিজ্য ভালবাসে। অতি অল্পসংখ্যক খাসিয়াই চাকুরী গ্রহণ করে। কোনও খাসিয়া হয় ত আফিসে বড় চাকরী করে, তাহার মান ও মর্য্যাদা আফিসে ও তাহার গ্রামের মধ্যে যথেষ্ট। হঠাৎ তাহার চাকরী গেল—কিন্তু তাহাতে সে কিছুই ভ্রুক্ষেপ না করিয়া মাথায় আলুর বস্তা লইয়া হাটে বিক্রয় করিতে আসিল। ব্যবসায় কার্য্যকে ইহারা খুব সম্মানের কার্য্য বিবেচনা করে। ব্যবসার জন্য মস্তকে বোঝা বহিয়া যাইতে ইহারা অপমান বোধ করে না। উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালীর এই পর্ব্বতবাসী অসভ্য খাসিয়াদের নিকট ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ে অনেক শিখিবার আছে।

---

* খাসিয়াদের কথা পরে বিবৃত হইবে।

অন্যান্য পাহাড়ী জাতির মধ্যে খাসিয়াবাসীদের অবয়ব ও প্রকৃতি সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। খাসিয়াযুবতীরা গাত্র আবরণে সমস্ত পাহাড়ীজাতিকে পরাজিত করিয়াছে। আবরণে কেবল সমস্ত পাহাড়ীরমণীকে পরাজিত করিয়াছে তাহা নহে, সভ্য জাতিকেও পরাজিত করিয়াছে। খাসিয়া রমণীরা প্রথমে একটা সেমিজের ন্যায় পরে—পরে অন্যান্য গরম পোষাকে শরীর ঢাকিয়া রাখে। শরীরের কোনও অংশ দেখা যায় না।

হাটের অন্য দিকে যাইয়া দেখিলাম কয়েক জন খাসিয়া রমণী পাহাড়ের টাটকা মধু বিক্রয় করিতেছে। মধু কিনিবার জন্য তাহাদের সহিত আমরা দর কসাকসি করিতে লাগিলাম। তাহাতে তাহারা স্থির ভাবে একই দর বারম্বার বলিতে লাগিল। আমরা ফিরিয়া চলিয়া আসিলাম, আবার তাহাদের দোকানে গেলাম, আবার ফিরিয়া আসিলাম। তাহারা কিছুতেই বিচলিত হইল না। সেই একই দর তাহারা বলিতে লাগিল। তাহাদের নিকট পরাস্ত হইলাম। বুঝিলাম ইহারা খরিদ্দারের নিকট দরদস্তর করিয়া বিক্রয় করে না। অথচ দরও বেশী লয় না। এই খাসিয়া যুবতীদের নিকট অনেক বড় বড় ব্যবসায়ীর এই বিষয়ে শিখিবার আছে।

হাটে নূতনত্ব দেখিলাম, চায়ের দোকান। সারি সারি শাসিয়া যুবতীরা চায়ের দোকান খুলিয়া বসিয়া আছে। আসিয়া পুরুষ ক্রেতারা দলে দলে মৌমাছির ঝাঁকের ন্যায়—তাহাদের দোকানে চা পান করিতে যাইতেছে। চা বিক্রয়-কারিণী যুবতীরা গরম গরম চায়ের পিয়ালায় একখানি করিয়া বিস্কুট ফেলিয়া দিয়া পুরুষ ক্রেতার হস্তে দিতেছে। প্রতি মুহূর্ত্তে আট দশ জন খরিদ্দারকে এরূপ ভাবে চায়ের কাপ বিতরণ করিতেছে; ঠিক যেন কলে কাজ হইয়া যাইতেছে। চেঁচাচেঁচি নাই,—ডাকাডাকি নাই—মুখে কথা নাই—অন্যদিকে দৃষ্টি নাই, যুবতীর দৃষ্টি কেবল চায়ের পেয়ালাগুলির উপর সংবদ্ধ। সাহায্যকারিণী রমণীগণ কলের ন্যায় একটার পর একটা করিয়া চায়ের কাপ যুবতীর হাতে দিতেছে—যুবতী তাহা বিতরণ করিতেছে। চা অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে প্রস্তুত; সাহায্যকারিণীদের অসাবধানতায় যদি চায়ের পেয়ালায়—একটু কোনও রূপ মলিনতা দেখিতে পাইতেছে, অমনি তাহা সাহায্য-কারিণীর হস্তে ফিরাইয়া দিয়া ইঙ্গিতে জানাইতেছে—এরূপ অপরিষ্কার চা, খরিদ্দারকে কেমন করিয়া দিতে সাহস কর। স্বীয় খরিদ্দারের প্রতি তাহাদের আন্তরিক সহানুভূতি ও যত্ন দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলাম।

পুরুষ ক্রেতারা সহস্র চেষ্টাতেও চায়ের কাপের এই মলিন দাগটুকু ধরিতে পারিত না ; অনুবীক্ষণ যন্ত্রও পারিত কি না সন্দেহ।

হাটের অন্যদিকে বহু গো-মাংসের দোকান দেখিলাম। খাসিয়ারা খুব মাংস প্রিয়। সারি সারি শত শত গো-মাংসের দোকান দেখিয়া তাহা বুঝিয়াছিলাম। এত গোমাংস কোথায় কিরূপে বিক্রীত হইতেছে ; কাহারা ক্রয় করিতেছে, দেখিবার কৌতূহল হইয়াছিল। কিন্তু হিন্দু বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ হইয়া হাটের সেদিকে যাইতে প্রবৃত্তি হইল না।

হাটে অপর্য্যাপ্ত আলু ; আলুর হাট বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাহারা বহুদূর হইতে আসিয়াছে, তাহারা প্রচুর পরিমাণে আলু সিদ্ধ করিয়া সঙ্গে আনিয়াছে। ক্ষুধার সময় সেই আলু সিদ্ধ খাইতেছে, আর হাটে কেনা-বেচা করিতেছে। বাঁধাকপি, ফুলকপি, মটরশুটি, পাহাড়ে কুষ্মাণ্ড এবং অন্যান্য শাক-সব্জীর দোকানও অনেক দেখিলাম। বেগুণ, উচ্ছে প্রভৃতি তরকারীর দর অত্যন্ত মহার্ঘ্য। বুঝিলাম এসব জিনিষ পাহাড়ে অধিক পরিমাণে জন্মায় না। হাটে ক্রেতা-বিক্রেতায় প্রায় দশ হাজারের উপর লোক দেখিলাম। এই হাট শিলংএর বড় হাট বলিয়া

কথিত। শুষ্ক মৎস্যের দোকান হাটে অনেক দেখিলাম ; দুর্গন্ধে সেদিকে যাওয়া যায় না। বাঙ্গালাদেশে ইহাকে "শুট্‌কী" মাছ বলে। খাসিয়াদের এই শুট্‌কীমাছ খুব প্রিয় খাদ্য। হাটে বাঙ্গালীর দোকান একটীও দেখিলাম না। বাঙ্গালী খরিদ্দারও ৩।৪ জনের অধিক দেখিতে পাইলাম না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

শিলংএর "বিশপ ফল" এবং "বীডন ফল" (Bishop fall; & Beadon fall) দেখিবার জিনিস। এই দুইটী জলপ্রপাত না দেখিলে শিলং ভ্রমণ ব্যর্থ হইয়া যায়। আমরা আজ সকাল সকাল আহারাদি শেষ করিয়া Bishop fall দেখিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। গৃহিণী বলিলেন "আমরা কি উহা দেখিতে যাইব না?" যখন এত অর্থব্যয় করিয়া শিলং-পাহাড়ে আসিয়াছি, তখন "না" বলিবার সাহস পাইলাম না। অগত্যা টোঙ্গা ভাড়া করিতে ছুটিতে হইল।

দার্জ্জিলিং ও শিলংএর প্রধান পার্থক্য এই খানেই; দার্জ্জিলিংএ রিকশ প্রভৃতি যথেষ্ট অভিযান পাওয়া যায়; শিলংএ অশ্বযান বা রিকশয়ের একান্তই অভাব। শিলংএ Private মটর কোম্পানীর কয়েকখানি মটর আছে, তাহার ভাড়া অত্যধিক, তাহাও শ্বেতাঙ্গদিগের জন্য সব সময়ে মনে করিলেই পাওয়া যায় না। শিলং-আগত সাহেবগণই প্রায়ই মটরগুলিকে ভাড়া লইয়া থাকেন। আমাদের ভায়

বাঙ্গালীর একমাত্র টোঙ্গাই ভরসা। তাই প্রবাদ আছে—শিলং বড়লোকদের জন্য। এই প্রবাদের যথার্থতা যথেষ্ট আছে। দার্জ্জিলিং অপেক্ষা শিলংএ খাদ্য দ্রব্য ও যানাদির ব্যয় অনেক অধিক।

টোঙ্গা করিয়া আমরা Bishop ও Beadon fallsএর নিকটে উপস্থিত হইলাম। সমুদ্র গর্জ্জনের ন্যায় জল পতনের শব্দে আমাদের কর্ণ বধির করিয়া দিতে লাগিল। নীচে টোঙ্গা রাখিয়া আমরা উপরে উঠিতে লাগিলাম। অর্দ্ধপথে উঠিতে না উঠিতেই, Beadon ও Bishop falls আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল। সে দৃশ্য দেখিয়া আর আমাদের পা উঠিল না; আমরা সেই অর্দ্ধপথে জলপ্রপাতের দিকে চাহিয়া রহিলাম। সে কি মনোরম দৃশ্য! Bishop ও Beadon falls যিনি না দেখিয়াছেন, তাঁহাকে বুঝাইতে পারিব না, এ দৃশ্য অতি মহান্ ও সুন্দর, লেখনী ভাষায় প্রকাশ করিতে পারে না, সেখানে মূক হইয়া যায়। বহু উচ্চ হইতে দুই দিকে দুইটী জলধারা অবিরাম কল্লোল করিতে করিতে পতিত হইতেছে। সে দৃশ্যটী কি নয়নাভিরাম যাহা নয়নাভিরাম, বিধাতার বিচিত্র বিধানে তাহার নিকট কোন দিনই যাওয়া যায় না। দূর হইতে তাই এ দৃশ্য দেখিয়া আমরা অপার আনন্দে ভাসিতে ছিলাম। কেবলই

মনে হইতেছিল, উচ্চপাহাড় হইতে এক জন বড় শিল্পী অহরহঃ পর্ব্বত প্রমাণ রজত গালাইয়া বুঝি ঢালিয়া দিতেছেন পাহাড়ের গা বাহিয়া রজত ধারা চিক চিক করিয়া গড়াইয়া আসিয়া নদীতে পরিণত হইয়া সাগর উদ্দেশ্যে নাচিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। জানি না, সেই মহান্ শিল্পী জগতে গলিত রজত আভা তরঙ্গ-ভঙ্গ ছুটাইয়া কোন্ মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিতেছেন। আমি যতক্ষণ একদৃষ্টে এই দুইটী স্ফটিক স্বচ্ছ নির্ঝরের দিকে চাহিয়াছিলাম, শুভ্র রজত ধারা ব্যতীত আমি অন্য কিছুই মনে করিতে পারি নাই। করুণাময় শিল্পী জগতের কোথায়—কোন্ জিনিস কি উদ্দেশ্যে যে সাজাইয়া রাখিয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন। ক্ষুদ্র মানব আমরা; আমাদের যেমন যাহার বুদ্ধি; যাহার যেমন রুচি; সেইরূপই তাঁহার সৃষ্ট বস্তুর বিচার ও তুলনা করিয়া থাকি।

খাসিয়ারা এই বীডন ফলকে "সোণা পানি" বলে। শুনিলাম **Beadon** ও **Bishop fall**এর মধ্যে একটী নির্জ্জন স্থানে একজন গুরখা সন্ন্যাসী ছিলেন। সাত দিন অন্তর তাঁহার একজন ভক্ত চেলা তাঁহাকে খাদ্য দ্রব্য দিয়া আসিত। কিছু দিন পরে সেই গুরখা সন্ন্যাসী কোথায় গেলেন সেই পর্য্যন্ত তাঁহার আর কেহ কোন খোঁজ পায় নাই। কেহ বলে, তিনি বিজন অরণ্যের মধ্যে লোকলোচনের অন্তরালে

সমাধিস্থ হইয়া আছেন। কেহ বলে, তিনি এখানে নাই; চলিয়া গিয়াছেন।

পাহাড়ের উপর হইতে ঝরণার জল পড়িতেছে; বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই; দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর—একই ভাবে, একই শব্দে জল পড়িতেছে। জানি না, কোথা হইতে কিরূপে বিনা হ্রাস বৃদ্ধিতে জলপ্রবাহ বহিতেছে। এরূপ মনোরম পবিত্র স্থান আর কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। যতক্ষণ ছিলাম, কি এক অভিনব ভাবে বিভোর হইয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় বসিয়াছিলাম। স্থানটী এমন নির্জ্জন ও সুন্দর যে মুনিঋষির আশ্রম বলিয়া মনে হয়। সংসারের তাপ তিরোহিত হইয়া যায়। কলকল করিয়া জলের শব্দ; সন সন করিয়া বায়ুর প্রবাহ; সে কি মনোরম! বুঝাইবার মত আমার ভাষা সম্পদ নাই। মাঝেমাঝে পাহাড়ে বিহঙ্গের কলতান; দূর হইতে মনে হইতেছিল, বুঝি স্বর্গ হইতেই এই রজত ধারা নামিয়া আসিতেছে।

আমরা আরও অগ্রসর হইয়া ঝরণার বিপরীত দিকের পাহাড়ে উঠিলাম। সেই স্থানে দেখিলাম পাহাড়ের উপর পাইন গাছগুলি কে যেন শ্রেণীবদ্ধভাবে সযত্নে রোপণ করিয়া রাখিয়াছে। দীর্ঘ পাইন বৃক্ষের শিরোদেশ আকাশ-

মনে হইতেছিল, উচ্চপাহাড় হইতে এক জন বড় শিল্পী অহরহঃ পর্ব্বত প্রমাণ রজত গালাইয়া বুঝি ঢালিয়া দিতেছেন।' পাহাড়ের গা বাহিয়া রজত ধারা চিক চিক করিয়া গড়াইয়া আসিয়া নদীতে পরিণত হইয়া সাগর উদ্দেশ্যে নাচিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। জানি না, সেই মহান্ শিল্পী জগতে গলিত রজত আভা তরঙ্গ-ভঙ্গ ছুটাইয়া কোন্ মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিতেছেন। আমি যতক্ষণ একদৃষ্টে এই দুইটী স্ফটিক স্বচ্ছ নির্ঝরের দিকে চাহিয়াছিলাম, শুভ্র রজত ধারা ব্যতীত আমি অন্য কিছুই মনে করিতে পারি নাই। করুণাময় শিল্পী জগতের কোথায়—কোন্ জিনিস কি উদ্দেশ্যে যে সাজাইয়া রাখিয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন। ক্ষুদ্র মানব আমরা; আমাদের যেমন যাহার বুদ্ধি; যাহার যেমন রুচি; সেইরূপই তাঁহার সৃষ্ট বস্তুর বিচার ও তুলনা করিয়া থাকি।

খাসিয়ারা এই বীডন ফলকে "সোণা পাণি" বলে। শুনিলাম Beadon ও Bishop fallএর মধ্যে একটী নির্জ্জন স্থানে একজন গুরখা সন্ন্যাসী ছিলেন। সাত দিন অন্তর তাঁহার একজন ভক্ত চেলা তাঁহাকে খাদ্য দ্রব্য দিয়া আসিত। কিছু দিন পরে সেই গুরখা সন্ন্যাসী কোথায় গেলেন সেই পর্য্যন্ত তাঁহার আর কেহ কোন খোঁজ পায় নাই। কেহ বলে, তিনি বিজন অরণ্যের মধ্যে লোকলোচনের অন্তরালে

সমাবিস্থ হইয়া আছেন। কেহ বলে, তিনি এখানে নাই; চলিয়া গিয়াছেন।

পাহাড়ের উপর হইতে ঝরণার জল পড়িতেছে; বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই; দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর—একই ভাবে, একই শব্দে জল পড়িতেছে। জানি না, কোথা হইতে কিরূপে বিনা হ্রাস বৃদ্ধিতে জলপ্রবাহ বহিতেছে। এরূপ মনোরম পবিত্র স্থান আর কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। যতক্ষণ ছিলাম, কি এক অভিনব ভাবে বিভোর হইয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় বসিয়াছিলাম। স্থানটী এমন নির্জ্জন ও সুন্দর যে মুনিঋষির আশ্রম বলিয়া মনে হয়। সংসারের তাপ তিরোহিত হইয়া যায়। কলকল করিয়া জলের শব্দ; সন সন করিয়া বায়ুর প্রবাহ; সে কি মনোরম! বুঝাইবার মত আমার ভাষা সম্পদ নাই। মাঝেমাঝে পাহাড়ে বিহঙ্গের কলতান; দূর হইতে মনে হইতেছিল, বুঝি স্বর্গ হইতেই এই রজত ধারা নামিয়া আসিতেছে।

আমরা আরও অগ্রসর হইয়া ঝরণার বিপরীত দিকের পাহাড়ে উঠিলাম। সেই স্থানে দেখিলাম পাহাড়ের উপর পাইন গাছগুলি কে যেন শ্রেণীবদ্ধভাবে সযত্নে রোপণ করিয়া রাখিয়াছে। দীর্ঘ পাইন বৃক্ষের শিরোদেশ আকাশ

চুম্বন করিবার জন্য যেন পরস্পর রেষারেষি করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিতেছে। দৃষ্টি যতদূর যায়—কেবল পাইনবৃক্ষ। বিনা যত্নে কিরূপে যে পাহাড়ের উপর শ্রেণীবদ্ধভাবে পাইনবৃক্ষগুলি জন্মিয়াছে, বুঝিতে না পারিয়া ভগবানের চরণে মস্তক নত করিয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া সেই স্থানে বসিয়া রহিলাম।

কতক্ষণ এই ভাবে ছিলাম জানি না—সূর্য্যদেব যে কখন পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িয়াছেন, তাহা দেখি নাই। গৃহিণী যখন আসিয়া ভর্ৎসনার সুরে বলিলেন—

"তোমার—সব জায়গাতেই পাগলামী। সন্ধ্যা হইয়া আসিল, বাসায় ফিরিবে কখন? শেষে জঙ্গলের মধ্যে কি একটা বিপদে পড়িব?"

এমন শান্তির স্থলে অশান্তিকে আসিবার সুবিধা দেওয়া হইবে না ভাবিয়া তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতে লাগিলাম। যখন আমরা আসিয়া টোঙ্গায় উঠিলাম, তখন অন্ধকার পাহাড়ের উপর হইতে নিম্নে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

নবম পরিচ্ছেদ।
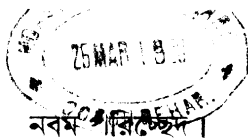
পূর্ব্বদিন হইতেই আমাদের চিন্তা ছিল যে, আজ আমরা শিলং-পীক দেখিতে যাইব। সেইজন্য অতি প্রত্যূষেই নিদ্রা ভঙ্গ হইল। যখন শয্যাত্যাগ করিলাম, তখনও প্রভাতের আলো দেখা দেয় নাই। মাঝে মাঝে ভোরের সঙ্গী কুক্কুটেরা প্রভাত আগমন ঘোষণা করিতেছিল। প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে লাবান পাহাড়ের উপর উঠিতে লাগিলাম। আমাদের বাঙ্গালার উপরেই এই পাহাড়—অতি কষ্টে হাঁফাইতে হাঁফাইতে পাহাড়ের উপরে উঠিলাম। লাবান পাহাড়ের উপর হইতে শিলংএর দৃশ্য যেন ফ্রেমে বাঁধা আলেখ্যর মত। আনন্দে প্রাণ বিভোর হইয়া গেল। পাহাড়ের গায়ে গায়ে বাঙ্গালা গুলি পাহাড়ের উপর হইতে এক একখানি শুভ্র রজত খণ্ডের ন্যায় দেখাইতেছিল। তাহার মাঝেমাঝে খাসিয়াদের ক্ষুদ্রক্ষুদ্র কুটীর; তখন সবে মাত্র প্রভাত হইতেছে। খাসিয়ারা কেহ চা পান করিতেছে, কেহ বা তাহাদের কুক্কুটগুলি ক্ষুদ্রক্ষুদ্র গৃহ হইতে ছাড়িয়া দিতেছে; কেহ বা কোদালী স্কন্ধে আলুর ক্ষেতে যাই-

সযত্নে আলুগুলি বাছিয়া তুলিতেছে। লাবান পাহাড়ের অন্য দিকে শিলংএর বড় পাহাড়। দেখিতে দেখিতে শিলংএর ঐ উচ্চ পাহাড়ে তরুণ অরুণ উদিত হইল। একদিকে বৃষ্টি, অন্যদিকে সূর্য্যোদয়, সে এক মনোরম দৃশ্য। আমার মনে হইল, শিলংএর বড় পাহাড়ের গায়ে সোণার চাদর একখানি কে যেন বিছাইয়া দিল। প্রকৃতির লীলাভূমি গিরিশ্রেণীর এই সুন্দর দৃশ্য আর প্রভাতকালের পাখীগুলির মধুর স্বর এই স্থানটীতে মুখরিত হইয়া আমার মনে হইল পৃথিবী যেন পাহাড় বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। উপরে পাহাড়, নীচে পাহাড়; পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ সব দিকেই দিগন্ত বিস্তৃত পাহাড়।

ঘড়ী খুলিয়া দেখিলাম ৮টা বাজিতে আর বিলম্ব নাই, আমাদিগকে শিলং পীকে যাইতে হইবে; অনিচ্ছাস্বত্ত্বেও পাহাড় হইতে অবতরণ করিতে লাগিলাম। অৰ্দ্ধ পথে পাহাড়ের গায়ে একটী জলের ফোয়ারা দেখিতে পাইলাম। ফোয়ারা হইতে অবিরাম জল উঠিয়া পাহাড়ের গা দিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে, সে দৃশ্য কি মনোহর।

বাসায় আসিয়া দেখিলাম আমাদের লাবান যাইবার উদ্যোগ আয়োজন সবই ঠিক হইয়া গিয়াছে। আজ অনন্ত বাবু আমাদের সঙ্গী হইবেন। আনন্দ রাখিবার সীমা নাই।

শিলং পীক শিলং-পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শিখর; সেই সর্ব্বোচ্চ পথটী থাপ্পা করিয়া উঠিতে হইবে। থাপ্পা অনেকটা আমাদের দেশের মোড়ার ন্যায়। মোড়ার উপরটা চেয়ারের মত ঠেস দিবার জায়গা আছে। এই থাপ্পা খাসিয়ারা পৃষ্ঠের উপর রাখিয়া ফিতার ন্যায় বেতের ধুচুনীর দ্বারা বাঁধিয়া রাখিয়াছে। থাপ্পা পিঠে তুলিয়া—মাথার উপর দিয়া কপালে আটকাইয়া লয়। মানুষের পৃষ্ঠে চাপিয়া পাহাড়ের উপর উঠিতে হইবে ইহাতে প্রথমটা মনে কেমন কেমন হইতে লাগিল। কিন্তু, না যাইলেও শিলং-পীক দেখা হয় না। ইহাও একটা চির-জীবনের জন্য মনে আক্ষেপ থাকিয়া যাইবে। আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল বাঙ্গালীর পাহাড়ের দুর্গম পথ দিয়া পীকে উঠাই একেবারেই দুষ্কর কার্য্য তাহা পাঠকগণকে না বলিলেও হয়। অনিচ্ছাসত্ত্বেও থাপ্পায় উঠিয়া শিলং পীকে যাওয়া স্থির করিতে হইল।

প্রাঙ্গণে আসিয়া দেখিলাম থাপ্পাওয়ালারা বিষম গণ্ডগোল বাধাইয়াছে। কে কাহাকে লইবে, এই লইয়া তাহাদের বচসা হইতেছে। বাবু ও বাবুনীকে সকলেই অন্যের ভাগে ফেলিতে চায়। আরও কিছু বক্‌সিস দিতে স্বীকার করিয়া তাহাদের বিবাদ সেইখানে মীমাংসা করিয়া দেওয়া হইল। থাপ্পাওয়ালারা আমাদিগকে পৃষ্ঠে লইয়া পাহাড়ের উপরে

উঠিতে লাগিল। কখনও মেঘ উঠিতেছে, কখনও রৌদ্র হইতেছে, পাহাড়ে নানাবিধ গাছ; লতা-পাতা-ফুল-ফল দেখিয়া আমাদের মনে হইল যে, বাস্তবিকই যেন আমরা নন্দনে ভ্রমণ করিতে যাইতেছি। দেখিতে দেখিতে খাসিয়াদের পৃষ্ঠে থাপ্পায় চাপিয়া দুর্গম পথে আমরা পাহাড়ের উপর উঠিতে লাগিলাম। পাহাড়ের কতক দূর উঠিয়া আমরা দেখিতে পাইলাম—তেজপত্র, দারুচিনি এবং পিপুল প্রভৃতি বৃক্ষের সারি সারি শ্রেণী চলিয়াছে। সেই স্থানটীর মনোরম গন্ধে প্রাণ মাতাইয়া তুলিল। তাহার উপর প্রবল বায়ুর সোঁ সোঁ শব্দ। পথ দুর্গম হইলেও আনন্দে থাপ্পা হইতে লাফাইয়া পড়িলাম। লাফাইয়া পড়িয়া পদব্রজে চড়াই ভাঙ্গিতে লাগিলাম। জঙ্গলের মাঝে-মাঝে খাসিয়াদের কুটীর স্বচক্ষে না দেখিলে, সে সুন্দর দৃশ্যের বর্ণনা করিবার সাধ্য নাই। কতক দূর সেই পিচ্ছিল দুর্গম পথে উঠিয়াই হাঁফাইয়া পড়িলাম। দুর্ব্বল বাঙ্গালীর বীরত্ব অল্পক্ষণের মধ্যেই শেষ হইয়া গেল। অনিচ্ছাসত্ত্বে আবার মানুষের ঘাড়ে চাপিতে হইল।

আমাদের সঙ্গে পাঁচ জন খাসিয়া থাপ্পাওয়ালা ছিল। ইহাদের যথাক্রমে পাঁচ জনের নাম ঈশান (Easan) মনিশিং (Monisingh) হাসাম (Hasam) উরাম (Wooran) সলো

।সিয়া কুলীরা "থাপ্পায়" সকলকে চাপাইয়া "শিলং পীকের" উ
চড়াই ভাঙ্গিয়া উঠিতেছে। ধন্য ইহাদের পদযুগলের শক্তি।

(Sollow)। ধন্য এই ঝাপ্পাওলাদের শক্তি, ভগবান্ ইহাদের দেহ কি উপাদানে গড়িয়াছেন, তিনিই বলিতে পারেন। যে দুর্গম চড়াই—এক মাইল উঠিলে আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল বাঙ্গালীর হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বন্ধ হওয়া অসম্ভব নহে; ঝাপ্পাওয়ালারা এক একটী মনুষ্যকে পৃষ্ঠে লইয়া মাইলের উপর মাইল, ক্রোশের উপর ক্রোশ, বিনা কষ্টে বিনা বিশ্রামে চড়াই ভাঙ্গিয়া উঠিতেছে। ইহাদের শক্তি, বল, ও পদদ্বয়ের সুদৃঢ় পেশীগুলির দিকে চাহিলে অবাক হইয়া থাকিতে হয়। আমাদের উঠিবার পথে খাসিয়াদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর ও কুটীর সম্মুখস্থ তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাগানগুলি দেখিয়া প্রাণ পুলকিত হইয়া উঠিল। মনে হইল, ইহাদের ক্ষুদ্র কুটীরে এক দিন বাস করিয়া যাই। কিন্তু "পথে নারী বিবর্জ্জিতা" সাধ মিটাইবার উপায় ছিল না। পাহাড়ের গায়ে খাসিয়াদের আলুর চাষ। আলুর লতানে গাছগুলি বাতাসে হেলিতেছে, দুলিতেছে।

মাঝে-মাঝে গরীব খাসিয়াদের গৃহ; তাহাদের সেই ক্ষুদ্র কুটীরপানে বহুক্ষণ আমাকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতে হইয়াছিল। তাহাদের পরিবারে অনেকগুলি লোক, কিন্তু কুটীর একখানি মাত্র। চারিপার্শ্বে বড় বড় পাথর দিয়া একটী স্থান ঘেরিয়াছে, এবং ইহাকেই তাহারা রাঁধিবার স্থান করিয়াছে।

এইসব দৃশ্য দেখিতে দেখিতে যাইতেছি, এমন সময়ে পাহাড়ের গায়ে একটী ঝরণা দেখিতে পাইলাম। থাপ্পাওয়ালারা এইখানে একটু বিশ্রাম করিবার জন্য তাহাদের পৃষ্ঠদেশ হইতে আমাদিগকে নামাইয়া দিল। স্থানটী অতি মনোরম। থাপ্পওয়ালারা এখানে প্রায় অৰ্দ্ধ ঘণ্টা বিশ্রাম করিয়া ঝরণার জল পেট ভরিয়া খাইয়া লইল। থাপ্পাওয়ালারা বলিল "বাবু এই ঝরণার জল অতি সুন্দর। এই জল শিলং-শৈলে পাইপ দ্বারা লইয়া যাইতেছে, সহরে ইহাই এখানকার পানীয় জল।" আমরাও সেই জল পান করিয়া তৃপ্তিলাভ করিলাম।

পাহাড়ের উপর বহুক্ষণের পর একটু রৌদ্র হইল। পাহাড়ের শনশন শীতল বাতাসে আমাদের শরীর ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছিল। রৌদ্রের উত্তাপ পাইয়া মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সেই আনন্দকর স্থানে প্রফুল্ল মনে আমি থাপ্পাওয়ালাদের নিকট তাহাদের সংসারের নানাবিধ সুখ-দুঃখের কথা শুনিতে লাগিলাম।

আমাকে যে পৃষ্ঠে করিয়া লইয়া যাইতেছিল, তাহার নাম হাসান। গৃহিণীকে যে লইয়া যাইতেছিল, তাহার নাম ঈশান। ইহারা দুই জনেই একটু একটু হিন্দী বলিতে পারিত। এবং ভালরূপ হিন্দী বুঝিতে পারিত। ঈশান হিন্দীভাষা বেশ বুঝিতেছিল। আমি ঈশনের সঙ্গে তাহার সংসারের

গল্প জুড়িয়া দিলাম। সে খুব আনন্দচিত্তে উল্লাসভরে বলিতে লাগিল।

"বাবু, আমার আটটী পুত্র ; তিনটী কন্যা। আমার পুত্রগুলি উপযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের দ্বারা আমার কোনও উপকার হয় না। পাঁচটী পুত্রই তাহার শ্বশুরবাড়ীতে চলিয়া গিয়াছে, তাহারা যাহা উপার্জ্জন করে—তাহাদের শ্বশুরশাশুড়ী ও স্ত্রীকে দেয়—আমাকে কখনও এক পয়সাও তাহারা দেয় না। তিনটী সন্তানের এখনও বিবাহ হয় নাই, তাই, এখনও আমার কাছে আছে। বিবাহ হইলে, তাহারাও তাহাদের ভায়েদের ন্যায় শ্বশুরবাড়ী চলিয়া যাইবে। তিনটী কন্যা এখনও ছোট সেজন্য বাবুসাহেব, তাহাদের বিবাহ হয় নাই। ইহাদের বিবাহ হইলে তবে আমার অদৃষ্ট ফিরিবে। কন্যাদের বিবাহ হইলে তিন জামাই আমার ঘরে আসিবে তাহারা পুত্রের ন্যায় আমার ঘরে থাকিবে। এখন আমার তিনটি লেড়কী আলুর ক্ষেতীতে কাজ করে ;—আর একটু বড় হইলেই তাহাদের বিবাহ দিব। আপনারা যেমন পুত্র হইলেই আনন্দ করেন ; আমরাও পুত্র হইলে দুঃখে ম্রিয়মান হইয়া পড়ি ; কারণ পুত্রতো আমাদের ঘরে থাকিবে না, তাহারা পরের ঘরে চলিয়া যাইবে। কন্যা হইলে আপনারা যেরূপ দুঃখিত হন, আমরা সেরূপ দুঃখিত হই না।

কন্যা জন্মাইলে আমাদের গৃহে আনন্দের রোল উঠিতে থাকে।”

ঈশানকে উপার্জ্জনের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সে তাহার আধভাঙ্গা হিন্দী ভাষায় বলিতে লাগিল, “পূর্ব্বে খুব উপার্জ্জন করিতে পারিতাম, বাবুসাহেব, তখন আমার গায়ে অসীম শক্তি ছিল, তখন চারি মণ বোঝা পৃষ্ঠে লইয়া অবলীলাক্রমে বিনা বিশ্রামে দশমাইল রাস্তা ভাঙ্গিয়া উঠিয়াছি। আজকাল তেমন ভাবে উঠিতে পারি বটে কিন্তু মাঝে-মাঝে বোঝা নামাইয়া বিশ্রাম করিতে হয়। তখন আদৌ বিশ্রাম করিতাম না।”

তাহার স্ত্রীর কথা জিজ্ঞাসা করিলে, ঈশান তাহার দন্তপংক্তি বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিল, “খাসিয়ানী আলুর ক্ষেতে খুব খাটিতে পারিত বাবুসাহেব, আমার আরও দুইটা লেড়কা ও তিনটে লেড়কী ছিল, তাহারা মরিয়া যাওয়ায় ভাবনায় খাসিয়ানী কিছু রোগা হইয়া গিয়াছে। আমার ছেলেমেয়েরা সর্ব্বসুদ্ধ ষোল জন ছিল বাবুসাহেব। এখনও সে আলুর ক্ষেতে সমস্ত দিন কাজ করে, তবে পূর্ব্বের মত তত আর একদমে খাটিতে পারে না। খাসিয়ানী আমাকে খুব ভালবাসে; সে ভাত ও মাংস রাঁধিয়া আমার বাড়ী ফিরিতে যত রাত্রিই হউক, কোলের কাছে লইয়া বসিয়া থাকে। মেয়ে ও ছেলেদিগকে

আগে খাওয়াইয়া দেয়, কিন্তু আমি বাড়ী ফিরিয়া না যাইলে, সে এক দিনও খায় না। একবার আমার খুব অসুখ হইয়াছিল, সে তিন দিন কিছুই খায় নাই। দিন রাত আমার কাছে বসিয়াছিল।" খাসিয়ানীর কথা বলিতে বলিতে, ঈশানের মুখ আনন্দে লাল হইয়া উঠিল। এক নিশ্বাসে সে খাসিয়ানীর আরও কত কথাই বলিয়া ফেলিল।

বয়স ও আহারাদির কথা ঈশানকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিতে লাগিল "আমার উমের কত তাহা জানি না বাবু-সাহেব; তবে খাসিয়ানীর বাপের কাছে শুনিয়াছি, খাসিয়ানীর বয়স ২ কুড়ি ৬ বৎসর হইয়া গিয়াছে। আমরা খুব ফজিরে ও সাঁজে দুইবার ভাত খাই। আমরা দুই বারই মাংস খাইয়া থাকি। যেদিন পয়সা থাকে না, সেই দিন আর মাংস কেনা হয় না, কেবল আলু দিয়া ভাত খাই। আমি পূর্ব্বে পূর্ব্বে দুই বেলায় ৵২ সের চাউল ও ৵২ সের মাংস খাইতাম, এখন দুই বেলায় ৵১ সের চাউলের বেশী আর খাইতে পারি না। এখন আমাদের খাওয়ার কষ্ট হইতেছে, জামাইরা ঘরে আসিলে তবে আমাদের সুখ হইবে। আমি থাপ্পা বহিয়া ও মোট বহিয়া পূর্ব্বে দৈনিক ২॥০ টাকা হইতে ৩৲ উপার্জ্জন করিতাম, এখন ১॥০ হইতে দুই টাকার বেশী আর উপার্জ্জন করিতে পারি না। পয়সার অভাবে

কখনও ; কখনও আমাদিগকে কেবল আলু খাইয়াই থাকিতে হয়।”

ঈশানের ঘরের সুখ-দুঃখের কত কথাই শুনিতেছিলাম, আরও অনেক কথা হয়ত ঈশান শুনাইত, কিন্তু বহু চড়াই ভাঙ্গিতে হইবে। ঈশানের দলের সকলে থাপ্পা পৃষ্ঠে লইয়া উঠিয়া পড়িল। বোধ হয় অনিচ্ছাসত্ত্বে ঈশানও ধীরে ধীরে, আমাদের পৃষ্ঠে লইয়া চড়াই ভাঙ্গিতে লাগিল।

অনেক দূর চড়াই ভাঙ্গিবার পর আমরা আবার একটা সুন্দর অরণ্য দেখিতে লাগিলাম। এই স্থানের দৃশ্য আরও মনোরম। নানাবিধ গাছপালা, ফুল ফল ; কতরকম রংএর পাতা, ছোট বড় নানাবিধ বন্য ফল দুলিতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। শীতল প্রাণারাম বায়ু, সে বায়ু থাপ্পা ভেদ করিয়া হৃদয় স্পর্শ করিতে লাগিল। এই পথে অনেক খাসিয়ারমণীকে পৃষ্ঠে বোঝা লইয়া যাইতে দেখিলাম।

চড়াই ভাঙ্গিয়া এইবার আমরা পাঁচ মাইল উৰ্দ্ধে উঠিলাম। এই স্থানের নাম “মোপালোম (Mopalome) আমরা এতক্ষণে শিলং-পীকের মধ্যস্থলে আসিলাম। আরও তিন মাইল উৰ্দ্ধে উঠিলে তবে আমরা গন্তব্য স্থানে পৌঁছিব। এই স্থানে একটী খাসিয়ার চায়ের দোকান আছে, খাসিয়ারা এই স্থানে চা খাইতে বসিয়া গেল। প্রত্যেকে দুই কাপ

করিয়া চা ও তাহার সহিত বিস্কুট খাইল। এই স্থানে অনেকক্ষণ বিশ্রামের পর থাপ্পাওলারা আবার আমাদিগকে স্কন্ধে লইয়া চড়াই ভাঙ্গিতে লাগিল। ধন্য ইহাদের পায়ের শক্তি; ইহাদের পদযুগল লৌহ নির্ম্মিত বলিয়া আমার ভ্রম হইতে লাগিল। লাবান পাহাড় হইতে শিলংপীক আট মাইল অধিক উচ্চ। পথ পিচ্ছিল ও দুর্গম, এরূপ চড়াই শিলংএর আর কোথাও আমাদিগকে ভাঙ্গিতে হয় নাই। আমরা সকলেই তখন ক্ষুধিত ও শুষ্ককণ্ঠ। আমাদের অবস্থা দেখিয়া অনন্তবাবু জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আমরা উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাকে নিষেধ করিলাম, সে রব তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলেও তিনি বাধা মানিলেন না। মনে ভাবিলাম পরের কষ্ট দূর করিতে নিজের জীবনের মায়া করেন না, এমন লোক কি সংসারে এখনও আছে?

অল্পক্ষণের মধ্যেই অনন্তবাবু পাহাড়ের বিজন জঙ্গল হইতে কতকগুলি ডুম্বুরের মত লাল ফল লইয়া আসিলেন। ফলগুলি লইয়া আসিয়া সকলকে সমানভাবে ভাগ করিয়া দিলেন। গৃহিণী সন্দিগ্ধ-চিত্তে একবার আমার মুখের দিকে চাহিলেন। গৃহিণীর সেই চাহনি আমাকে বলিতেছিল, "জানি না, কি স্বার্থে অনন্তবাবু আমাদিগকে এই ফল খাওয়াইতেছেন। পাহাড়ে কত রকম বিষাক্ত ফল

থাকে, শেষে কি আমরা অজ্ঞানাবস্থায় এই জঙ্গলে পড়িয়া থাকিব ?

ফলগুলি লইয়া হাতে নাড়িতে নাড়িতে আমি ভাবিতে লাগিলাম, যে ভদ্রলোক আমাদের ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণের জন্য নিজের প্রাণকে তুচ্ছ করিয়া বিজন অরণ্য হইতে ফলগুলি সংগ্রহ করিয়া আনিলেন, সেই লোক কি এতটা অবিশ্বাসের যোগ্য ? মলিনতামাখান মন লইয়া বিচার করিতে গেলেই বুঝি এইরূপই ঘটে।

ঈশান আমার মনের অবস্থা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছিল, সে বলিল "এ ফল খুব ভাল ফল, বাবুসাহেব ! সাহেব লোকেরা খুব খায়।" ঈশানের কথায় গৃহিণীর সন্দেহ দূর হইল।

কি মধুর অম্লরসংযুক্ত ফল। দুইটী ফল খাইতেই প্রাণ ঠাণ্ডা হইয়া গেল, পিপাসা তিরোহিত হইল। করুণাময় ভগবান্ এই বিজন জঙ্গলের মধ্যে কি উপাদেয় ফলের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। ক্ষুধা-তৃষ্ণা-কাতর পথিকদের জন্য কিম্বা অরণ্যবাসী যোগী-সন্ন্যাসীর জন্য এই ফল সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা ভগবানই জানেন। আমরা ক্ষুদ্র মানব তাঁহার করুণা কত দিকে, কত রূপে ঝরিতেছে, তাহা কি বুঝিব ?

আরও কতক দূর গমন করিয়া একটী মনোরম ঝরণা দেখিতে পাইলাম। এই ঝরণার জল অতি স্বচ্ছ ও সুস্বাদু। স্থানটী অতি নির্জ্জন ও মনোরম। দেখিলে পুরাণবর্ণিত মুনি ঋষিদের আশ্রম স্থানের ন্যায় বোধ হয়। বাহকেরা বলিল "পাহাড়ের মধ্যে আর কোথাও জল মিলিবে না। এই ঝরণাই শেষ ঝরণা। নামিবার সময় আমাদিগকে পাহাড়ের অন্য দিক দিয়া অবতরণ করিতে হইবে। সে রাস্তায় কোথাও ঝরণা নাই।" আমরা সেই ঝরণার নিকটে চা প্রস্তুতের আয়োজন করিতে লাগিলাম। অনন্ত-বাবু স্বয়ং চা প্রস্তুত করিতে বসিয়া গেলেন। আমরা সকলে চারিদিকে শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলাম। সে কি আনন্দ ; ঝরণার নিকট চায়ের ব্যাপার চলিতে লাগিল। আমি ঝরণার অন্য দিকে একা বসিয়া বিশ্বের অপরূপ সৌন্দর্য্যের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। স্থানটী এমনি মনোরম ও শান্তিপ্রদ যে, আমার মনে হইতেছিল, আমি এ স্থান ত্যাগ করিয়া শিলং পীকে আর যাইব না। বিশ্বস্রষ্টা এই বিজন পাহাড়ের নিভৃত স্থানটী এমন করিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছেন কেন তিনিই জানেন। এক স্থানে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিলাম না। স্থানটীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া যে দিক হইতে ঝরণা নামিয়া আসিতেছে, সেই দিকে অগ্রসর

হইতে লাগিলাম। কতক্ষণ চলিয়াছিলাম মনে নাই, হঠাৎ চমক ভাঙ্গিলে দেখিলাম, ভীষণ জঙ্গলের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছি। ভয়ে বুক দুর দুর করিতে লাগিল। যে রাস্তা ধরিয়া অগ্রসর হইয়াছিলাম, আবার সেই রাস্তা দিয়া ফিরিয়া আসিলাম।

অনন্তবাবুর কাছে আসিয়া দেখিলাম, তিনি দুই কেতলী চা প্রস্তুত করিয়া বাহকদিগকে পান করাইতেছেন। বলিলেন, "আহা! ইহারা বড়ই পরিশ্রম করিয়া আসিয়াছে।" অনন্তবাবুর—বাহকদিগকে চা পরিবেষন করিতে দেখিয়া আমি আমোদে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। যে দুগ্ধটুকু আমাদের সঙ্গে ছিল, সেটুকু বাহকদিগের চায়েই অনন্তবাবু ঢালিয়া দিয়াছিলেন; চিনিও অল্পমাত্রায় রাখিয়াছিলেন। আমরা বিনা দুগ্ধ ও বিনা চিনিতে চা প্রস্তুত করিয়া সেদিন, সেই ঝরণার কাছে কত আনন্দেই যে পান করিয়াছিলাম, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। চা লইয়া আমাদের কাড়াকাড়ি হুড়াহুড়ি; মনে হইল আমরা এক লম্ফে চল্লিশ-বৎসর ডিঙ্গাইয়া পড়িয়া বাল্যকালে ফিরিয়া গিয়াছি।

এই চা পান ব্যাপারে আমাদের প্রায় ১৷৷০ ঘণ্টা দেরী হইয়া গেল; অপরাহ্ণ ৫৷৷০টার সময় আমরা শিলংপীক (Shillong Peak) এ উঠিলাম। কি মনোরম দৃশ্য!

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শিলংপীক শিলং-পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শিখর। অপরাপর গিরিশৃঙ্গগুলি এই স্থান হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। মনে হইতে লাগিল পৃথিবীতে জল নাই; স্থল নাই; মানব নাই, মানবের গৃহ নাই; জীব-জন্তু নাই; ভগবান্ পৃথিবীকে কেবল পাহাড় দিয়াই ঘেরিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছেন। এখান হইতে পাহাড় ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। যেদিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই পাহাড়, উত্তরে পাহাড়, দক্ষিণে পাহাড়, পূর্ব্ব-পশ্চিমে পাহাড়; চারিদিকে পাহাড় যেন আকাশকে চুম্বন করিতেছে। আবার মনে হইল আকাশ হইতেই পাহাড়গুলি বুঝি নামিয়া আসিয়াছে।

উত্তর পশ্চিমে নীল পাহাড়ের সঙ্গে শিলং-পাহাড় মিশিয়া রহিয়াছে। দক্ষিণ দিকে চেরাপুঞ্জি পাহাড়ের সঙ্গে মিশিয়াছে। অন্য দিকে জয়ন্তীয়া ও নাগাহিল। কোথাও রৌদ্র চিকচিক করিতেছে, কোথাও আকাশ হইতে পাহাড়ের গা বহিয়া রৌদ্র ঝরিয়া পড়িতেছে; এক দিকে চাহিয়া দেখিলাম, পাহাড় হইতে ধুম উঠিয়া আকাশে যাইয়া মিশিতেছে; দেখিয়া মনে হইল ঠিক যেন পাহাড়ে আগুন লাগিয়াছে। বাতাস ভীষণ শীতল ও কন্‌কনে হইলেও প্রাণারাম ও আনন্দদায়ক।

চারিদিকে যতদূর দৃষ্টি যাইতে লাগিল কেবল পাহাড়। পৃথিবী পাহাড়ময়, পাহাড় ছাড়া আর কিছুই নাই। লোকালয় নাই, মনুষ্য নাই, নির্জ্জন নিস্তব্ধ সেই গিরিশৃঙ্গ। তারপর চিক্‌চিকে রৌদ্র জয়ন্তীয়া পাহাড়ের মেঘমালার সুন্দর দৃশ্য—মনে হইতে লাগিল, এস্থান হইতে আর ফিরিয়া যাইব না, স্থির করিলাম এই স্থানেই একটী কুটীর বাঁধিয়া বাস করিব। পরক্ষণে চিন্তা করিয়া দেখিলাম কেবল দেহটী এখানে রাখিয়া কি করিব। মন প্রস্তুত হয় নাই; আসক্তি, ভোগলালসা, মোহ, মায়া প্রভৃতিতে মন ভরিয়া রহিয়াছে। মনে মাঝে মাঝে বৈরাগ্যের ভাব উদয় হয় বটে, জীবনের নশ্বরতা দেখিয়া সংসার ছাড়িয়া ছুটিয়া পলাইতে ইচ্ছা হয় বটে; কিন্তু সেটা ক্ষণিক শ্মশান-বৈরাগ্য। জীবন ক্ষয় হইয়া যাইতেছে; কিন্তু কৈ বাসনার ত ক্ষয় হইল না? ভোগলিপ্সা তো কমিল না! ধীরে ধীরে বার্দ্ধক্য আসিয়া দেখা দিতেছে; ভোগ করিবার শক্তি নাই; কিন্তু ভোগের বাসনা পূর্ব্বেও যেমন ছিল এখনও তেমনই আছে। ক্ষুধা নাই; পরিপাক শক্তি চিরতরে তিরোহিত হইয়া গিয়াছে, তত্রাচ উপাদেয় মিষ্টান্নসম্ভার দেখিলেই রসনায় জল আসে। হস্ত পদ চক্ষু কর্ণযুক্ত দেহটী এখানে থাকিবে বটে; কিন্তু মন ভোগ

বাসনায় লিপ্ত থাকিবে। ভাবিলাম এরূপ গৃহত্যাগের ফল নাই। ইহাতে বরঞ্চ জীবনের অপচয় ঘটিবে। মনকে গেরুয়া পরাইতে না পারিলে, কটিতটে গেরুয়া পরিলে সংসারের সহিত কেবল প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা করা হয়। মন যদি অহরহঃ গেরুয়া পরিয়া আসক্তি ও ভোগলিপ্সা বিসর্জ্জন দিতে পারে; সহস্র প্রলোভনে সে মন যদি বিচলিত না হয়, তবে বাহিরে গেরুয়া পরিধান বা কৌপীন ধারণের প্রয়োজন হয় না। বাহিরে কৌপীন পরিয়া যাহাদের অন্তরে ভোগলিপ্সা আছে আমার মনে হয় তাহারা পুত্র পরিবার পরিবেষ্টিত সংসারী অপেক্ষাও নিকৃষ্ট; মুক্তি তাহাদের বহুদূরে।

"যেখানে যাবে সেইখানেই চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে; চারিদিক যে অন্ধকার হইয়া আসিল; এইখানেই আজ থাকিবে নাকি?"

গৃহিণীর বাক্যে কৌপীন, গেরুয়া কোথায় ভাসিয়া গেল; হায়! নারী তোমাদের আকর্ষণ সে মধ্যাকর্ষণের চেয়েও শক্তিশালী। গৃহিণীর কথায় চলিয়া আসিয়া দেখিলাম, সকলে শিলংপীক হইতে অবতরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমাকেও বাধ্য হইয়া তাহাদের সঙ্গে অবতরণ করিতে হইবে; চক্ষে জল আসিল। সত্যই কি, আমাকে এই

মনোরম স্থান ত্যাগ করিয়া আবার হিংসা, দ্বেষ, কলহ ভোগ রাগ ও দ্বেষপূর্ণ সংসারে যাইয়া প্রবেশ করিতে হইবে? হায় ভগবান্! কবে আমার এ কষ্টের অবসান হইবে? কবে আমি তোমাকে ছাড়া আর কাহাকেও দেখিব না, বুঝিব না? কবে সকল চিন্তা মন হইতে দূর করিয়া দিয়া হৃদয়কে পবিত্র করিতে এবং সেই পবিত্রহৃদয় সিংহাসন পাতিয়া তোমাকে বসাইব প্রভু? বুঝিতেছি সব অনিত্য, গুরু বলিয়াছেন "একদিন সব চুপ হো যায়ে গা" অহরহঃ গুরুদেবের সেই কথা স্মরণ হইতেছে বটে; কিন্তু কর্ম্মের বীজ এমনই অমর—যে মন হইতে প্রবৃত্তি দূর হইয়া নিবৃত্তি আসিতেছে না।

কত লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী জন্ম এইরূপ ঘুরিতেছি, প্রবৃত্তি বশে জন্মিতেছি, মরিতেছি; শেষ কবে হবে প্রভু? বুঝি পূর্ব্বপূর্ব্বজন্মে কিছু ভাল কর্ম্ম ছিল, তাই ইহজন্মে ত্যাগী যোগী, অরণ্যবাসী সিদ্ধ মহাপুরুষ গুরুর কৃপাকণামাত্র লাভ করিয়াছি; তাঁহার করুণার আশায় নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া আছি! চেষ্টা করিবার শক্তি নাই; সামর্থ্যও নাই; কেবল তাঁহার করুণার অপেক্ষায় তাঁহার পাদপদ্মের দিকে চাহিয়া আছি। বৃহৎ অর্ণবপোতের পশ্চাতে ক্ষুদ্র বোটখানি যেমন বিনা আয়াসে, বিনা চেষ্টায় সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া যায়,

তাহার যেমন কোনও চেষ্টা করিতে হয় না, আমি সেই আশায় কেবল বসিয়া আছি। মুহূর্ত্তের তরে যখন সংসারের অসারতা অনিত্যতা হৃদয়ে উদিত হয়, তখন মনে হয় ছুটিয়া পালাই—আর থাকিব না, আর কর্ম্ম বাড়াইব না। যে কর্ম্মের বীজ হৃদয়ে ছড়ান আছে, সময় ও সুবিধা পাইলে, তাহারা বৃহৎ মহীরুহ হইয়া চারিদিকে শিকড় বিস্তৃত করিয়া দেয়; জানি না, সেই সব কর্ম্মবীজ আরও কত জন্ম জন্মান্তরের পর শুষ্ক হইয়া যাইবে। পরক্ষণে আবার হৃদয় বাঁধিয়া লাফ দিয়া উঠি, নিত্যশুদ্ধ মুক্তপুরুষ যাহার গুরু-তাঁহার করুণা হইলে কর্ম্মবীজ শুষ্ক হইবে না কেন? যথার্থ ত্যাগী যোগী গুরুর কৃপা হইলে অঘটনও ঘটিতে পারে। হিমালয়বাসী মহাযোগী গুরুর আজ্ঞায় তাঁহার প্রদত্ত মন্ত্র অহরহঃ হৃদয়ে, শয়নে, স্বপনে জাগরণে জপ করিতেছি; তাহার ফল কি কিছু হইবে না? গুরুদেব তুমি বুঝিতেছ যাহা করিতেছি; বলিতেছি, সকলই কলের পুত্তলিকার ন্যায় কর্ম্মের স্রোত গলদেশে রজ্জু বাঁধিয়া যে টানিয়া লইয়া যাইতেছে; আমার ইচ্ছা নাই, যে স্থানে যাইতে; আমরা অনিচ্ছায় কর্ম্মস্রোত গলদেশে দড়ি বাঁধিয়া বারম্বার সেই স্থানেই টানিয়া লইয়া যাইতেছে। আমার তাহাতে হাত নাই, শক্তি নাই, "বুঝি না" বলিবারও ক্ষমতা নাই।

লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী জন্মের কর্ম্মফল ও সংস্কার হৃদয়ে সঞ্চিত রহিয়াছে, ইহজীবনের ক্ষুদ্র চেষ্টা তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া কি করিবে প্রভু? আর ইচ্ছা হয় না অর্থ উপার্জ্জনের নারকীয় যন্ত্র পরিচালনা করি; কিন্তু আসক্তি-রজ্জু আমাকে টানিয়া লইয়া যায়। ইচ্ছা হয় না, অনর্থের মূল অর্থ উপার্জ্জনের নব নব কৌশল উদ্ভাবন করি, কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার আমাকে সেই বিষ্ঠায় লইয়া গিয়া মুখ রগড়াইয়া দেয়। জানিতেছি, বুঝিতেছি সঙ্গে কিছু যাইবে না; মোট বাঁধিয়া মাথায় করিয়া কিছু লইয়া যাইতে যমদূত আমাকে অনুমতি দিবে না, তবু আমি মোট বাঁধিয়া রাখিতেছি—যদি যমদূতকে ফাঁকি দিয়া কিছু সঙ্গে লইয়া যাইতে পারি। বুঝিতেছি দিন কতক পরে আমার জন্য কেহ কাঁদিবে না, ভাবিবে না; তবু আমি তাহাদিগকে আপনার বলিয়া জোর করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছি। তাহাদের সুখের জন্য, তাহাদের মনস্তুষ্টির জন্য, তাহাদের আনন্দলাভের জন্য সংসারে কত অঘটন ঘটাইয়াছি; লোকের অভিশাপ কুড়াইয়াছি; দানবমূর্ত্তিতে কত লোকের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইয়াছি; ক্রোধরূপী চণ্ডালের দ্বারা পরিচালিত হইয়া কতলোককে কতরূপে নির্য্যাতন করিয়াছি। কিন্তু কাহার জন্য? কে তাহারা? হায়!

তাহারাই আমার উন্নতির পথ, ভগবদ্দর্শনের পথ, মুক্তির পথে, কণ্টক দিয়া ঘিরিয়া রাখিয়াছে। গুরুর কৃপায় কত দিনে এই মোহ-বন্ধন টুটিবে জানি না; কত দিনে চক্ষের ঠুলী খুলিয়া যাইবে বলিতে পারি না; চীৎকার করিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হয়। অর্থ, সংসার বা স্ত্রী-পুত্র-কন্যা গাড়ীঘোড়া অট্টালিকা এ সমস্ত ভোগ্যবস্তু অহোরাত্র ভোগ করিয়া ভোগের বাসনাতো মিটিতেছে না? বরং এই সমস্ত ভোগ করিয়া দিন দিন ভোগের লালসা বাড়িতেছে; এতদিনে বুঝিয়াছি, ভোগ্যবস্তু ভোগ করিবার বাসনা ক্ষয় হয় না; মনেপ্রাণে এই সমস্ত জিনিষ অকিঞ্চিৎকর; অনিত্য, অসত্য এই বিচার করিয়া গুরুর কৃপায় ত্যাগ করিতে পারিলে, তবে বুঝি ভোগবাসনা দূর হইতে পারে। বুঝিতেছি এই সমস্ত ভোগ্য বস্তু ভোগ করিতে থাকিলে সৎসঙ্গ মিলিবে না। সৎসঙ্গ ঘরের মধ্যে থাকিলে লাভ করিতে পারা যায় না, সংসার ও বিষয়কর্ম্মের মধ্যে চিরদিন মগ্ন হইয়া থাকিলে চিরজীবন অসৎ সংসর্গের মধ্যেই বেষ্টিত হইয়া থাকিতে হইবে।

এখন আজ বুঝিলাম নির্জ্জনতা কত প্রিয়, নির্জ্জনতার মধ্যে হইতে যে মহামন্ত্র প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে ইহার সংবাদ ত এত দিন রাখি নাই। হঠাৎ বন্য জন্তুর পদশব্দে

বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। স্ত্রীপুত্রকন্যা ভৃত্যের প্রতি মোহের বন্ধনগুলি আবার আমাকে সজোরে আকর্ষণ করিল। আমি পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিতে করিতে, পাগলের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলাম। "ছুটিয়া এস সব, কে কোথায় আছ, প্রাণের বন্ধু তোমরা আজ কোথায় ছুটিয়া এস। ভগবানের রূপচ্ছটা একবার এই শিলংএর সর্ব্বোচ্চপাহাড়ে দেখিয়া যাও। একা দেখিয়া তৃপ্তি হইতেছে না, তোমরাও এস অপরিসীম স্থানমাহাত্ম্য প্রাণে প্রাণে অনুভব করিবে। শ্মশানবৈরাগ্য হইলেও ক্ষণতরে মন মধ্যে বৈরাগ্যের উদয় হইবে। একবার ছুটিয়া এস ভাই, মোহ মায়া ; গৃহস্থালী, অর্থোপার্জ্জন সমস্ত ত্যাগ করিয়া ভগবানের এই অপরূপ রূপ দেখিয়া একবার হৃদয়কে ধৌত করিয়া লইয়া যাও। যাহা ভাল তাহা একা খাইয়া, একা ভোগ করিয়া একা দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারা যায় না ; তাই আজ ডাকিতেছি, তোমরাও এস ভাই —এস বন্ধু।"

অনিচ্ছাসত্ত্বে নিজের কত কি সেখানে রাখিয়া পাহাড়ের আঁকা বাঁকা পথ ধরিয়া নামিতে লাগিলাম। শুনিলাম শীতকালে এই পাহাড়ের উপর স্তূপাকার বরফ জমিয়া থাকে, সে সময় এই পাহাড়ে আসিলে বরফে জমিয়া যাইতে হয়। মন বলিতেছে, "যাবো না যাবো না ;

কিন্তু কর্ম্মসূত্র জোর করিয়া পাহাড় হইতে আমাকে নামাইয়া আনিতে লাগিল।

আমরা যে স্থলে উঠিয়াছিলাম সেই শিলংপীক কলিকাতা হইতে ৬০০০ ফিট উচ্চ। আমার মনে হইল যতক্ষণ উচ্চে উঠিয়া থাকা যায়, হৃদয়ও বুঝি একটু উচ্চ অবস্থায় থাকে। নামিতে নামিতে দেখিলাম, দূরের পাহাড়গুলি যেন রণক্ষেত্রের শিবিরের পর শিবির সন্নিবেশিত হইয়া রহিয়াছে।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে দেখিতে পাইলাম পাহাড়ের চারিদিকে কে যেন পাকা সোনা গলাইয়া লতাপাতা ও গাছের শিরে শিরে ঢালিয়া দিয়াছে। এই সমস্ত অবলোকন করিতে করিতে ক্লান্ত, অবসন্নদেহে অনেকরাত্রে আমরা বাসায় আসিয়া পৌঁছিলাম।

দশম পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়াই দেখিলাম পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিনের ন্যায় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। বৃষ্টি হইতেছে, চারিদিকে অন্ধকার; প্রাতঃকালে কোথাও বাহির হইতে পারা গেল না। অপরাহ্নে "মোখার" (Mokhar) বেড়াইতে গেলাম। মোখার শিক্ষিত খাসিয়াদের একটী পল্লী। বহু শিক্ষিত খাসিয়া নরনারী খ্রীষ্টান হইয়া গিয়াছে, তাহাদের Church, School প্রভৃতি দেখিলাম।

খাসিয়াদের মধ্যে বহু শিক্ষিত ব্যক্তি এমন কি graduate'ও অনেক আছেন। পূর্ব্বে বহু খাসিয়া দলে দলে খৃষ্টান হইত। এইস্থানে আমরা খাসিয়াদের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব।

১৯০১ সালের সেন্সস রিপোর্টে দেখা যায় ইহাদের লোক সংখ্যা ২৩৫০৬৯ জন। এই জেলাটী দুইটী divisionএ বিভক্ত। খাসিয়া হিল এবং জয়ন্তিয়া হিল, জেলার পশ্চিম ভাগ খাসিয়া এবং পূর্ব্ব ভাগ জয়ন্তীয়া।

খাসিয়াদের স্বাভাবিক গায়ের বর্ণ গৌর; তাহাদের মস্তক কতকটা চেপ্টা, চক্ষু মধ্যম ও বর্ণ সবুজ, কতকগুলির

চক্ষু ধূসরবর্ণ, মুখশ্রী দেখিতে কতকটা চীনেদের ন্যায়, মুখ গহ্বর বড়; ঠোটগুলি পুরু। ইহাদের চুল কাল; স্ত্রীলোক-দিগের চুল খুব লম্বা। কোথাও কোথাও খাসিয়ারা পুরাতন ফ্যাসানে চুলের গাঁইট বাঁধিয়া পিছনের দিকে ঝুলাইয়া রাখে। সাধারণতঃ খাসিয়ারা তাহাদের চুল ছোট করিয়া কাটে, কিন্তু মাথায় এক গুচ্ছ চুল রাখিয়া দেয়। খাসিয়াদের দাড়ী প্রায় দেখা যায় না, অতি অল্পসংখ্যক লোকেরই গোঁপ দেখিতে পাওয়া যায়।

খাসিয়ারা সাধারণতঃ খর্ব্বাকৃতি; শরীর খুব স্বাস্থ্যপূর্ণ এবং অবয়বের মাংসপেশী অতি সুদৃঢ়। উহাদের ছোট ছোট শিশুগুলিকে দেখিতে বেশ সুন্দর। খাসিয়াদের ন্যায় ভারী বোঝা বহিতে অপর কোন জাতিই সক্ষম নহে। ইহারা কুলীর কাজে দক্ষ এবং কষ্টসহিষ্ণু; ভারী বোঝা পিঠে করিয়া বিনা ক্লেশে পাহাড়ের উপর উঠিয়া যায় একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। জঙ্গলের এক প্রকার বেতের ন্যায় লতার দ্বারা ইহারা দড়ী প্রস্তুত করে। পিঠের বোঝার সহিত সেই দড়ী বাঁধিয়া কপালে আটকাইয়া দিয়া পাহাড়ে উঠিতে থাকে। খাসিয়ারা বড় বড় বোঝা পৃষ্ঠে লইয়া পাহাড়ের উপর দিয়া ৩০।৩২ মাইল পথ অক্লেশে অতিক্রম করিতে পারে, তাহাতে ইহারা কোনরূপ কষ্ট অনুভব করে না।

খাসিয়াদের নিজস্ব লিখিবার কোনরূপ ভাষা ছিল না; ইংরাজেরা ইহাদের লিখিবার Alphabet ইংরাজী করিয়া দিয়াছেন। যদি ইহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়, ইহারা লেখাপড়া খুব শীঘ্রই শিখিতে পারে। বহু খাসিয়াই তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিশালী পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইহাদের ভিতর অনেকেরই লেখাপড়ার ঝোক দেখা যায়।

খাসিয়ানীরা অনেকেই ইংরাজ বালকবালিকাদের আয়ার কার্য্য করিয়া থাকে। অনেক খাসিয়া 'মাল গুদামে' কার্য্য করিতেছে দেখিলাম। ইহারা প্রাণপণে মনিবের কার্য্য করে ও অক্লান্ত পরিশ্রমী; এই জন্য মনিব ইহাদিগকে অত্যন্ত ভালবাসেন। পরিশ্রমের গুণে গভর্ণমেণ্ট অফিসেও ইহারা যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে।

খাসিয়ারা পাথরের কাজ ভাল জানে। পাথরের বাড়ী নির্ম্মাণ ও পাথর দ্বারা অন্যান্য কার্য্য করিতে বিশেষ পারদর্শী। ছুতারের কাজ, কামারের কাজ, কলকারখানার কাজ বহু খাসিয়া এখন শিক্ষা করিয়াছে এবং ইহাতে যথেষ্ট নিপুণতা লাভ করিয়াছে।

খাসিয়াদের স্ত্রী-পুরুষ বালকবালিকা সকলেই পান ও সুপারী বেশী পরিমাণে ব্যবহার করে। ইহারা এক স্থান হইতে অন্যস্থানে যাইবার সময় পান ও সুপারি প্রচুর

পরিমাণে লইয়া যায়। এ বিষয়ে ইহারা বাঙ্গালীকে টেক্কা দিয়াছে। খাসিয়ারা সর্ব্বক্ষণই তামাক পাতা দিয়া পান ও সুপারি চর্ব্বণ করে এবং মুখের মধ্যে রাখিয়া দেয়। খাসিয়াদের অধিকাংশই মদ্যপায়ী। ভাত হইতে প্রস্তুত এক প্রকার মদ্য বেশী ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহাদের কাজ কর্ম্ম ও উৎসবে মদ্য অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয় এবং ইহারা মদ্য পানে উন্মত্ত হইয়া খুব আনন্দ উপভোগ করে।

খাসিয়ারা খুব সাদাসিদে, কর্ত্তব্যপরায়ণ; সত্যবাদী এবং নির্ভীক। খুব অল্পই ইহাদের মধ্যে চোর-ডাকাত দেখিতে পাওয়া যায়। খাসিয়ারা সাধারণতঃ প্রভুভক্ত। প্রভুর আজ্ঞাই ইহারা শিরোধার্য্য করিয়া চলে; খাসিয়ারা এত সত্যবাদী যে, সত্য কথা বলিতে ইহারা সভ্যদেশকেও পরাস্ত করিয়াছে। এই গুণ ইহারা বংশানুক্রমে প্রাপ্ত হইয়াছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য সভ্যদেশ অপেক্ষা ইহাদের কার্য্যপটুতার ও সত্যবাদিতার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না।

যে সব খাসিয়া খ্রীষ্টান হইয়াছে তাহারা অধিকাংশই খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং অনেকেই সাহেবি ভাবে থাকে। ইহারা পোষাক পরিচ্ছদও খুব পরিষ্কার রাখে। খাসিয়া ও খাসিয়ানীদের পোষাক পরিচ্ছদ দুই রকম; আধুনিক এবং পুরাতন। পুরুষ খাসিয়ারা প্রায়ই কোট ব্যবহার

করে; এবং এক প্রকার জামা ব্যবহার করে। ইহার পিঠের দিক জোড়া এবং বুকের উপর কতকটা সোলা দেওয়া থাকে অথবা সূতার বোতাম দিয়া আটকাইয়া রাখে। বহু খাসিয়াই মাথায় এক এক টুপী ব্যবহার করে; সাদা পাগড়ীও কেহ কেহ ব্যবহার করে।

খাসিয়ানীদের পোষাক অন্যরূপ। ইহারা প্রথম একটা ছোট কাপড় কোমরে জড়ায়; তাহার উপর জামা ইত্যাদি পরিয়া থাকে; ইহারা শাড়ী কাপড় পরে না। শিক্ষিতা স্ত্রীলোকেরা অগ্রে একটা সেমিজ পরে—তাহার উপর একখানা ভাল মোটা কাপড় দুই বাহুর নিম্ন দিয়া বুকের উপর বাঁধিয়া রাখে এবং অপর দুই কোণ পায়ের গোড়ালীর দিকে ঝুলাইয়া দেয়। ইহাদিগকে প্রায়ই মূল্যবান্ পোষাক পরিচ্ছদে ভূষিত থাকিতে দেখা যায়।

খাসিয়া স্ত্রীলোকেরা শীতকালে লম্বা মোজা অথবা পটির ন্যায় গরম কাপড়ের টুকরা পায়ে জড়াইয়া রাখে। অন্যান্য পাহাড়ে জাতি অপেক্ষা খাসিয়ারমণীদের পোষাক-পরিচ্ছদ সুন্দর। খাসিয়ানীরা প্রায়ই মাথা অনাবৃত রাখে না, একখানা রুমাল মাথায় বাঁধিয়া রাখে। আধুনিক খাসিয়ারা মোজা, জুতা, কোট, ওয়েষ্টকোট, কামিজ প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া থাকে। শিক্ষিতা খাসিয়া স্ত্রীলোকেরা আধুনিক

ফ্যাসানের ভেলভেটের বডি, সেমিজ, মোজা, জুতা ইত্যাদি ব্যবহার করে। কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত স্ত্রী বা পুরুষ সকলেই একটা করিয়া ছোট ঝুলি ব্যবহার করিয়া থাকে।

খাসিয়ারা অত্যন্ত জহরৎপ্রিয়। ইহারা গলদেশে মাদুলীর ন্যায় একপ্রকার হার ব্যবহার করিয়া থাকে। হারের মধ্যে দানা দানা লালপ্রবাল বা ঐ প্রকার লাল পাথর এবং মধ্যে মধ্যে সোনার মোটা দানা থাকে। এই সোনার দানাগুলি ফাঁপা ও ইহার ভিতরে গালা ভরা থাকে। এইরূপ হার স্ত্রীপুরুষ সকলেই ব্যবহার করে। যাহারা ধনী তাহাদের এই হার খুব মূল্যবান্ হইয়া থাকে। এই সোনার দানাগুলি খাসিয়া স্বর্ণকারেই প্রস্তুত করিয়া থাকে। ইয়ারিংএর ন্যায় একপ্রকার গহনা ইহাদের স্ত্রী পুরুষ সকলেই ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহারা একপ্রকার বেশ সুন্দর রূপার টিকলী ব্যবহার করে; এবং ইহার আদর তাহাদের নিকট অত্যন্ত অধিক। বেশ সুবিন্যস্ত ভাবে ইহা বুকের উপর ঝুলিতে থাকে। ইহাদের স্ত্রীপুরুষ উভয়েই রূপার গোট ব্যবহার করিয়া থাকে। পুরুষেরা এই রূপার গোট Beltএর ন্যায় কটিদেশে বেষ্টিত করিয়া রাখে। এবং স্ত্রীলোকেরা গলায় ঝুলাইয়া দেয়। আমাদের ব্রেসলেটের ন্যায় খাসিয়ানীরা একপ্রকার গহনা ব্যবহার করে এগুলি

সোনা এবং রূপার দ্বারা প্রস্তুত। গরীব খাসিয়ারা এই সমস্ত গহনা পিতলের প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করে এবং পিতলের নানারূপ ইয়ারিংও ব্যবহার করিয়া থাকে। প্রবালও এবং উক্ত বর্ণের একরূপ পাথর খাসিয়ারা বিশেষ আদরের সহিত ব্যবহার করিয়া থাকে।

অধিকাংশ খাসিয়াই চাষ করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। আলু ইহাদের প্রধান চাষ তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কতক খাসিয়া স্ত্রীপুরুষ উভয়ে দৈনিক কুলীর কাজ করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে। ইহারা কাজকে ভয় করে না বরং পরিশ্রম করিতে ইহারা ভাল বাসে। কাজ না পাইলে, ইহারা বিরক্ত হয়। অপরের কাজই হউক বা নিজের কাজই হউক ইহারা কার্য্যগুলি বেশ সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন করে। ইহাদের কার্য্য দেখিয়া সভ্যজাতিকেও লজ্জিত হইতে হয়। খাসিয়ারমণীরা ব্যবসা বাণিজ্যে বিশেষ নিপুণ এবং ইহাতে তাহারা বিশেষ আনন্দলাভ করে। এই সব কার্য্যে পুরুষেরা ইহাদের সমকক্ষ হইতে পারে না।

ইহারা বাড়ী ঘর খুব পরিষ্কার রাখে। ইহাদের ঘর অধিকাংশই খড়ের। কাহারও কাহারও টিনের ঘরও আছে। মাটী হইতে দুই তিন ফিট উঁচু খুটা গাড়িয়া তাহার উপর কাটের পাটাতন বিছায়।

সাধ্যানুসারে ইহারা গৃহ বেশ সাজাইয়া রাখে। ইহাদের সকলেরই ঘর ছোট। দেখিলে, মনে হয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর বাঁধিয়া রহিয়াছে। ইহারা ঘরের মধ্যে পাথর দিয়া আগুন রাখিবার স্থান প্রস্তুত করে। প্রত্যেক খাসিয়ার গৃহেই এইরূপ আছে। ভীষণ শীতের জন্যই এই প্রথা। ইহারা শূকর, মুরগী, গরু বাছুর সকল জীব জন্তুই পুষিয়া থাকে এবং গৃহের নিকটেই তাহাদের থাকিবার জন্য ঘর প্রস্তুত করে। একটী ক্ষুদ্র গৃহ, তাহার মধ্যে তিন চারিটী বিভাগ। এই বিভাগের মধ্যেই পালিত পশুদিগকে রাখিয়া দেয়। লালমাটী অথবা গোবর দিয়া খাসিয়ারা তাহাদের ক্ষুদ্র গৃহগুলি লেপিয়া বেশ ঝক ঝকে পরিষ্কার করিয়া রাখে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি খাসিয়াদের ঘর খুব ছোট ছোট। তাহারা যখন এইরূপ নূতন ঘর একখানি প্রস্তুত করে, তখন উহাতে বাস করিবার পূর্ব্বে একটী আনন্দ উৎসবের আয়োজন করিয়া থাকে। এই উৎসবকে খাসিয়া ভাষায় (Kynjoh-ka-skani) কীনজোকস্কানী বলে। তিন টুকরা শুষ্ক মৎস্য সেই নূতন ঘরের উপর রাখিয়া দেয় এবং পুনরায় তাহা লাফাইয়া লইয়া আসে। নূতনগৃহে একটী শূকর হত্যা করে এবং তাহাকে টুকরা টুকরা করিয়া বাঁধিয়া রাখে

এরূপভাবে তাহারা নূতন গৃহে পূজা করে। পূজা শেষ হইয়া গেলে, দুইটী মুরগী হত্যা করে বা বলী দেয়। একটী নূতন ঘরের সম্মুখে ও অপরটী গৃহের পশ্চাতে। মুরগীর পালকগুলি গৃহের মধ্যস্থলে একটী খুঁটিতে বাঁধিয়া দেয়। ঐ খুঁটী ওকগাছে প্রস্তুত করিয়া থাকে।

খাসিয়াদের পুত্রের বিবাহ হইলে তাহারা শ্বশুরবাড়ীতে চলিয়া যায় এবং উপার্জ্জন করিয়া শ্বশুর-শ্বাশুড়ীকেই দিয়া থাকে; পিতামাতার সহিত তাহাদের কোনও সম্পর্ক থাকে না। অপর পক্ষে কন্যার বিবাহ হইলে জামাতা তাহার গৃহে আসিয়া থাকে। কন্যা জন্মাইলেই ইহারা খুব আনন্দিত হয় কারণ তাহারা উপার্জ্জনক্ষম জামাই গৃহে লইয়া আসিবে।

খাসিয়ারা উৎসবের সময় ওকবৃক্ষের একটা লম্বা খুঁটী প্রস্তুত করে; ঐ খুঁটীতে চতুষ্পদ জন্তুর চিবুকের হাড় এবং মুরগীর পালক বাঁধিয়া দেয়। স্ত্রীলোকেরা এই ওকবৃক্ষের খুঁটীর নিম্নে মহানন্দে নৃত্য করিতে থাকে। ইহা আমাদের দেশের নৃত্যের ন্যায় নহে; কিন্তু এই উৎসবে যুবতী খাসিয়ানীদের নৃত্যে খাসিয়ারা একেবারে মুগ্ধ হইয়া যায় এবং তাহারা খুব আনন্দ উপভোগ করে। শিক্ষিত ও খ্রীষ্টান খাসিয়ারা বর্ত্তমানে 'করোগেট আয়রণ' দ্বারা সাহেবদের
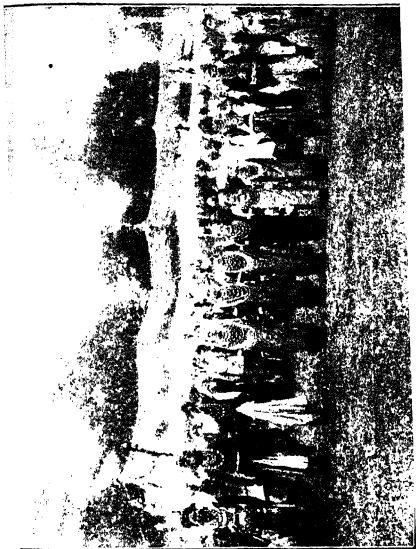
খাসিয়া যুবতীরা বেশভূষায় সুসজ্জিতা হইয়া নৃত্য করিতেছে।

অনুকরণে বাঙ্গালা প্রস্তুত করিয়াছে, এবং অনেকেই সাহেবদের ন্যায় বাঙ্গালায় দরজা, জানালা ও আসবাবপত্র নির্ম্মাণ করিতেছে।

আমাদের দেশের ন্যায় এক জায়গায় একসঙ্গে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া ইহাদিগকে বাস করিতে প্রায়ই দেখা যায় না। ইহাদের বাসভবন প্রায়ই দূরে দূরে; পাহাড়ের নিম্নে, উচ্চে, পাহাড়ের গায়ে গায়ে। একসঙ্গে বাসভবন প্রস্তুত করিয়া ইহারা অন্যান্য জাতির ন্যায় শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে বাস করে না। অবস্থা অনুসারে খাসিয়াদের পাক-পাত্র মৃত্তিকা, লৌহ বা পিত্তল নির্ম্মিত হইয়া থাকে। গরীব খাসিয়ারা প্রায়ই মাটীর এবং বাঁশদ্বারা প্রস্তুত আহারের পাত্র ব্যবহার করিয়া থাকে।

রৌদ্র ও বৃষ্টির হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য ইহারা বংশ নির্ম্মিত একপ্রকার ছাতা ব্যবহার করিয়া থাকে। আমাদের দেশের চাষীরা যে প্রকার তালপত্রের টোকা ব্যবহার করে ইহাও কতকটা সেই প্রকার। ইহা এমন সুন্দরভাবে প্রস্তুত হয় যে, মুষলধারে বৃষ্টি পড়িলেও খাসিয়াদের গায়ে বা মাথায় একবিন্দু বৃষ্টি লাগে না। ইহাদের নিজেদের প্রয়োজনীয় সকল জিনিষই স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া থাকে।

ধান হইতে চাউল বাহির করিবার জন্য কাঠের ও বাঁশের ইহারা একপ্রকার উদ্খী প্রস্তুত করে, মেয়েরাই এই কার্য্য করে; ইহাদ্বারা সুন্দররূপে ধান হইতে চাউল বাহির করিয়া লয়। আমাদের বাঙ্গালীর মেয়েদের ন্যায় ইহারা কেবল গৃহকার্য্য লইয়াই থাকে এবং নানাপ্রকার জিনিষ নিজেরা প্রস্তুত করিয়া লয়।

ধান্য ও চাউল রাখিবার জন্য খাসিয়ানীরা সুন্দর এক প্রকার চেঙ্গারী প্রস্তুত করে। ইহাতে প্রায় কুড়ি পঁচিশ মণ ধান্য, আলু বা অন্য শস্য রাখিতে পারা যায়।

ইহাদের কোন অস্ত্র নাই; তীরধনুকই ইহাদের অস্ত্র। তীরধনুর সাহায্যে ইহারা পাহাড়ের ভীষণ জঙ্গলে শিকার করিতে ভালবাসে। যাহারা ধনু বিদ্যায় অভ্যস্থ, অন্যান্য খাসিয়ারা তাহাদের নিকট যাইয়া ধনুবিদ্যা শিক্ষা করে।

খাসিয়ারা সাধারণতঃ দুইবার আহার করিয়া থাকে; একবার খুব প্রাতঃকালে ও একবার সন্ধ্যায়। তবে যাহারা কুলীর কাজ ও কঠোর পরিশ্রম করে তাহারা তিনবারও আহার করিয়া থাকে। ইহারা প্রায় সকল প্রাণীরই মাংস খাইয়া থাকে এবং সমস্ত জন্তুরই মাংস খাইতে খুব ভাল বাসে। মাংসই ইহাদের প্রিয় খাদ্য। মাংস অপেক্ষা ইহাদের প্রিয় খাদ্য নাই। বন্যবাঁদর, শূকর, গো, ইন্দুর,

ভেক প্রভৃতি সব জন্তুরই মাংস ইহারা খাইয়া থাকে। সবুজ রংয়ের ভেকগুলি ইহারা উপাদেয় বোধে খাইয়া থাকে, সাধারণ ভেক ইহারা খায় না।

খাসিয়াদের বিবাহ প্রথা অন্তরূপ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি খাসিয়া পুরুষদের বিবাহ হইলেও তাহারা শ্বশুরবাড়ীতে চলিয়া যায় এবং সেইখানেই বাস করে; পিতামাতার সহিত কোনও সম্বন্ধ থাকে না। খাসিয়ারা তাহাদের সামাজিক নিয়মানুসারে বিবাহ করিয়া কখনও স্ত্রীকে নিজেদের পিতামাতার কাছে লইয়া যাইতে পারে না।

জামাতা যাহা কিছু উপার্জ্জন করিবে সমস্তই স্ত্রীকে ও তাহার পিতামাতাকে দিতে হইবে। স্ত্রীর তুই একটী সন্তান হইলে পর স্বামী তাহার ইচ্ছানুসারে তাহার স্ত্রীকে যেখানে ইচ্ছা লইয়া যাইতে পারে। কিন্তু যতদিন জামাতা তাহার শ্বশুরবাড়ীতে থাকিবে ততদিন তাহার উপার্জ্জিত অর্থ স্ত্রীর মাতাকে দিতে হইবে। খাসিয়ানীরা স্বামীর সহিত বাস করিতেই ভালবাসে। খাসিয়া স্ত্রীলোকেরা কখনও অন্য জাতিকে বিবাহ করে না। মাতুলের মৃত্যু হইলে, মাতুলকন্যাকে বিবাহ করিয়া থাকে। মাতুল জীবিত থাকিলে মামাত ভগিনীকে বিবাহ করা ইহাদের সমাজের প্রথাবিরুদ্ধ। ইহারা পিস্তুতো ভগ্নীকেও বিবাহ

করিতে পারে, কিন্তু ঐ কন্যার পিতার মৃত্যু না হইলে বিবাহ করা সমাজের নিয়ম নাই।

খাসিয়ারা শালীকে বিবাহ করে না। কিন্তু ইহাদের সামাজিক নিয়ম এই যে, স্ত্রী মরিয়া গেলে তাহার ভগ্নীকে এক বৎসর পর বিবাহ করিতে পারে।

ইহাদের (Divorce ডাইভোর্স) তালাগ প্রথা নাই। স্বামী ও স্ত্রীতে যখন একান্তই অসদ্ভাব ঘটে এবং একসঙ্গে উভয়ের থাকিবার ইচ্ছা হয় না, তখন ইহারা পরস্পর পরস্পরকে ত্যাগ করে সত্য, কিন্তু এই ব্যাপার খুব কমই ঘটিতে দেখিতে পাওয়া যায়। কাহারও স্বামী যদি বিদেশে চলিয়া যায় অথবা নিরুদ্দেশ হয় এবং দশ বৎসরের মধ্যে যদি সে ফিরিয়া না আসে, তাহারও অনুসন্ধান খোজখবর না পাওয়া যায় তবে জ্ঞাতি ও অন্য সকলে মিলিত হইয়া সেই স্বামীকে তালাগ দেয় এবং অন্য পুরুষের সহিত সেই কন্যার পুনরায় বিবাহ দেয়। এই প্রকার বিবাহিতা স্ত্রীকে ইহারা খাসিয়া ভাষায় কাটিনগাটা (Stolen wife) বলে।

খাসিয়ারা যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী তাহা ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। বিপদে বা কোনও কঠিন ব্যারারামে পড়িলে, ইহারা একটা শক্তির উপাসনা করে। এই উপাসনা

পুরোহিতের দ্বারা করাইয়া থাকে। যাহারা, বৃদ্ধ ও জ্ঞানী তাহারাই ইহাদের পুরোহিত। যে স্থান হইতে রাস্তা তিনটী বিভিন্ন পথে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে, ঐ স্থানে গিয়া পান ও সুপারি রাখিয়া দেয়। এইরূপ অনুষ্ঠানকে ভগবান বা কোন একটী শক্তির উদ্দেশে পূজা বলিতে পারা যায়। ইহারা পান সুপারি অধিক পরিমাণে ব্যবহার করে। পান ও সুপারি ইহাদের অত্যন্ত প্রিয় বলিয়াই বোধ হয় ভগবানের উদ্দেশ্যেও ইহারা পান সুপারি দিয়া পূজা করিয়া থাকে। খাসিয়ারা বৎসরে দুই একবার এরূপ পূজা করিয়া মুরগী ও ছাগল বলী দিয়া থাকে।

যদি কখনও খাসিয়াদের মধ্যে কলেরার প্রাদুর্ভাব হয়, তখন তাহারা এই উপদ্রব নিবারণের জন্য ভগবানের উদ্দেশ্যে মুরগী, ছাগল প্রভৃতি বলী দেয় এবং পান সুপারি দ্বারা যথারীতি পূজা অর্চনা করিয়া থাকে।

খাসিয়াদের আর এক প্রকার পূজাপদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়। একটী ওকগাছ অথবা ওকগাছের ডাল নদীর মধ্যস্থলে বা কিনারায় প্রোথিত করিয়া একটা ছাগল এক কোপে কাটিয়া ফেলে; যদি এক কোপে মাথা কাটা না যায়, তবে বিশেষ অমঙ্গল হইল বলিয়া উহারা মনে করে। ইহা প্রায় আমাদের পূজায় বলী বাঁধিয়া যাওয়ার মত।

খাসিয়ারা কোনও কার্য্যের জন্য যাত্রা করিবার সময় বা কোনও নূতন ব্যবসা আরম্ভ করিবার সময় দেবতার পূজা করিয়া থাকে। এইরূপ পূজায় ইহারা কেবল একটা মুরগীর ডিম ভাঙ্গে; ছাগাদি জন্তু বলি দেয় না। একখানি কলাপাতায় ডিমটী ঊর্দ্ধমুখে রাখিয়া দেয় এবং অন্য একটী ডিম দ্বারা ঐ ডিমের উপর চাপ দেয়। তখনই যদি ডিমটী ভাঙ্গিয়া যায় তবে খুব শুভ বলিয়া আনন্দিত হয়; আর যদি না ভাঙ্গে তবে বিশেষ অমঙ্গলজনক মনে করিয়া দুঃখিত ও চিন্তিত হইয়া পড়ে।

খাসিয়াদের সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে ধারাল বাঁশের চেয়াড়ীর দ্বারা নাড়ী কাটে; ছেলের নাড়ী কাটিতে ইহারা কোনরূপ ছুরী বা অস্ত্র ব্যবহার করে না। নাড়ী কাটিবার পরেই লালমাটির পাত্রে গরম জল করিয়া ছেলেকে স্নান করায় এবং ঐ পাত্রটী ছেলের নামকরণ না হওয়া পর্য্যন্ত, বিশেষ যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিয়া দেয়। নাড়ীকাটা ও স্নান শেষ হইয়া গেলে, ইহারা শক্তির উপাসনা করে। ইহা নবজাত শিশুর মঙ্গলের জন্য। এই পূজা কেবল ডিম দ্বারা করিয়া থাকে।

শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পর দিন খুব প্রত্যূষে ইহারা শিশুর নামকরণ করিয়া থাকে। এই নামকরণের জন্য কতকগুলি

জনৈক খাসিয়া তাহার পুত্রের পীড়া আরোগ্যের জন্য দেবতার উদ্দেশ্যে ডিম ভাঙ্গিতেছে।

স্ত্রীলোককে নির্ব্বাচিত করা হয়। স্ত্রীলোকগুলি একত্রিত হইয়া ঘরের মেঝের উপর কতকগুলি চাউল ছড়াইয়া দেয়, তাহার পর সেইগুলিকে বাঁশের ঝাঁটার দ্বারা একত্রিত করিয়া জলের সহিত রাখিয়া দেয়। কতকগুলি হলুদ গুঁড়া করিয়া একটী কলাপাতে রাখিয়া তাহার সহিত পাঁচ টুকরা শুষ্ক মৎস্য রাখে। যদি পুত্র সন্তান হয়, তবে তাহার নিকট একটী ধনুক ও তিনটী তীর রাখিয়া দেয়; যদি কন্যা হয় তাহা হইলে একটা বেতের প্রস্তুত বোঝা বহিবার উপযোগী ঝুড়ী রাখিয়া দেওয়া হয়। যাহার বয়স বেশী অর্থাৎ যিনি নামকরণের পদ্ধতি জানেন, খাসিয়াভাষায় তাহাকে (Kabajerkhun) কাবাজীরখান বলে। একখানা কলাপাতা মেঝের উপর পাতিয়া তাহাতে জলের ছিটা দেয় এবং পূর্ব্বে যে পাত্রে জল ও চাউল ছিল উহা হস্তে লইয়া ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া তাহার পর সমাজের লোকদিগের নিকট নামকরণের জন্য অনুমতি গ্রহণ করা হয়। ইহার পর ছেলের নামকরণ হইয়া থাকে। নামকরণ হইলে ঈশ্বরের নিকট ছেলের নাম উচ্চারণ করিয়া চাউলগুলি তিনবার ডিম্বের উপর রাখে; তার পর গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সদর দরজা দিয়া ঐ পাত্রটী গ্রামের বাহিরে লইয়া যায়। এইরূপ নানাবিধ ক্রিয়া দ্বারা ইহারা শিশুর নামকরণ অনুষ্ঠান শেষ করিয়া থাকে।

মকরণ হইয়া গেলে, তীরধনুক ইত্যাদি ঘরের মধ্যে যত্ন-
র্ব্বক রাখিয়া দেয়। ইহার পর পুরুষদিগকে মদ দেওয়া
ইয়া থাকে। খাসিয়ারা দুই তিন মাসের ছেলে হইলেই
াহার কর্ণ ছিদ্র করিয়া তাহাকে ইয়ারিং পরাইয়া দিয়া
াকে।

খাসিয়াদের তিন প্রকার নিয়মে বিবাহ হইয়া থাকে।
ম্ভ্রান্ত ভদ্র এবং গরীবের বিবাহ এই তিন শ্রেণীতে ইহা
বভক্ত। সাধারণতঃ পুরুষদিগের ১৭।১৮ বৎসর বয়সের
র হইতে ২৫ বৎসরের মধ্যে এবং স্ত্রীলোকের ১৩ বৎসর
ইতে ১৮ বৎসরের মধ্যে বিবাহকার্য্য হইয়া থাকে।
য়স্থা পাত্রীই সকলে পছন্দ করিয়া থাকে। প্রথমতঃ
ুত্রের পিতা কন্যার পিতার বাড়ীতে একজন লোক
পাঠাইয়া সমস্ত বিষয় অনুসন্ধান লয়। খাসিয়াদের
বিবাহে কন্যারও অভিপ্রায় জানিতে হয় এবং তাহার মত
লইয়া তবে বিবাহ দিতে হয়। বিবাহের পূর্ব্বে ইহারা ডিম
ভাঙ্গিয়া শুভাশুভ স্থির করে; যদি অশুভ হয় তবে বিবাহ
হয় না। ইহারা মনে করে, অশুভ-বিবাহ হইলে কন্যা চির
দারিদ্র্যতা ভোগ করে, অথবা উভয়ের মধ্যে একজন মরিয়া
যায়। বিবাহের পূর্ব্বে অঙ্গুরী প্রস্তুত করিয়া থাকে।
অবস্থানুসারে এই অঙ্গুরী মূল্যবান হয়। গরীব খাসিয়ারা

রৌপ্যের অঙ্গুরী প্রস্তুত করিয়া থাকে। বিবাহের সময় এই অঙ্গুরী কন্যার অঙ্গুলীতে পরাইয়া দেয় এবং কন্যা বরের হাতে অঙ্গুরী পরাইয়া দিয়া থাকে।

বিবাহের দিন বর কতকগুলি বরযাত্রীর সহিত ভাল পোষাক ও হল্‌দেরংয়ের পাগড়ী পরিধান করিয়া কন্যার বাড়ীতে যাত্রা করে। মেয়ের বাড়ীতে ভোজের আয়োজন হয়। কন্যার আত্মীয়গণ এক্ষেত্রে উত্তম পোষাক ও গহনা পরিধান করিয়া বিবাহবাড়ীতে সৌভাগ্যের পরিচয় দিবার অবসরটুকু মোটেই নষ্ট করে না। রমণীসুলভ অলঙ্কার প্রিয়তা যথেষ্ট পরিমাণে আমাদের স্ত্রীলোকের ন্যায় ইহাদের মধ্যেও সম্পূর্ণভাবে বর্ত্তমান আছে দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশের 'বাসর' জাগার ন্যায় ইহারাও বিবাহের রাত্রি জাগিয়া আনন্দে অতিবাহিত করে। এই দিন উহারা কেহ মাথায় কাপড় দেয় না। মাথা অনাবৃত করিয়া থাকে। বিবাহবাড়ীতে ইচ্ছানুযায়ী সকলেই মদ খাইয়া থাকে এবং অহরহঃ পান সুপারি প্রদান করা হয়। অঙ্গুরী বিনিময় হইবার পর পুরোহিত নিম্নলিখিত মন্ত্র পড়িতে থাকে।

"হে ঈশ্বর তুমি উপর হইতে; হে ঈশ্বর তুমি নীচে হইতে; হে ঈশ্বর আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছ; এই বিবাহে অনুমতি দাও। অঙ্গুরী বিনিময় হইয়াছে, এইবার বিবাহ

হইবে ; তোমার আশীর্ব্বাদ দাও। ইহাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর, ইহারা সুখে দিনযাপন করুক।" এই বলিয়া পুরোহিত ঈশ্বরকে প্রণাম করিয়া মাটীতে মদ ঢালিয়া দেয় এবং এক দুই তিন গণনা করে। ইহার পর যাহারা গরীব তাহারা মুরগী এবং যাহারা বড় লোক তাহারা শূকর বলিদান দেয়। অবশেষে বর, কন্যার মাতার গৃহে বাস করিয়া থাকে।

খাসিয়াদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু সময় উপস্থিত হইলে তাহার আত্মীয় বন্ধুবান্ধবেরা সকলেই একত্রিত হয়। মৃত্যু হইলে পর ইহারা মৃতদেহ গরম জলে ধোয়াইয়া স্নান করায়। স্নান করাইয়া মাদুরের উপর শয়ন করায়। তাহার পর যাহার যেমন অবস্থা, সে সেই রকম পরিস্কার পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া ও মাথায় একটী পাগড়ি বাঁধিয়া দেয়। অবশেষে একটী ডিম মৃতব্যক্তির পেটের উপর রাখে। বহলোক বিশেষতঃ অবস্থাপন্ন লোকে মৃত ব্যক্তির কানে ইয়ারিং বা অন্যান্য গহনা পরাইয়া দেয়। মৃতব্যক্তির যাইবার রাস্তা পরিষ্কার করিবার জন্য একটী মুরগী বলি দিয়া থাকে। খাসিয়াদের বিশ্বাস ঐ মুরগী তাহাদের ভবিষ্যংজীবনের পথ পরিস্কার করিয়া দিবে। স্ত্রীলোক মরিলে তাহার ভবিষ্যতের পথ পরিষ্কার করিবার জন্য ষাঁড় কিম্বা গরু বলি দিয়া থাকে। এ ব্যবস্থাটী মন্দ নয়।

খাসিয়ারা যদি এই মৃতদেহ পোড়াইতে ইচ্ছা করে তবে ষাঁড় বলি দিতে হয় এবং যদি কবর দিতে ইচ্ছা করে তবে শূকর বলি দিয়া থাকে। এই সময় ইহারা খুব আমোদ প্রমোদ করে এবং বাদ্য বাজাইয়া থাকে। মৃতব্যক্তি পুরুষ হইলে তাহার সহিত তীরধনুক প্রদান করা হয়। যদি মৃত-ব্যক্তিকে দাহ করে তাহার মুখাগ্নি পুত্রেই করিয়া থাকে। পুত্র না থাকিলে, আত্মীয়বন্ধুবান্ধবেরা মুখাগ্নি করে। দাহকার্য্য শেষ হইলে সেই স্থানটী আত্মীয়বন্ধুবান্ধবেরা খুব ভাল করিয়া পরিষ্কার করিয়া ঐ স্থানে পান সুপারি ছড়াইয়া দেয়। সুপারি ছড়াইতে ছড়াইতে, মৃতব্যক্তির আত্মীয়েরা বলিতে থাকে, "নমস্কার; ঈশ্বরের গৃহে যাইয়া প্রচুর সুপারি খাইবে।" এই সমস্ত কার্য্য শেষ হইয়া গেলে, ঐ স্থানটীতে জল ঢালিয়া দেয় এবং হাড়গুলি একত্রিত করিয়া পরিষ্কার একখানি সাদা কাপড়ে বন্ধন করে। এইরূপে খাসিয়াদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পূর্ণ হইয়া থাকে।

স্বামীর মৃত্যু হইলে বিধবা একবৎসর পরে পুনরায় বিবাহ করিতে পারে। একবৎসরের পূর্ব্বে বিবাহ করিতে পারিবে না। স্ত্রীর মৃত্যু হইলে পুরুষও একবৎসরের মধ্যে বিবাহ করিতে পারে না। স্বামীর মৃত্যু হইলে, বিধবাকে যে পুনরায় বিবাহ করিতেই হইবে, এরূপ কোন প্রথা তাহাদের

সমাজে নাই। ইহা স্ত্রীলোকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া থাকে। স্বামীর মৃত্যুর পর অনেকেই স্বামীর স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া নারীজীবন অতিবাহিত করে। কেহ কেহ স্বামীর স্মৃতি বিস্মৃত হইয়া পুনরায় বিবাহ করিয়া থাকে।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

কয়েক সপ্তাহ শিলংএ বড়ই আনন্দে কাটিয়া গেল। কয়েকটী শিক্ষিত ভদ্রলোকের সহিত অল্প পরিচয় হইয়া শেষে ভালবাসা ও বন্ধুত্বে পরিণত হইল দেশভ্রমণের দ্বারা মানুষ যে কত শিক্ষা, কত অভিজ্ঞতা ও অমূল্য দ্রব্য লাভ করিয়া থাকে, তাহা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে অবস্থান করিলে কোন দিন প্রত্যাশা করা যায় না। এই ভ্রমণব্যপদেশে যাঁহাদের সহিত পরিচয় ঘটিয়াছে, তাঁহাদিগের স্মৃতি এ জীবনে আর ভুলিতে পারিব না। দেখিতে দেখিতে, আমাদের শিলং ত্যাগের দিন উপস্থিত হইল। যেদিন আমরা শিলং ত্যাগ করিলাম, সেদিন দুঃখ ও ক্ষোভের সীমা ছিল না। শিলংএর স্মৃতি ও নব পরিচিত বন্ধুদের—প্রীতি-বন্ধন, আত্মীয়তায় যথার্থই মনটাকে সজোরে বাঁধিয়া রাখিতেছিল। আরও কয়েক দিবস শিলংএ থাকিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু প্রবল বৃষ্টি সে ইচ্ছায় আমাদের বাধা প্রদান করিল। সঙ্গী স্ত্রীলোকেরা বাড়ী ফিরিবার নিমিত্ত বিরক্ত করিয়া তুলিল। তাহারা সর্ব্বদা বলিতে

লাগিল, "অবিরাম বৃষ্টি, রৌদ্রের মুখ দেখা যায় না; শিলংএ সূর্য্যদেব উঠেন কি না, তা একদিনের জন্য বুঝিতে পারিলাম না। ছেলেদের বিছানা বালিস অহোরাত্র ভিজিয়া যাইতেছে, আগুনে সেঁকিয়া কত শুখাইব। শিলং পাহাড় দেখা হইয়া গেল, আর তো নূতন কিছু নাই, এখানে থাকিয়া আর কি হইবে? বরঞ্চ চন্দ্রনাথপাহাড় দেখিতে যাওয়া যাইবে। আর এখানে থাকিয়া কাজ নাই।"

বৃষ্টির জন্য আমারও মনটা ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিল। বাঙ্গালী আমরা শীত ও তাপ দুই না পাইলে, আমাদের প্রাণটা কেমন যেন একঘেয়ে ও অবসন্ন হইয়া পড়ে। দিনান্তে একবার রৌদ্রের মুখ না দেখিলে, শরীর না তাতাইলে, যেন জড়তা দুর হয় না। বাঙ্গালীর তাত সহে, কিন্তু বাত সহে না। এই প্রবাদ বাক্য বংশানুক্রমে আমাদের বাঙ্গালীর ঘরে চলিয়া আসিতেছে। বিশেষতঃ চন্দ্রনাথপাহাড়ে কখনও যাই নাই, দেখি নাই; শিলং-পাহাড়ে আসিয়া যদি চন্দ্রনাথপাহাড়ও অদৃষ্টে দেখা ঘটে, সেটাও কম সৌভাগ্যের কথা নহে। নানাকারণে আমিও স্ত্রীলোকদের মতে মত দিলাম।

বাঙ্গালী যে কয় দিনের জন্য যেখানে থাকুক একবার "ঘর মুখো" হইলে, গৃহাগমনের আনন্দ, সত্যই বাঙ্গালীকে

অধীর করিয়া তুলে। সমস্ত রাত্রি আর কাহারও নিদ্রা হইল না। মোট বাঁধা, খাবার প্রস্তুত, সুপারী কুচান ও পানসাজা, বিছানা বাঁধা প্রভৃতিতেই রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল। নিদ্রাদেবীর আরাধনা সেদিন প্রায় সকলেই বিস্মৃত হইয়া গেল। সাতটার সময় আমাদিগকে মটর আরোহণে গৌহাটী আসিতে হইবে। ছয়টার সময়ে আমরা খাসিয়া কুলীদের পৃষ্ঠে বিছানা মোট ইত্যাদি চাপাইয়া দিয়া মটরষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। কয়েক জন শিলংএর বন্ধু ছলছল নেত্রে আমাদিগকে মটরষ্টেশনে বিদায় দিতে আসিয়াছিলেন। আমাদের লগেজপত্রকরা, জিনিসপত্র মটরে চাপাইয়া দেওয়া প্রভৃতি সমস্তই তাহারা আত্মীয়ের মত করিয়া দিলেন। আমাদিগকে সেদিন কিছুই করিতে হয় নাই। শিলংবাসী বন্ধুদের এই উপকার জীবনে বিস্মৃত হইবার নহে।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বলিয়াছি, "শিলংএ কেন আসিলাম পরে বলিব।" শিলং ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে সংক্ষেপে শিলং আসিবার কারণ পাঠকগণকে শুনাইব। আমার গুরুরূপী ভগবান, হিমালয় প্রবাসী, শাস্ত্রবেদ পারদর্শী ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রহ্মচারী শ্রীশ্রীনারদবাবা মহারাজ তখন দেওঘরের সন্নিকট "করণীবাগ" আশ্রমে ছিলেন।

করণীবাগ দেওঘর হইতে ছুই মাইল দূরে। এই করণী-বাগে গোবিন্দবাবু নামক, বাবার একজন ভক্ত-শিষ্য প্রায় ৪০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া একটী আশ্রম-গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। কৃপা করিয়া যদি গুরুদেব শীতকালে পাহাড় হইতে নামিয়া আসিয়া ছুই এক মাস এখানে অবস্থান করেন। ভক্তের বাঞ্ছাপূর্ণের জন্য আজ তিন বৎসর হইল, শীতকালে বাবা 'আলমোরা পাহাড়' হইতে নামিয়া ছুই এক মাস এখানে অবস্থান করেন। এই সময় কলিকাতা প্রভৃতি নানাস্থান হইতে বাবাকে দর্শন ও তাঁহার মুখনিঃসৃত ধর্ম্মোপদেশ শুনিবার জন্য বহু ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি, দেওঘর করণীবাগে ছুটিয়া থাকেন। এবং তাঁহার কাছে এত লোক সমাগম হইয়া থাকে, যে এক-এক দিন বসিবার স্থান পাওয়া যায় না।

আমি তখন আমার কুণ্ডার বাটীতে অবস্থান করিতে ছিলাম। কুণ্ডা বৈদ্যনাথধাম হইতে প্রায় ২॥ মাইল দূরে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন দেওঘরে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য গিয়াছিলাম্, তখন এই স্থানটীর প্রাকৃতিক শোভা দর্শনে ও ইহার স্বাস্থ্যকর জলবায়ুর গুণে মোহিত হইয়া এইস্থানে অবসর লইয়া থাকিবার জন্য একটী বাসভবন নির্ম্মাণ করাই। মথুরা; গয়া; কাশী, বৃন্দাবন, হরিদ্বার, দেরাছুন,

অযোধ্যা, মধুপুর, মুঙ্গের, ঢাকা, গিধোর দার্জ্জিলিং, কটক, পুরী, ওয়াণ্টিয়ার, আজমীর প্রভৃতি অনেক স্থানেই ভ্রমণ করিয়াছি ও কয়েক দিবস করিয়া বাস করিয়াছি। কিন্তু এই কুণ্ডার ন্যায় জলের শক্তি কোথাও দেখি নাই। প্লীহাযকৃতের দোষ, পুরাতনজ্বর, ম্যালেরিয়াজ্বর, ডিস্‌পেপ্‌সিয়া প্রভৃতি রোগে এখানকার জলবায়ু অমৃত তুল্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখানকার কূপের জলে লৌহ, স্বর্ণ, অভ্র, চূণ প্রভৃতি খনিজ পদার্থগুলি ভগবান এরূপভাবে মিশ্রিত করিয়া রাখিয়াছেন যে, এখানকার জল এই সমস্ত রোগের অত্যন্ত বীর্য্যবান ঔষধ অপেক্ষা তেজস্কর ও উপকারী। আমি বিগত সাত বৎসর কাল, ভীষণ ডিস্‌পেপ্‌সিয়া রোগে ও মাথার পীড়ায় ভুগিতেছি। বৎসরের মধ্যে কয়েক মাস আমার কুণ্ডারভবনে বাস করিয়া বহু পরিমাণে উপকার পাইয়াছি। কেবল এ কথা বলিলে, সব কথা বলা হয় না, আমি মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কুণ্ডার পূর্ব্বদিকে ত্রিকুট-পাহাড়, পশ্চিমে পাথরড়া, চোলপাহাড়, ডিগরিয়া প্রভৃতি পাহাড়। অদূরে তপোবন প্রভৃতির অপূর্ব্বশোভা ; অন্যদিকে আরও ছোট ছোট পাহাড়ে কুণ্ডাকে ঘেরিয়া ইহাকে তপভূমিতে পরিণত করিয়া তুলিয়াছে। হাইকোর্টের কয়েকটী ব্যারিষ্টার,

'হাওড়াকোর্টের' কয়েকজন প্রসিদ্ধ উকীল প্রভৃতি দশ বার জন ভদ্রলোক এই স্থানে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য বড় বড় অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়াছেন।

গুরুদেব শীতকালে কিয়দ্দিবস তাঁহার আশ্রমে অবস্থান করেন বলিয়া এই সময় আমি তাঁহার চরণদর্শনাকাঙ্ক্ষায় কুণ্ডারভবনে কয়েকমাস বাস করিয়া থাকি। অপরাহ্ন হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাঁহার পবিত্র মুখনিঃসৃত ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া কতলোক ধন্য কৃতার্থ ও মনকে পবিত্র করিয়া সন্ধ্যার সময় গৃহে ফিরিয়া যান। একদিন সকলেই চলিয়া গিয়াছেন, আমি নিস্তব্ধ ভাবে চুপ করিয়া অন্ধকারের মধ্যে দোতলার বারান্দায় বসিয়া আছি; সন্ধ্যার পর তিনি হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া কবাট বন্ধ করিলেন। সন্ধ্যার পর আর কাহারও তাঁহার কাছে যাই-বার আদেশ নাই। সন্ধ্যারপর হইতেই তিনি সমাধিস্থ হইয়া পরমানন্দে নিমগ্ন থাকেন। তিনি হস্তপদাদি ধৌত করিয়া আসিয়া যখন আসনে উপবিষ্ট হন, তখন যদি কেহ তথায় উপস্থিত থাকে তবে দুই একটী মধুরবাক্য প্রয়োগ করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় করিয়া দেন। বলেন "বাবা! এখন আমি পূজায় বসিব।" অপরে পূজা অর্থে ঠাকুরের পূজা মনে করিয়া থাকেন, বুঝিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার

পূজা, সে পূজা নহে। তাঁহার পূজা—সমাধি অবস্থায় পরমাত্মার দরশন।

সেদিন বারান্দার একপার্শ্বে অন্ধকারে আমি চুপ করিয়া বসিয়া আছি—মনের মধ্যে একটা বদবুদ্ধিও উঠিয়াছে; দেখি বাবা আসিয়া কি করেন।

এই দিন বাবার একটী শিষ্য গুরুদেবের চরণদর্শনের জন্য কলিকাতা হইতে বাবার আশ্রমে আসিয়াছিলেন। তাঁহারই একটী পরিচিত ভদ্রলোক হঠাৎ বাবার শিষ্যকে হাওড়া ষ্টেশনে দেখিয়া বলিল, তুমি দেওঘরে গুরুর কাছে যাইতেছ; চল বাবা, আমিও একটু ঘুরিয়া আসি। কাল রবিবার; চিঠি লিখিয়া সোমবারটা অফিসে ছুটী লইব। উভয়ে তাহারা হাওড়ায় গাড়ীতে চাপিল! পরদিন যখন তাহারা বাবার আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন বাবার শিষ্য, সমভিব্যাহারী ভদ্রলোকটীকে উপরে আনিতে সাহস পাইল না; কারণ নেশায় তখনও তাহার চক্ষু লাল ও ঢুলু ঢুলু, মুখ দিয়া মদের দুর্গন্ধ তখনও বাহির হইতেছে। ভদ্র লোকটীকে নীচে বসাইয়া শিষ্য উপরে আসিয়া গুরুদেবের চরণ বন্দনা করিল। বাবা তখন স্নানাদি শেষ করিয়া নিজের আসনে বসিয়াছেন। শিষ্যের সহিত কিয়ৎক্ষণ ধর্ম্মপ্রসঙ্গের পর বাবা বলিলেন, "তোমার সমভিব্যাহারী ভদ্রলোকটীকে

স্নান করিয়া আমার কাছে আসিতে বল।" শিষ্য বাবার কথা শুনিয়া অবাক ও নিস্পন্দভাবে গুরুদেবের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। শিষ্যটী বোধ হয় তখন ভাবিতেছিল, আমার সঙ্গে যে মাতাল আসিয়াছে, ইতিমধ্যে বাবাকে কে আসিয়া সে সংবাদ দিল? বাবার আশ্রমে মদ্যপায়ী আসায় বোধ হয় বাবা রুষ্ট হইয়াছেন। বাবা, আমার ও শিষ্যটীর মুখের দিকে চাহিয়া তাহার মনোভাব বুঝিয়া বলিলেন "না, না, তোমার কোনও ভয় নাই। তুমি উহাকে স্নান করিয়া শীঘ্র উপরে আসিতে বল। আমার প্রয়োজন আছে।"

অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই মাতাল ভদ্রলোকটী স্নান করিয়া আসিয়া সাষ্টাঙ্গে বাবাকে প্রণিপাত করিল। বাবা ভদ্রলোকটীকে মধুর বচনে কয়েকটী প্রশ্ন করিলেন। ভদ্রলোকটী যথাযথ তাহার উত্তর দিল। একটী কথাও গোপন করিল না। তাহার পরেই বাবা তাহাকে দীক্ষিত করিলেন। ভদ্রলোকটী দীক্ষিত হইবার জন্য বা নারদবাবাকে দর্শন করিবার জন্য আসে নাই; সে যে, কেন আসিয়াছিল তাহাও সে নিজেই জানিত না। সে খেয়ালের বশে আসিয়াছিল, কি বেড়াইতে আসিয়াছিল, কি কোনও অলক্ষিত শক্তি তাহাকে টানিয়া আনিয়াছিল, তাহাও সে

বলিতে পারে না। সে কেবল বলিল, "বাবা, কাল আমার মনটা হ'লো যে, আমি দেওঘরে যাই, কেন হ'লো, তা জানি না, বলিতে পারি না।"

এই ঘটনায় আমার মনে অনেক প্রশ্ন উদিত হইয়াছিল। বাবা ঐ মাতালটাকে ডাকিয়া আনিয়া অযাচিত ভাবে কেন দীক্ষিত করিলেন। আর আমরা কতদিন তাঁহার কত সাধ্য-সাধনা; অনুনয়বিনয় করিয়া কাঁদিয়াছি, তিনি দীক্ষিত করিতে স্বীকার পান নাই। তিনি কখনও বলিয়াছেন, —"বালানন্দ ব্রহ্মচারীর নিকটে দীক্ষিত হও, আমি তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া তোমায় দীক্ষা দিবার জন্য বলিয়া দিব। বালানন্দ ব্রহ্মচারী সিদ্ধপুরুষ, তিনি আমার চেয়ে অনেক জ্ঞানী, অনেক বড়; আমি উহার কাছে কিছুই নই।" এইরূপ কত কথাই বাবা আমাদিগকে বলিয়াছেন, দীক্ষিত করিতে চাহেন নাই, আমরা বাবার পা ছাড়ি নাই। যখন একান্তই ছাড়িলাম না, তখন বাবা একটা দিন স্থির করিয়া দিয়াছিলেন এবং সেই দিন প্রত্যূষে স্নান করিয়া বাবার কাছে যাইবার জন্য বলিয়াছিলেন। কবে সেই দিন আসিবে, দিন গণনা করিতে করিতে, আহারনিদ্রা ত্যাগ করিয়াছিলাম। একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাবার চরণতলে বসিয়া তত্ত্বকথা শুনিতেছি, শুনিতে শুনিতে, নয়ন

হইতে আনন্দাশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে। সেই দিন, হঠাৎ বাবা বলিলেন, "আসন করিয়া বসিয়া যাও," সেই দিন বাবা দীক্ষিত করিলেন। নির্দিষ্টদিনের আর অপেক্ষা করিতে হইল না। প্রত্যূষে স্নান করিয়া আর বাবার কাছে আসিতে হইল না।

সেই দিনের, সেই রাগ ও অভিমান প্রকাশ করিবার জন্যই আজ সন্ধ্যার অন্ধকারে বসিয়াছিলাম। বাবাকে কি বলিব, তাহাও মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম। বলিব, "বাবা এ কি আপনার বিচার! আমরা কত সাধ্য-সাধনা করিয়াছি, তাহাতে আপনার দয়া হয় নাই; আর বিনা প্রার্থনায় ঐ মাতালের উপর আপনার এত দয়া কেন হইল? তবে কি আমরা ঐ মাতাল অপেক্ষাও পাপী, উহাকে নিজে ডাকিয়া আনিয়া উহার মুক্তির বাণী কর্ণে শুনাইয়া দিলেন। আর আমরা এত কি পাপী, এত কি দোষ আপনার চরণে করিয়াছিলাম?

বাবাকে কথাগুলি শুনাইতে হইল না, কিছু জিজ্ঞাসা করিতে হইল না। বাবা হঠাৎ বলিলেন, "পরমাত্মাদর্শনের নেশায় ভোর হইবে, তাই আমি উহাকে জোর করিয়া নীচে হইতে টানিয়া আনিয়া সেদিন ইষ্টমন্ত্র প্রদান করিয়াছি।

কলিকাতা হইতে লোকটী কেন মদের আনন্দ ছাড়িয়া এখানে ছুটিয়া আসিয়াছে? কে উহাকে পাঠাইয়াছে? মাতাল বলিয়া ঘৃণা করিও না, মানুষকে ঘৃণা করিতে নাই; উহার মন বড়ই নির্ম্মল, বড়ই স্বচ্ছ, বড়ই পবিত্র। লোকটী একটু মদ খায়, এই না উহার অপরাধ? লোকটী চোর নয়; জুয়াচোর নয়, মিথ্যাবাদী নয়, প্রবঞ্চক নয়, কাহারও সহিত কখনও শঠতা করে নাই। মানুষের যত দোষ আছে ও থাকে, উহার তত দোষ নাই। কেবল একটু নেশা করে, তাহাও দিনকতক পরে থাকিবে না। একদিন দেখিবে রামবাবু, তোমাদের চেয়ে এ লোকটী কত সাধু হইয়াছে। মদ খায় বলিয়া উহাকে ঘৃণা করিতেছ, কিন্তু তোমাদের হৃদয়ে উহাপেক্ষা শত শত দোষ বিদ্যমান রহিয়াছে তা জান?"

অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া গেল, বুঝিলাম আমি কত পাপী, কত দোষী। বুঝিলাম, আগন্তুক ভদ্রলোকটী অপেক্ষা আমি কত নিম্নস্তরে পড়িয়া রহিয়াছি। হায়! কেন মানুষকে দেখিয়া ঘৃণা করি। আমরা নিত্য যাহাদিগকে দেখিয়া ঘৃণা করিয়া থাকি, সেই পথের ভিক্ষুক মলিন ছিন্ন কৌপীনধারী, রুগ্ন গলিত কুষ্ঠরোগী অপেক্ষা আমরা কত ছোট, কত পাপী, কত তাপী। বলিলাম "বাবা, আমায় ক্ষমা করুন; আপনি অন্তর্য্যামী, আপনি সকলের হৃদয় দেখিতে পাইতেছেন।

আপনার ব্যবহারে, আপনার এই কার্য্যে, আমার মনে আপনার উপর নানা সন্দেহের উদয় হইয়াছিল, সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি প্রভু?"

বাবা হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন, "এ কথা ছেড়ে দাও; অন্ত কথা শোনো।" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া, বলিলেন, "আমার শিলং-পাহাড় একবার দেখিবার ইচ্ছা আছে, তোমার শিলং-পাহাড় যাওয়ার ইচ্ছা হয়?" আমি বলিলাম "হাঁ বাবা, আমার শিলং-পাহাড় যাইবার ও দেখিবার খুব ইচ্ছা আছে।" গুরুদেব বলিলেন, "তাহা হইলে তুমি আমাকে পরে পত্র লিখ। আমি যখন যাইব, সেই সময় তোমাকে সঙ্গে লইয়া যাইব। বাবা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি শিলং-পাহাড় যাবে ত?" আমি বলিলাম, "হাঁ বাবা যাবো।" ইহার কয়েক দিন পরেই আমার মাথার পীড়ার জন্ত অনিচ্ছাস্বত্বে আমাকে কলিকাতা চলিয়া আসিতে হইয়াছিল।

সে দিন, বাবার কথা শুনিয়া বাবার পা তুখানি ধরিয়া লুটাইয়া পড়িতে যাইতেছিলাম, কিন্তু বাবা তখন শুদ্ধ হইয়া সমাধিতে বসিবেন; আমার পদস্পর্শ করিবার সাহস হইল না। হায়! অন্তর্য্যামী মহাপুরুষ; তুমি কি করিয়া জানিলে যে, আমি মাতালের কথা জিজ্ঞাসা করিব বলিয়াই

অন্ধকারে বসিয়া ছিলাম। আমাকে অন্ধকারের মধ্যে কেমন করিয়া দেখিলেন? গুরুদেব, দেখিলে যদি, তবে চিনিলে কেমন করিয়া? বাবা উপরে যেখানে থাকেন সে স্থান একেবারে অন্ধকার। আলো লইয়া যাইবার আদেশ নাই। আচ্ছা, দেখিলে বা যদি চিনিলে, আমার মনের কথা কি করিয়া বুঝিলে গুরুদেব? শুদ্ধসিদ্ধ পুরুষ তুমি! তোমার শক্তি আমরা পাপী তাপী সংসারী কিরূপে বুঝিব?

বাবা আলমোরা পাহাড়ে চলিয়া গেলেন। আমার অহঃরহঃ মনে হইতে লাগিল, বাবার নিকট আমি প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম শিলং-পাহাড় যাইব। বাবা কি উদ্দেশ্যে আমায় বলাইয়া লইয়া ছিলেন, তিনিই জানেন। আমার বিশ্বাস, ইহার মধ্যে তাঁহার কোনও উদ্দেশ্য আছে। নচেৎ তিনি এত ক্ষুদ্র অভাজনকে একাধিকবার বলাইয়া লইলেন কেন যে, "হাঁ আমি শিলং যাইব"। বাবার কাছে বলিয়াছিলাম বলিয়া আমি শিলং-পাহাড় গিয়াছিলাম। নচেৎ আজ বিশ বৎসর কাল "যাইব" "যাইব" বলিয়া শিলং-পাহাড় যাইতে পারি নাই কেন এতদিন পরে হঠাৎ আমার মনের প্রবৃত্তি এত বাড়িয়া গেল কেন? আমার শিলং গমনে যে গুরুদেবের অলক্ষিত শক্তি কার্য্য করিয়াছে, ইহা আমি বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

শিলং ত্যাগের পূর্ব্বেই শিলং সম্বন্ধে আরও দুই একটী কথা বলিয়া শিলং-পাহাড়ের কথা শেষ করিব। আমি কিছু দিন পূর্ব্বে একাকী দার্জ্জিলিং ভ্রমণে গিয়াছিলাম। একজন ভৃত্যও আমার সঙ্গে ছিল না, কিন্তু দার্জ্জিলিংবাসে আমার কোনও কষ্ট হয় নাই।

দার্জ্জিলিংএ জুবিলী স্যানিটারিয়ামে থাকিবার বন্দোবস্ত দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক অনায়াসে একা গিয়া জুবিলী স্যানিটারিয়ামে থাকিতে পারেন। জুবিলী স্যানিটারিয়ামে থাকিবার তিনটী শ্রেণী আছে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়শ্রেণী। আমি দ্বিতীয়শ্রেণীতে থাকিতাম। সপ্তাহে আমার ২৪৲।২৫৲ টাকা ব্যয় পড়িত। ইহাতে আহার, জলখাবার, থাকিবার ঘর, চাকর সমস্তই পাওয়া যায়; কেবল বিছানা সঙ্গে লইয়া যাইতে হয়। আমাদের বাঙ্গালীর পক্ষে দ্বিতীয়শ্রেণীই উত্তম। হিন্দুরাই দ্বিতীয় শ্রেণীতে থাকেঁ। প্রথমশ্রেণীতে থাকিতে হইলে,

একেবারে সাহেবীভাবে থাকিতে হয়। টেবিল চেয়ারে খাইতে হয়। হিন্দুর পক্ষে প্রথম শ্রেণীর ব্যবস্থাদি দেখিলে, মনে ভীতির সঞ্চার হয়।

শিলংএর সহিত দার্জ্জিলিংএর তুলনার জন্যই উহার কথা এখানে তুলিতে হইল। কৌতূহলপরবশ হইয়া শিলংএ স্যানিটারিয়াম একদিন দেখিতে গিয়াছিলাম। দেখিলাম, দার্জ্জিলিংএর স্যানিটারিয়ামের সহিত ইহার তুলনায় সমালোচনা করা চলে না। এখানকার স্যানিটারিয়ামের বন্দোবস্ত আদৌ ভাল নয়। আমি যেদিন দেখিতে গিয়াছিলাম, অনেকগুলি ভদ্রলোক তখন বাস করিতেছিলেন। বন্দোবস্তের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা অনেক বিরক্তিকর কথাই বলিলেন। ইংরাজদের শিলংএ থাকিবার হোটেল ইত্যাদির বন্দোবস্ত খুব ভাল। কিন্তু, বাঙ্গালীর অদৃষ্টে শিলং একা যাইয়া থাকিবার কোনই সুবিধা দেখিলাম না। একটী ভদ্রলোকের সহিত স্যানিটারিয়ামে আলাপ হইল, ইনি কাশ্মীরে কম্বলবুননের কারখানা খুলিয়াছেন। ইহার কারখানায় অনেকগুলি লুম (তাঁত) চলিতেছে। যুবকটী খুব উৎসাহী ও বুদ্ধিমান। তিনি দার্জ্জিলিং ইত্যাদি অনেকস্থান হইতে ঘুরিয়া কয়েক দিন হইল, শিলং স্যানিটারিয়ামে আসিয়াছেন। ইঁহার

নিকট অনেক স্যানিটারিয়ামের নিন্দা শুনিলাম। রমানাথবাবু আমাকে স্যানিটারিয়াম দেখাইতে লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি স্যানিটারিয়ামের নিন্দাবাদ শুনিয়া ইহার ম্যানেজারকে খুব ধমকাইয়া দিলেন; কিন্তু "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী।"

শিলংএ কুকুর দংশনের Hospital দেখিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম; আসাম গভর্ণমেণ্টের ইহা একটী গৌরব-কীর্ত্তি। এই হাঁসপাতালটী হওয়ায় কত লোকের যে উপকার হইয়াছে, তাহা লেখনী সাহায্যে বর্ণনা করিতে অক্ষম। পশ্চিমে ভারতের একমাত্র কেবল কশৌলীতে Hospital আছে। কশৌলী বহুদূরে অবস্থিত। সকলের পক্ষে সেখানে যাওয়া একপ্রকার অসম্ভব; ভাড়াও অত্যধিক; অনেকে ইচ্ছাসত্বেও যাইতে পারে না। শিলংএ এই Hospitalটী হওয়ায় ভারতের বহুস্থানের অধিবাসীদিগের অনেক উপকার হইয়াছে। এই Hospitalটীর জন্য শিলং অতি পবিত্র স্থান হইয়া উঠিয়াছে।

শিলংএ বারমাসই শীত, জলবায়ু অতি উৎকৃষ্ট; সুতরাং গভর্ণমেণ্ট এখানে এই হাঁসপাতাল খুলিয়া সাধারণের ধন্য-বাদের পাত্র হইয়াছেন সন্দেহ নাই। আমরা যেদিন এই হাঁসপাতাল দেখিতে গিয়াছিলাম, সেদিন হাঁসপাতাল দেখিতে

দেখিতে, সেইখানেই আমাদের রাত্রি হইয়া গিয়াছিল। সেই রাত্রে, পাহাড় হইতে নামিতে নামিতে, নির্জ্জন পাহাড়ের উপর ঝিল্লীরব শুনিয়াছিলাম। সে ঝিল্লীরব কত সুন্দর ও কত মধুর তাহা লিখিবার মত আমার ভাষা নাই। আমাদের দেশের ঝিল্লীরব যেরূপ মৃদু মধুর, শিলং-পাহাড়ের ঝিল্লীরব সেরূপ নহে। ঝিল্লীর এরূপ উচ্চ ধ্বনি আমি আর কোথাও শুনি নাই। সেই নিস্তব্ধ রজনীতে, নির্জ্জন পাহাড়ের গায়ে ঝিল্লীরব শুনিয়া আমার মনে হইয়াছিল, বুঝি, প্রকৃতিদেবী ভগবানকে ঝিল্লীধ্বনিতে আরতি করিতেছেন। সে আরতি নিশার মঙ্গল আরতির ন্যায় শুনাইতেছিল। আমরা দেবদেবীর নিকট শঙ্খ-ঘণ্টা ঢাকঢোল বাজাইয়া আরতি করি; ঝিল্লীরব মুখরিত প্রকৃতির এই আরতির সহিত আমাদের আরতির তুলনা হয় না। সে যে প্রকৃতিদেবীর স্বহস্তে ভগবানের আরতি!

নির্দ্দিষ্ট সময়ে মটর ছাড়িয়া দিল। আমাদের শিলংবাসী অন্যতম বন্ধু পঞ্চানন ব্রহ্মচারী ছলছল নেত্রে আমাদিগকে বিদায় দিবার জন্য তখনও ষ্টেশনে দাঁড়াইয়াছিলেন। ব্রহ্মচারী মহাশয় সেদিন, আমাদিগকে মটরে তুলিয়া দিবার জন্য যে কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমরা বিশেষভাবে ঋণী। ইনিই অনন্তবাবুর টেলিগ্রাম পাইয়া

আমাদের জন্ম 'লাবানে' বাড়ী ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। তখন ইঁহাকে আমরা জানিতাম না, চিনিতাম না; ইনি একজন রামকৃষ্ণদেবের পরমভক্ত। ইঁহার ন্যায় পরম ধার্ম্মিক; সাত্বিকগুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ শিলংএ আর দেখি নাই। ইঁহার অনেক অমানুসিক শক্তির কথা শুনিয়াছি; ইঁহার কথা, শিলংএর কথা ও শিলং বাসী বন্ধুদের কথা মটরে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম। চিন্তাস্রোত আমাকে উধাও করিয়া কোথায় যেন লইয়া গেল। কতক্ষণ এই অবস্থায় ছিলাম বলিতে পারি না। মটর যখন "নম্পো" (Nompoh) ষ্টেসনে আসিয়া পৌঁছিল, তখন আমি বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া পাইলাম। এখানে Downএর মটর পাস হইয়া যাইবার জন্ম আমাদের মটরকে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল। এই স্থান পাহাড়ের উপর; এখানে থানা, পোষ্টাফিস, টেলিগ্রাফ, ডাকবাঙ্গালা, হোটেল, বাজার প্রভৃতি সকলই আছে। সাহেবদের 'টি-হাউসও' আছে; খাসিয়ানীদের চায়ের দোকান আছে; মটর কোংর টেলিফোন আফিস আছে।

মটর অনেকক্ষণ এখানে অপেক্ষা করিবে শুনিয়া আমি মটর হইতে নামিয়া পড়িলাম। এক ভাবে মটরে বসিয়া থাকিতে ভাল লাগিল না। সাহেবদের চা-খানার কিঞ্চিৎ

দূরে একজন একটী খাসিয়ানী চায়ের দোকান খুলিয়া বসিয়া আছে। দেখিলেই, মনে হয় যে, এই খাসিয়ানী সাহেবদের চা-খানার সহিত প্রতিযোগীতা করিয়া চা বিক্রয় করিতেছে। খাসিয়ানীর দোকানটীও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; বেশভূষা আরও পরিষ্কার ও সুন্দর। খাসিয়ানীর দোকান আমার মনকে আকৃষ্ট করিল। আমি ধীরে ধীরে, খাসিয়ানীর চায়ের দোকানের সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। খাসিয়ানী ভদ্রভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া আমাকে বসিবার জন্য অনুরোধ করিল।

দেখিলাম খাসিয়ানী বেশ বাঙ্গালা বুঝিতে ও বলিতে পারে। তবে একেবারে সাদা বাঙ্গালা বলিতে পারে না। বাঙ্গালার সহিত হিন্দী মিশাইয়া বাঙ্গালা বলে। খাসিয়ানীর চা-প্রস্তুত প্রণালী দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম। কাপ, ডিস, টেবিল, সকলই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। খাসিয়ানী আমাকে জিজ্ঞাসা করিল।" "আপনি চা খাবেন বাবু?" খাসিয়ানীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দেখিয়া আমার চা খাইবার ইচ্ছা হইয়াছিল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, ইহারা গোখাদক। ইহাদের হাতের জল হিন্দুর বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের নিকট অস্পৃশ্য। আমি উত্তর করিলাম—

"না—"

খাসিয়ানী বলিল, "কেন বাবু? আপনাদের বাঙ্গালী সবাই তো আমার দোকানে আসিয়া খায়; আপনি কেন খাবেন না? আপনি কি কখনও চা খান না?"

আমি বিষম বিপদে পড়িলাম, বলিলাম—

"খাই—"

"তবে এখানে খাবেন না কেন বাবু? আমি সাহেবদের চা-খানার সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া চা প্রস্তুত করি; পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতাতেও আমি উহাদিগকে পরাস্ত করিয়াছি। ইহা সকলেই বলিয়া থাকে?"

"ইহা আমিও বলিতেছি।"

খাসিয়ানীর মুখের দিকে চাহিয়া আমি বলিলাম,—"তুমি যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় Tea Houseকে হারাইয়াছ, ইহা আমিও একবাক্যে স্বীকার করিতেছি।"

খাসিয়ানী আমার মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল। বোধ হয় এই হাসি, আমার মুখে তাহার প্রশংসা শুনিয়া।

একটু থামিয়া খাসিয়ানী আবার বলিল,—"আমি নিজের হাতে আপনার জন্ত এক কাপ চা প্রস্তুত করি বাবু; আপনি খাইয়া দেখুন, খাসিয়া জাতীর স্ত্রীলোকেরা কেমন চা প্রস্তুত করে।"

সত্যই তখন আমার চক্ষুলজ্জা হইতেছিল। খাসিয়ানীর বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও কি বলিয়া তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিব, ভাবিয়া আমি অন্য কথা পাড়িলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তুমি এমন ভাবে চা প্রস্তুত করিতে কোথায় শিখিলে ?"

খাসিয়ানী তখন নিজের জীবনের ইতিহাস বলিতে আরম্ভ করিল। "আঠার বৎসর বয়সে আমি বিধবা হইবার পর, স্বামীর স্মৃতি ভুলিয়া আমার আর বিবাহ করিবার ইচ্ছা হইল না। সংসারে আমার মা ব্যতীত আর কেহই ছিলেন না। তাঁহার ভরণপোষণ আমার স্বামী করিতেন। আমাদের সমাজের নিয়মানুসারে ইচ্ছা করিলে, আমি পুনরায় বিবাহ করিতে পারিতাম। এবং তজ্জন্য সকলেই আমাকে অনুরোধ করিতে লাগিল। মা বলিলেন, "আমি জোর করিয়া তোমায় বিবাহ দিব না মা ; তোমার যাহা ইচ্ছা হয় তুমি তাহাই কর।" আমি আর বিবাহ করিলাম না। আমাদের কুটীরের কাছেই একজন সাহেবের বাঙ্গালা ছিল ; সেই সাহেবের মেম আমাকে বড় ভাল বাসিতেন। তাঁহার একটী ছেলের জন্য আয়ার আবশ্যক ছিল। মেম আমাকে সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। সেই মেম অতি সুন্দর চা প্রস্তুত করিতে পারিতেন। কতটুকু জলে, কতটুকু চা দিলে চা খাইতে সুস্বাদু

ও উপকারী হয়; তাহাতে কতটুকু দুধ ও চিনি দিলে, স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি হয় না, এই সমস্ত তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আমাকে বুঝাইয়া দিতেন। আমি মাঝে মাঝে, তাঁহার জন্য চা প্রস্তুত করিতাম। কিছুদিন পরে, আমি এরূপ চা প্রস্তুত করিতে শিখিলাম, যে বেহারা, বাবুরচীর হাতের চা, স্বামী-স্ত্রীতে খাইতেন না। আমার হাতের চা-ই খাইতেন। মেমসাহেব আমাকে তাঁহাদের কন্যার মত দেখিতেন। কয়েক বৎসর পরে পেন্সন লইয়া সাহেব বিলাত চলিয়া গেলেন। মেম যাইবার সময় আমায় বলিয়া গিয়াছিলেন, "যদি তোমার কখনও কষ্ট উপস্থিত হয় আমাকে খবর দিও।" যাইবার সময় তাঁহাদের ঠিকানা ও একখানি ভাল সার্টিফিকেট আমার হাতে দিয়া গিয়াছিলেন।

"তাঁহারা চলিয়া যাইবার পর, আমি আর কাহারও নিকট চাকরী গ্রহণ করি নাই; চাকরী করিবার ইচ্ছা ছিল বটে, কিন্তু পিতামাতার ন্যায় তেমন মনিব আর পাইব না বলিয়া চাকরী করি নাই। এখানে আসিয়া চায়ের দোকান খুলিয়াছি।"

এইবার আমার মুখের দিকে চাহিয়া খাসিয়ানী বলিল,—"আজ তিন বৎসর হইল এখানে দোকান খুলিয়াছি বাবু; এই চায়ের দোকানের আয়ে আমার বেশ চলিয়া যাইতেছে।

আজ এক বৎসর হইল, আমার মায়ের মৃত্যু হইয়াছে; তাঁহার আত্মার মঙ্গলের জন্য আমি একশত টাকা দুঃখীদিগকে খাওয়াইবার জন্য ব্যয় করিয়াছি। এই ঘরগুলি আমি চায়ের দোকানের আয় হইতেই প্রস্তুত করিয়াছি। এই জমীটুকুও আমার নিজের; সংসারে আমি একা হইলেও, চায়ের দোকানের দুইটী পরিচারিকা ও একটী চাকর আমার সংসার ভুক্ত। আমরা এই চারি জনে এইখানে সংসার পাতাইয়া আছি।

কথায় কথায় অনেক দেরী হইয়া গেল বাবু, এখনই আপনার মটর ছাড়িয়া দিবে আপনি চা খাইয়া লউন। খাসিয়ানী প্রৌঢ়া হইলেও তাহার যৌবনশ্রী তাহাকে ত্যাগ করিয়া যায় নাই। তাহার সুগোল গঠন ও মুখের উজ্জ্বলতা অতীত-যৌবনের সাক্ষ্য দিতেছিল।

আমি বলিলাম "আমরা হিন্দু ও ব্রাহ্মণ। তোমাদের হস্তে প্রস্তুত চা খাইতে শাস্ত্রে আমাদের নিষেধ আছে।"

খাসিয়ানী একটু লজ্জিতা হইয়া বলিল—"ঠিক বলেছেন, বাবু; যাহার যে ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মই পালন করা কর্ত্তব্য। আমি অনেকবার আপনাকে চা খাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছি; সেজন্য আমায় মাপ করিবেন।"

"তোমার ভদ্রতা, অমায়িকতা ও বিদেশী ভদ্রলোকের প্রতি এই আদর আপ্যায়ন আমি ভুলিতে পারিব না। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যে ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া তুমি যৌবনের সীমা অতিক্রম করিয়াছ, সেই ধর্ম্ম যেন কখনও তোমাকে ত্যাগ না করে।"

"সেই আশীর্ব্বাদ করুন বাবু। আপনি ব্রাহ্মণ আপনার আশীর্ব্বাদ কখনও বৃথা হইবে না।"

খাসিয়ানী নতজানু হইয়া আমাকে প্রণাম করিল।

মটরের বাঁশী জোরে বাজিয়া উঠিল। আমি দ্রুত যাইয়া মটরে বসিলাম। মটর পবন বেগে ছুটিতে লাগিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বেলা তিন ঘটিকার সময় মটর গৌহাটীতে আসিয়া পৌছিল। আমার বন্ধুর শ্যালক হরিসাধকবাবু গৌহাটীর ষ্টীমার অফিসে কার্য্য করেন। তিনি পূর্ব্বেই আমাদের জন্য গৌহাটীতে একটী বাসা ঠিক করিয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন; আসিয়া গৌহাটীর পানবাজারে সেই বাসাটিতে গিয়া উঠিলাম।

আমরা কলিকাতাবাসী; সুতরাং গৌহাটীর বাসাগুলি আমাদের আদৌ ভাল লাগিল না। খড়ের ঘর, চারিদিকে বাশের বেড়া প্রাচীরের কার্য্য করিতেছে। ঘরের দেওয়াল-গুলিও মাটীর দেওয়াল নয় বাঁশের বেড়া মাত্র। গৌহাটীর সকল বাসাই প্রায় এই প্রকার। একশতের মধ্যে একখানি গৌহাটীতে ভাল বাড়ী আছে কি না সন্দেহ। বাসার চারিদিকে ঘাস; খাটা-পাইখানা কলিকাতায় ও অন্যান্য স্থানে আছে বটে, কিন্তু গৌহাটীর ন্যায় জঘন্য পাইখানা আর কোথাও নাই। উঠানের চারিপার্শ্বে এত জঙ্গল যে, শৃগাল লুক্কায়িত থাকিলেও দেখিবার উপায়

নাই। যাহা হউক আমরা গৌহাটীতে তিন দিন তিন রাত্রি এইরূপ বাসাতেই কাটাইয়াছিলাম।

আমরা নূতনবাসায় উপস্থিত হইলাম, সুতরাং আহারাদির যোগাড় করিতেই আমাদের সন্ধ্যা হইয়া গেল। শিলংএ পঞ্চানন্দ ব্রহ্মচারীর মুখে বশিষ্ঠাশ্রমের কথা শুনিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, বশিষ্ঠাশ্রম স্থানটী অতি স্নিগ্ধ পবিত্র ও মনোরম। তথায় কেবলমাত্র বসিয়া থাকিলে চিত্ত স্বয়ং স্থির হইয়া যায়। ব্রহ্মচারী মহাশয়ের মুখে বশিষ্ঠাশ্রমের কথা শুনিয়া অবধি ঐ আশ্রমটী দর্শনের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছিল। প্রভাতেই বশিষ্ঠাশ্রম দর্শনে যাইবার বন্দোবস্ত করিলাম।

গৌহাটীসহর হইতে বশিষ্ঠাশ্রম নয় মাইল দূর। যাইতে হইলে, পদব্রজে গো-শকট কিম্বা ঘোড়ার গাড়ীতেও যাওয়া যায়। তবে ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া কাঁচা-রাস্তা বলিয়া অত্যধিক লইয়া থাকে। গো-শকটে যাইয়া কোথায় কতক্ষণে পৌঁছিব তাহার কোনও স্থিরতা নাই। সুতরাং আমরা রাত্রে অত্যধিক ভাড়া স্বীকার করিয়া সেখানে যাইবার জন্য ঘোড়ার গাড়ী ঠিক করিয়া রাখিলাম। সঙ্গে আহারীয় দ্রব্যাদি যাহা যাহা লইয়া যাইতে হইবে, তাহাও বাঁধিয়া রাখিবার জন্য রাত্রেই ব্যবস্থা করা হইল। আমরা পথশ্রমে অবসন্ন ও শ্রান্ত হইয়া আসিয়াছিলাম, সুতরাং উদর-গহ্বরে

অৰ্দ্ধসিদ্ধ খিচুড়ী পড়িবামাত্রই চক্ষু মুদিয়া আসিতে লাগিল।

প্রত্যুষে উঠিয়াই দুইখানি অশ্বযানে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বোঝাই করিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। অশ্বিনীকুমারেরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও চালকের চাবুকের ভয়ে আস্তে-আস্তে গাড়ী টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। আমার পুত্রের হ্যাট-কোট-পরা মাষ্টারকে বাসায় দ্রব্যাদি আগলাইবার জন্য রাখিয়া গেলাম, তাহাকে আর এবার সঙ্গে লইলাম না। সঙ্গে লইয়া কেবল চায়ের উপদ্রব ও ঝঞ্চট বাড়ান ছাড়া বিশেষ কোনও সাহায্য পাইবার আশা ছিল না। মাষ্টার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাটা কয়েক দিনের প্রবাসবাসে বিশেষরূপে অর্জ্জন করিয়াছিলাম।

গাড়ীখানি অশ্বিনীকুমারেরা বশিষ্ঠাশ্রমের পথে ধীরে ধীরে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। আমরা প্রভাতের মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য অবলোকন করিতে করিতে, অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আসামীরা তাহাদের গরুর পালগুলি মাঠের দিকে লইয়া যাইতেছে। অবাধ্য গরুগুলি এদিক-ওদিক ছুটিয়া যাইতেছে বলিয়া রাখালবালক তাহাদের আসামী-ভাষায় অশ্রাব্য গালাগালি দিয়া গরুগুলিকে প্রহার করিয়া সায়েস্তা করিয়া দিতেছে।

কতকদূর অগ্রসর হইয়া আমরা আসামীয়াদের বস্তি দেখিতে পাইলাম। আসামী কুলবধূরা সেই মাত্র শয্যা ত্যাগ করিয়া চিত্রবিচিত্র করা আসামীয়া কলসীগুলি কটী-দেশে লইয়া গৃহমার্জ্জনার জন্য পুষ্করিণী হইতে জল আনিতে যাইতেছে। বস্তির মাঝে ছোট ছোট দোকান। দোকান-দারেরা সেইমাত্র ঝাঁপ উঠাইতেছে এবং বীচিকলা, ছাতু চিঁড়া ও গুড় প্রভৃতি তাহাদের দোকানের জিনিসগুলি ক্রেতার মনযোগ আকর্ষণের জন্য গুছাইয়া সাজাইয়া রাখিতেছে। আসামীরা যেরূপ বীচিকলার ভক্ত তাহাতে অপর্য্যাপ্ত বীচিকলার দোকান দেখিয়া বিস্মিত হইলাম না।

দেখিতে দেখিতে, অনেকটা বেলা হইয়া গেল। মার্ত্তণ্ডদেব প্রখর কিরণজাল জগতে বিস্তার করিয়া দিলেন। ঘড়ী খুলিয়া দেখিলাম, বেলা আটটা বাজিয়া গিয়াছে। আসামী চাষীরা ক্ষেত্রে লাঙ্গল দিতেছে। আসামী বধূরা তাহাদের স্বামীর জন্য গরম গরম চা প্রস্তুত করিয়া লইয়া মাঠের দিকে দ্রুতপদে চলিয়াছে। তাহাদের দ্রুতপদ সঞ্চালন দেখিয়াই মনে হইতে লাগিল, ইহাদের স্বামীর চা খাইবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাই ব্যাকুলিত ভাবে ব্যস্ত ত্রস্ত হইয়া একমনে হন হন করিয়া চায়ের পাত্র হস্তে স্বামীর উদ্দেশে ছুটিয়া চলিয়াছে।

মনে হইল পাশ্চাত্য ব্যবসায়ী তোমরা ধন্য। নিভৃত পল্লীর নিরক্ষর চাষীদিগকেও চায়ের নেশায় বেশ নিমগ্ন করিয়া রাখিয়াছ। যাহাদের দেশে দুইবেলা অন্ন জোটে না—বৃষ্টিও রৌদ্রে হল চালনা করিয়া যাহাদের অঙ্গ কালীবর্ণ হইয়াছে তাহাদিগকেও চা কিনিয়া খাইতে হইতেছে। ধন্য চা ব্যবসায়ী তোমাদের ব্যবসাই সার্থক!

যতই আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম, কেবল চারিদিকে ধান্যক্ষেত্র ধূধূ করিতেছে; আর অগণিত আসামী চাষী তাহাদের ছোট ছোট গরুগুলি লইয়া চাষ করিতেছে।

প্রায় অর্দ্ধেক পথ আসিয়া একটী চা-বাগান নয়নপথে পতিত হইল। এই চা-বাগানের মাঝে-মাঝে শত শত রবার গাছ। চা-বাগানের মধ্যে রবারগাছের বাগান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শুনিলাম, এই চা-বাগানটি একটি বাঙ্গালীর। শুনিয়া কেবল যে আনন্দ হইল তাহা নয়, হর্ষে বুক ফুলিয়া উঠিল। এই চা-বাগানটি পার হইয়া আমরা ভীষণ জঙ্গলে পড়িলাম। দুইপার্শ্বে ভীষণ জঙ্গল, মধ্যে কাঁচা রাস্তা। শুনিলাম এই জঙ্গলের মধ্যে ব্যাঘ্র ভল্লুক ও বন্যহস্তী সকল বাস করে। লোকালয় শূন্য জনমানবহীন অরণ্যপার্শ্বে যাইতে যাইতে প্রাণ শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। এখনই যদি একটি প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া

আমাদিগকে আক্রমণ করে তবে ডাকিলে কাহারও সাহায্য পাইবার উপায় নাই। আমাদের ভীতিবিহ্বল কথাবার্ত্তা শুনিয়া গাড়োয়ান দুইজন বলিল "ভয় নাই বাবু—দিনের বেলা জানোয়ার বাহির হয় না; তাহাদেরও তো প্রাণে ভয় আছে"।

চার মাইল এইরূপ ভীষণ জঙ্গল আমাদিগকে পার হইতে হইল। মাঝে-মাঝে পাহাড়ী অরণ্যবাসী লালং জাত দুই একজন দেখিতে পাইলাম। আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, জঙ্গলের মধ্যে অগণিত কাঁঠালগাছে অজস্র কাঁঠাল ধরিয়া রহিয়াছে। বুঝিলাম, এখানে কাঁঠাল পাহাড়ীয়াদের প্রিয়বস্তু নয়। তাহা হইলে এমন অজস্র কাঁঠাল নির্ব্বিবাদে গাছে পাকিয়া থাকিবার অবকাশ কোন দিন পাইত না। আমার পাচক কাঁঠাল পাড়িবার জন্য ছটফট করিতে লাগিল। কিন্তু, আমার অনিচ্ছা দেখিয়া সাহস করিল না।

দিবা প্রায় এগার ঘটিকার সময় আমরা বশিষ্ঠাশ্রমে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। কি সুন্দর ও পবিত্র স্থান। বশিষ্ঠাশ্রমের সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাওয়া খঞ্জের গিরি লঙ্ঘনের ন্যায় দুরাশা মাত্র। আমার এমন সাধ্য নাই—এমন লেখনী-শক্তি নাই—বাক্য-বিন্যাস

করিবার ক্ষমতা নাই, যে স্বর্গের ছবি—বশিষ্ঠাশ্রমের সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিতে পারি। সুতরাং বশিষ্ঠাশ্রমের পরিচয় ও ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিবার ইচ্ছা থাকিলেও অক্ষমতা প্রযুক্ত আমি নিবৃত্ত হইলাম। পাঠকের যদি সময় ও সুবিধা ঘটে—তবে একবার বশিষ্ঠাশ্রম দর্শন করিয়া জীবন ধন্য ও মনকে পবিত্র করিবেন। ইহাই আমার অনুরোধ। যিনি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিতে অভিলাষী তিনি যেন বশিষ্ঠাশ্রম দেখিয়া যান। যাঁহার নির্জ্জন পবিত্র স্থান দেখিবার ইচ্ছা আছে—তিনি বশিষ্ঠাশ্রমে গমন করুন। স্বর্গের ছবি মর্ত্তে দেখিবার যদি কাহারও বাসনা থাকে তবে তিনি বশিষ্ঠাশ্রম দর্শন করিতে প্রয়াসী হউন। নিভৃত নির্জ্জনে ভগবানের উপাসনা করিবার জন্য যাঁহার ইচ্ছা, তিনি সব ত্যাগ করিয়া বশিষ্ঠাশ্রমে ছুটিয়া চলুন। সংসারের পাপ তাপ জ্বালা যন্ত্রণা যদি ক্ষণেকের তরে জুড়াইবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে বশিষ্ঠাশ্রমে আসুন। দুরন্ত মনকে বশে আনিয়া ঈশ্বরাভিমুখীন করিবার জন্য যিনি প্রয়াসী তিনিও বশিষ্ঠাশ্রমে যাইতে পারেন। সংসারের শোকদুঃখে যিনি ম্রিয়মাণ ক্ষণেকের নিমিত্ত তিনিও বশিষ্ঠাশ্রমে যাইয়া হৃদয়কে শান্ত করুন। বশিষ্ঠাশ্রমটী কেমন যিনি না দেখিয়াছেন,

তাঁহার সম্মুখে ভাবার ছবি আঁকিয়া ধরিতে আমি অক্ষম।

বশিষ্ঠাশ্রমে পৌঁছিয়াই আমি নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলাম। বালক যেমন করিয়া চীৎকার করিতে করিতে নৃত্য করে, আমিও লজ্জাসরম ভুলিয়া তেমন করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলাম। বলিতে ভুলিয়াছি, অনন্তবাবুর সঙ্গ আজও পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে পারি নাই। কখনও জোর করিয়া, কখনও অনুনয়বিনয় করিয়া, কখনও অভিমানে মুখ ভার করিয়া তাঁহাকে সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়াছি। পলাইবার চেষ্টা করিলেও আমি অনন্তবাবুকে পলাইতে দিই নাই।

বশিষ্ঠাশ্রমে আসিয়া অনন্তবাবুর চক্ষু দুইটী জলে ভরিয়া আসিল। অনন্তবাবু প্রস্তরখণ্ডের উপর চক্ষু মুদিয়া বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার তখন বাহ্যজ্ঞান ছিল না। কতবার ডাকিলাম, অনন্তবাবুর উত্তর পাইলাম না। বুঝিলাম, অনন্তবাবু বাহ্য ছাড়িয়া অন্তর দিয়া অন্তর্য্যামীকে ডাকিতেছেন। তাই তাঁহার বাহ্যজ্ঞান নাই। কল কল রবে ঝরণার জল অবিরাম গতিতে ঝরিয়া পড়িতেছে। জলপতনের শব্দে মনে হইতে লাগিল, বুঝি কর্ণ বধির হইয়া যাইবে। কিন্তু কর্ণ বধির হইল না। সেই শব্দের সঙ্গে মন কোথায়

যেন ছুটিয়া যাইতে লাগিল। চারিদিকে পাহাড় ;—চারি দিকে ভীষণ অরণ্য,—মধ্যে ঝরণা। বনের মাঝে-মাঝে ঝরণার উপরে নানাপ্রকারের ও বিচিত্র বর্ণের লতা ও ফুলের কত গাছ। প্রাণারাম স্থান। বড় বড় কাঁঠাল গাছ, এত বড় কাঁঠাল ও চ্যুতবৃক্ষ ইতিপূর্ব্বে আর দেখি নাই। এই ঝরণাকে মন্দাকিনী গঙ্গা বলে।

কথিত আছে বশিষ্ঠদেব ছয় হাজার বর্ষ এই স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন। যোগিনীতন্ত্রে ইহার উল্লেখ আছে। এই পর্ব্বতের নাম "সন্ধ্যাচল পর্ব্বত।" বশিষ্ঠদেব এই স্থানে তপস্যা করিতেন। প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ং ত্রিসন্ধ্যাই করিতেন, এইজন্য এই পর্ব্বতের নাম সন্ধ্যাপর্ব্বত হইয়াছে। তিনি যেখানে বসিয়া সন্ধ্যা ও তপস্যা করিতেন সেই স্থানটী পাণ্ডা আমাদিগকে দেখাইয়া দিলেন। আমি ভক্তিভরে প্রণাম করিলাম। যে পাথরের উপর বসিয়া বশিষ্ঠদেব তপস্যা করিতেন, সেই বৃহৎ প্রস্তরখানিও পাণ্ডা আমাদিগকে দেখাইয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে, আত্ম-বিস্মৃত হইয়া গেলাম। কি অপরূপ স্থান মাহাত্ম্য।

বশিষ্ঠ আশ্রমের পাণ্ডাটীকে দেখিয়া মনে ভক্তির উদ্রেক হইল। ব্রাহ্মণ অল্পেই সন্তুষ্ট, সাত্ত্বিকভাবাপন্ন ও বিনয়ী। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, এই ব্রাহ্মণ পাণ্ডার বয়স

অশীতিবর্ষ পার হইয়া গিয়াছে। এখনও চক্ষের জ্যোতিঃ মনের বল, যৌবনকালের ন্যায় অটুট রহিয়াছে।

পাণ্ডার নাম "খগেশ্বর দেবশর্ম্মণঃ।" ইহারা বশিষ্ঠাশ্রমের বংশানুক্রমে পাণ্ডা।

কথাবার্ত্তায় জানিলাম পাণ্ডার স্ত্রী বহুকাল মারা গিয়াছে। সাংসারিক নানাকথা পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। পাণ্ডা খগেশ্বর দেবশর্ম্মণঃ বলিতে লাগিলেন—

"বাবু মহাশয়, বনবাসী এই গরীব ব্রাহ্মণের সংসারের কথা আর কি শুনিবেন। সে আজ ৪০ বৎসরের কথা ব্রাহ্মণী স্বর্গধামে চলিয়া গিয়াছেন। ৪০ বৎসর গত হইয়া গেছে বটে তবু এখনও ব্রাহ্মণীর ক্ষীণস্মৃতি মাঝে-মাঝে বিদ্যুৎ চমকাইবার মত বুকের মধ্যে উদয় হইয়া তখনই বিলীন হইয়া যায়। সেই সময় মনটাকে বিচলিত করিয়া দেয়, আবার ভগবানের নাম করিয়া প্রকৃতিস্থ হই। ভগবানকে বলি ভগবান; এখনও আমাকে মায়ায় ডুবাইয়া রাখিবে? ভগবানের কাছে একটু কাঁদিলেই ভগবান আবার মনটাকে ঠিক করিয়া দেন। ব্রাহ্মণী যাওয়াবধি আমি এই বশিষ্ঠাশ্রমেই বাস করিতেছি। ঘরে যাইতে ইচ্ছা হয় না। তবে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আজ্ঞা আসিলে ২।৪ মাস পরে এক একবার দুই একদিনের জন্য যাইতে হয়।

সংসারে আমার আর অপর কেহ নাই। একমাত্র আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, তাঁহার স্ত্রী ও তাঁহার একটী পুত্র আছে। এখানে যাহা কিছু পাই আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে পাঠাইয়া দিই। তাঁহার বয়স প্রায় শতাধিক হইতে চলিল। আমি থাকিতে এ বয়সে তাঁহাকে তো আর খাটিতে দিতে পারি না। ভ্রাতুষ্পুত্রটী যে কয় বিঘা জমী জমা আছে, সেইগুলিতে চাষ করে।" খগেশ্বর পাণ্ডা কত কথাই সেদিন বলিয়াছিল। দেখিলাম খগেশ্বর পাণ্ডা -পাণ্ডাশ্রেণীর লোক হইলেও কাহারও নিকট কিছু চাহে না। জোর জুলুম নাই। যিনি ইহাকে কিছু দিতেছেন, তাঁহারও উপর যেরূপ প্রফুল্লভাব; যিনি কিছুই দেন নাই তাহারও উপর তদ্রূপ প্রফুল্লতা বিদ্যমান। আমি খগেশ্বর পাণ্ডাকে বলিলাম "আমার আপনার উপর বড়ই ভক্তি হইয়াছে, অনেক তীর্থে ঘুরিয়াছি; কিন্তু আপনার ন্যায় পাণ্ডা একজনও আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। আপনি দয়া করিয়া এই বশিষ্ঠাশ্রমের কোথায় কি আছে, আমাদিগকে দেখাইয়া দিন এবং আমাদিগকে পূজাদি করাইয়া তৃপ্তি প্রদান করুন।"

বিনয়ের সহিত পাণ্ডা বলিলেন "বাবা আমি অজ্ঞান মূর্খ পাণ্ডা; যাহা জানি তাহা বলিয়াই আপনাদিগকে পূজা করাইব ও সব দেখাইয়া দিব। আপনারা—স্নান করিয়া আসুন।

স্নানাদি করিয়া আসিয়া আমরা পাণ্ডার সঙ্গে মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। মন্দিরটী বহুকালের জীর্ণ মন্দির, মন্দিরগাত্রে একটী প্রস্তর ফলকে নিম্নলিখিত কথাগুলি খোদিত আছে—

"শ্রীরামঃ ৺স্বস্তিনিষ্প্রীতিমপরাক্রমঃ
প্রবল বৈরিবলপ্রলয় কালানলঃ সম্পূর্ণগুণ-
গণৈকধামঃ ভবভবানী পদারবিন্দ মধুকরঃ
শক্রকুলকলঙ্ক সুধেন্দুঃ শ্রীশ্রীমদ্রাজেশ্বরসিংহঃ
নিদেশ ইন্দ্রানলাবলম্বি মৌলিঃ তদীয়-
চরণচারণ চক্রবর্ত্তী দ্বন্দাবদাতকীর্ত্তিঃ
সমরধীরঃ পারাবার গম্ভীরঃ বিদ্যাবিদ্যোতি-
তান্তঃকরণঃ শ্রীগোবিন্দপদাব্জরো লম্বোদরঃ
বাহিনীপতিঃ শ্রীমদনুজহুবরাকুক্কমামেজ
শ্রীমৎ তরুণবরহুবরাকুক্কুন তদনুজ
শ্রীমদ্দশরথাভিধেয়ঃ সেনাধ্যক্ষো
বশিষ্ঠাশ্রমশিরোপরি প্রাসাদমচীকরৎ।
তর্ক নাগরসেন্দুশাকে। ১৬১৬ শাক"

উপরোক্ত শ্লোকটীর মোটামুটি অর্থ ইহাই বুঝিয়াছিলাম যে, ১৬১৬ শকে আসাম প্রদেশের রাজা রাজেশ্বর সিংহের আদেশে তাঁহার সেনাপতি দশরথ এই মন্দিরটী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমরা পাতালের দিকে অবতরণ করিতে লাগিলাম। মন্দিরটী এত অন্ধকার যে, পাণ্ডা অগ্রে অগ্রে প্রদীপ লইয়া সিঁড়ি দেখাইয়া পাতালের দিকে নামিতে লাগিলেন, তাঁহার পশ্চাত পশ্চাত আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম। মন্দির মধ্যস্থ পাতালপুরীর মধ্যে বশিষ্ঠদেবের পাষাণ মূর্ত্তি, মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি, তারাদেবী প্রভৃতির মূর্ত্তি। আমরা ভক্তিগদগদ হৃদয়ে পূজা করিলাম। পাণ্ডা বলিলেন "এই পাতালপুরীতেও মন্দাকিনী গঙ্গার সহিত যোগ আছে। এই স্থান পবিত্রাদপি পবিত্র"।

পূজা ও দর্শনাদি করিয়া মনপ্রাণ স্নিগ্ধ শীতল হইয়া গেল। ঝরণা প্রস্তরের উপর দিয়া ত্রিধারা হইয়া বহিয়া আসিয়াছে। দেখিলে হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠে। এই তিনটি ধারাকে সন্ধ্যা, ললিতা ও কান্তা বলে। এই সন্ধ্যা, ললিতা ও কান্তায় বশিষ্ঠদেব ত্রিসন্ধ্যা করিতেন। সন্ধ্যায় প্রাতঃ সন্ধ্যা করিতেন, ললিতায় মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা করিতেন ও কান্তায় সায়াহ্ন সন্ধ্যা করিতেন। এই স্থানটিতে বহু লিখিত প্রস্তর ও পদ্মাসন দেখিলাম।

পূজাদি সমাপন করিয়া ঝরণায় আসিয়া দেখিলাম, অনন্তবাবু সেই পূর্ব্বের মত ধীর স্থির অচঞ্চল দীপশিখার

ন্যায় স্থির হইয়া বসিয়া আছেন। আমিও একখানি প্রস্তরের উপর তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া পড়িলাম। ঝরণার অবিরাম কল কল শব্দে প্রাণ বিভোর হইয়া পড়িল।

কেবলই মনে হইতে লাগিল, এই অবিরাম জলস্রোত কোথা হইতে আসে, আর কোথা চলে যায়। দুরন্ত বালকের ন্যায় পাহাড়ের ধার দিয়া কোথা হইতে ঝরণা আসিতেছে, দেখিবার জন্য অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, ভীষণজঙ্গল। ঝরণা জঙ্গলের মধ্য দিয়া বহিয়া আসিতেছে। সেইখানেই বাধা প্রাপ্ত হইলাম। ভীষণ জঙ্গল দেখিয়া প্রাণ আশঙ্কায় আকুল হইয়া উঠিল। কেহ কোথাও নাই, কেবল সেই ঝরণার ভীষণ গর্জ্জন।

ফিরিয়া আসিয়া ঝরণা যেখানে ত্রিধারা হইয়া তিন দিকে ছুটিতেছে,সেই স্থানে আসিলাম। দেখিলাম, তিন ধারায় গঙ্গা পতিত হইতেছে। অন্যের চক্ষে ঝরণা বটে, বিশ্বাসী হিন্দুর পক্ষে, ইহা গঙ্গার ত্রিধারা। পুলকিত প্রাণে সেই ত্রিধারা গঙ্গার দিকে চাহিয়া চীৎকার করিয়া বলিলাম, "হিন্দু কে কোথায় আছ, ছুটিয়া এস ; আসিয়া দেখ, ভোগবতী গঙ্গা বশিষ্ঠের তপোপ্রভাবে কেমন ত্রিধারে ছুটিয়া চলিয়াছে।" চীৎকার করিতে করিতে, আনন্দে প্রাণ বিভোর হইয়া উঠিল।

গঙ্গা যে স্থান হইতে ত্রিধারায় বহিয়া চলিয়াছে, সেই স্থানটীর অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যের কথা লেখনী মুখে বর্ণনা করা অসম্ভব। সম্ভব হইলেও আমার ন্যায় লেখকের সাধ্যায়ত্ত নহে। এই স্থানটীর চতুর্দ্দিকে পর্ব্বত ও জন-মানবহীন ভীষণ অরণ্য। ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বন্য হস্তীসকল এই অরণ্যের মধ্যে মনের আনন্দে বিচরণ করিতেছে। তাহাদের সুখ বিচরণের পথে বাধা জন্মাইবার কাহারও শক্তি নাই। মানুষ সে জঙ্গলে প্রবেশ করিতে অক্ষম, কারণ সেটা কেবল ব্যাঘ্র ভল্লুক ও বন্য জন্তুর দেশ।

ইংরাজিশিক্ষিত বাবুরা ইহাকে ঝরণা বলিয়া থাকেন। কিন্তু সত্যই ইহা ঝরণা নহে; ইহা ত্রিতাপনাশিনী কলুষ-নিবারিণী গঙ্গার ত্রিধারা। বারমাস ত্রিশদিন চব্বিশঘণ্টা একই ভাবে বহিয়া চলিয়াছে। ঝরণা হইলে, ইহার হ্রাস বৃদ্ধি থাকিত।

ঝরণার ধারে একখানি পাথরের উপর বসিয়া পাহাড়, জঙ্গল, ও ত্রিধারা দেখিয়া আত্মহারা হইলাম। মনে হইল ইহা বুঝি পৃথিবী ছাড়া অন্য কোনও দেশ। ইহা বুঝি চির শান্তির রাজ্য। ত্রিধারা আসিয়া কুণ্ডে পড়িতেছে, সে কি ভীষণ শব্দ। হায় ভারত! তোমার বক্ষে যত শান্তির রাজ্য, শান্তির দেশ—পৃথিবীর আর কোনও দেশে

বুঝি সেরূপ নাই। হায় ভগবান বশিষ্ঠদেব! কোথায় তুমি আজ; কিন্তু তোমার এই পবিত্র আশ্রম, তোমার পুণ্যপ্রভাবে তোমাকে যেন এই স্থানে সজীব্ করিয়া রাখিয়াছে। যদি আমাদের দেখিবার মত চক্ষু থাকিত তবে আজ সশরীরে তোমায় দেখিতে পাইতাম। তোমাকে স্মরণ করিয়া যদি আজ এই আশ্রম সন্নিধ্যে বসিতে পারিতাম, তবে মনোরাজ্যে তোমায় দেখিতে পাইতাম।

কুণ্ডের নিকট আসিয়া বসিলাম। কি করিয়া তাহা বুঝাইব সে স্থানটী আরও কত সুন্দর। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ দুইদিকে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া কুণ্ডের উপর ছায়া বিতরণ করিতেছে। এরূপ বৃহদাকার বৃক্ষ জীবনে আর আমি কোথাও কখনও দেখি নাই। বশিষ্ঠ দেবের পুণ্যপ্রভাবে বোধ হয় এই সকল বৃক্ষের জন্ম কুণ্ডটীকে স্নিগ্ধ ও সুশীতল করিবার জন্ম বশিষ্ঠের আদেশে বুঝি, এই বৃক্ষগুলি জন্মগ্রহণ করিয়াছে। বৃক্ষের তলদেশে সারি সারি পাথরের বিছানা। হীরক-খচিত স্বর্ণসিংহাসনের উপর দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যা, এই পাথরের বিছানার নিকট হার মানিয়াছে। এই পাথরের উপর একবার বসিলে ক্ষুধা তৃষ্ণা উড়িয়া যায়; মন শান্তি ও পবিত্রতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে।

প্রস্তরের উপর উপবেশন করিয়া মনে হইতে লাগিল, শাস্ত্র-বাক্য অনুসারে যেখানে ভগবান্ বশিষ্ঠদেব ছয় হাজার বর্ষ তপস্যা করিয়াছিলেন, সেইখানে আসিয়া কি আজ আমি বসিয়া আছি? সত্যই কি তাঁহার পদরেণু এই সব উপলখণ্ডের উপর একদিন পতিত হইয়াছিল? তবে আজ তাঁহাকে দেখিতে পাই না কেন? দেখা দাও প্রভু ভগবান্ বশিষ্ঠ! তোমার এই আশ্রম হইতে আর ফিরিব না। চাহি না রাজ্য-সম্পদ, চাহি না সুখ-বিভব, চাহি না দারা-সুতের মিথ্যা মোহ আকর্ষণ, চাহি না অর্থ ও স্বজন; চাহি না সংসারের অনিত্য সুখ-শান্তি। তোমার চরণতলে আমায় আশ্রয় দাও।

দরদরধারে চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। কেমন একরকম হইয়া গেলাম। চিন্তা করিয়া নূতন কিনারা কিছু পাইলাম না। তাঁহাকে ডাকিতে ডাকিতে, ডাকিবার ভাষা আর খুঁজিয়া পাইলাম না। কে যেন কাণেকাণে বলিতে লাগিল, এইরূপে জন্মজন্মান্তর ঘুরিয়া যদি কখনও পরমাত্মার দর্শন পাও তবে এইরূপ স্থানেই পাইবে, অন্যত্র নহে এবং পাহাড় ভিন্ন মনঃস্থির করিবার অন্য স্থান নাই।

আবার একদৃষ্টে সেই ত্রিধারার দিকে দেখিতে লাগিলাম। একই ভাবে একই গতিতে ত্রিধারার জল

ছুটিতেছে। হ্রাসবৃদ্ধি নাই। ইহা ভগবান্ বশিষ্ঠদেবের প্রভাব ব্যতীত আর কিছু আমার মনে হইল না।

বেলা তিন ঘটিকা পর্য্যন্ত সেই প্রস্তরের উপর বসিয়া পরকালের কত কথাই মনে উদিত হইতে লাগিল। কয়দিন পরেই মরিতে হইবে, আবার জন্মিতে হইবে। কোন্ দেশে, কোন্ বংশে, কোন্ জাতিতে আবার জন্মগ্রহণ করিব জানি না। এমন জন্ম কি পাইব প্রভু যে, কোনও চিন্তা কোনও আসক্তি থাকিবে না? কেবল এইরূপ স্থানে আসিয়া নির্জ্জনে দিবারাত্র তোমার কথা ভাবিব। পাইব কি?

একগোছা আমড়া উপর হইতে আমার সম্মুখস্থ প্রস্তরের উপর পড়িয়া গেল। চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল। উপরের দিকে চাহিয়া দেখি, আমার পাচক ব্রাহ্মণ বৃহদাকার আমড়া বৃক্ষের উপর উঠিয়া আমড়া পাড়িতেছে। দেখিয়া আমার বুক দুর দুর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। যদি ব্রাহ্মণ-সন্তান ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায়, তবে প্রস্তরের উপর চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে, তাহার চিহ্নমাত্র থাকিবে না। আমি বারবার তাহাকে সাবধানে নামিবার জন্ম চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলাম, কিন্তু সে তখন শতাধিক হস্ত উপরে রহিয়াছে। ঝরণার গর্জ্জনের সঙ্গে আমার চীৎকার মিশাইতে লাগিল। পাচকের কর্ণে আমার সে ব্যাকুল

আহ্বান প্রবেশ করিল না। পাচক এরূপ দুঃসাহসিক কার্য্য অনেকস্থানে অনেকবার করিয়াছে বটে, কিন্তু এই শান্তিপূর্ণ পবিত্র বশিষ্ঠ আশ্রমে আসিয়া এরূপ আচরণ আমার বড়ই বিরক্তিকর বোধ হইতে লাগিল। বার বার ইঙ্গিত করিয়া তাহাকে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলাম। অনেক ইঙ্গিত অনুরোধের পর স্তূপাকার আমড়া পাড়িয়া সে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিল। এই স্থানে আমার এই পাচকব্রাহ্মণের কথঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিব।

পাচক ব্রাহ্মণের নাম "অর্জ্জুনওঝা। দেওঘরের সন্নিকট কুণ্ডায় * ইহার বাড়ী। অর্জ্জুনওঝা আমার প্রতিবাসী। অর্জ্জুনওঝাকে প্রতিবাসী বলিতে পারা যায় কারণ আমার কুণ্ডার বাড়ীর সন্নিকটে ইহার বাড়ী। সুতরাং ইহার সঙ্গে কেবল চাকর-ভৃত্যের সম্বন্ধ নহে।

সে অনেক দিনের কথা। একদিন অর্জ্জুনওঝার পিতা চাঁদমোহনওঝা তাহার পুত্রের হস্ত ধারণ করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইল। অর্জ্জুনওঝার পিতা অত্যন্তই অমায়িক ব্রাহ্মণ। কপটতা, প্রবঞ্চনা, একেবারেই জানে

---

* কুণ্ডার পরিচয় ইতিপূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে।

না। কয়েক বিঘা জমিজমা আছে, তাহাই চাষ করিয়া ইহাদের দিনাতিপাত হয়।

চাঁদমোহন বলিল "বাবু, আমার এই পুত্রটীকে আপনি রাখেন। ইনি খুব ভাল পাক করিতে পারেন। বর্দ্ধমান জেলায় রাঁধিবার জন্ত ইনি গিয়াছিলেন। সেখানে ম্যালেরিয়া হাওয়ায় ইনির পেটটা কিছু বড় হইয়াছে। প্লীহা, লিভের, দেখা দিয়াছে; তাই ইনিকে আর সেখানে যেতে দিতে বাড়ীর তাঁর ইচ্ছা নাই। আপনি আমাদের এখন প্রতিবেশী; আপনি এনাকে পালন করুন।"

চাঁদমোহন খুব সাধু ভাষায় তাহার পুত্রের পরিচয় দিল। অর্জ্জুনওঝার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম মুখ পাণ্ডুবর্ণ। প্লীহা ও যকৃতে উদর স্ফীত, হাত দুইটী সরু সরু; চক্ষু দুইটী হরিদ্রাভ। অর্জ্জুনকে সেই দিনই আমাদের সংসারভুক্ত করিয়া লইলাম।

দেওঘর এবং তৎসন্নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলি ইতিপূর্ব্বে জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। সাঁওতালের বাস অধিক বলিয়াই এই জেলার নাম "সাঁওতাল পরগণা।" এই স্থান সাঁওতালের বাসভূমি হইলেও ওঝা ব্রাহ্মণ ও অন্তান্ত জাতির বাসও আছে। ইহারা পূর্ব্বে অসভ্যজাতিতেই পরিণত ছিল এবং সাঁওতালদের আচার ব্যবহারের সহিত ইহাদের কোনও পার্থক্য ছিল না।

ইহারা এখনও গাছে সিন্দুর লাগাইয়া ভূতের পূজা করিয়া থাকে! ঘরে আগুন লাগিলে, কঠিন পীড়া হইলে, কোনও বিপদে পতিত হইলে, প্রসূতি প্রসব হইতে না পারিলে, সূতিকাগারে শিশুর মৃত্যু হইলে, ইহারা ভূতের কার্য্য মনে করিয়া থাকে।

দিবা প্রায় চারি ঘটিকার সময় অর্জ্জুনঠাকুর খিচুড়ী ভাজা ও বশিষ্ঠাশ্রমের সেই বৃহৎ আমড়া বৃক্ষের আমড়ার অম্বল পাক শেষ করিল। ঝরণার তীরে বড় একখানি প্রস্তরের উপর তিনদিকে তিনটী ভগ্ন প্রস্তর দিয়া তাহাতেই আমাদের পাকাদিকার্য্য শেষ হইয়াছিল। যখন আহারে বসিলাম তখন মনে হইতে লাগিল অমৃত পান করিতেছি। খিচুড়ী যে এত সুস্বাদু হইতে পারে তাহা পূর্ব্বে কখনও জানিতাম না।

ত্রিধারার জল—কি স্থান মাহাত্ম্যে এই প্রকার হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। জঠরানল তখন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল সত্য; এমন জঠর-জ্বালা তো জীবনে অনেকবার জ্বলিয়াছে, কিন্তু খাদ্য দ্রব্য এমন মিষ্ট কখনও লাগে নাই। ইহা যেন বাস্তবিকই সুধা। এমন আহার জীবনে আর কখনও করি নাই, জীবনে আর কখনও ঘটিবে কিম্বা তাহাও জানি না। তাহার পর যখন অর্জ্জুন ঠাকুরের

আমড়ার অম্বল জিহ্বায় একটু একটু করিয়া দিতে লাগিলাম, তখন মনে হইতে লাগিল ক্ষীর, সর, মিষ্টান্ন ও পায়সান্ন ইহার সহিত যেন তুলনা হয় না।

আহারাদির পর আবার আমরা সেই ঝরণার পার্শ্বে প্রস্তরের উপর যাইয়া বসিলাম। কত চিন্তা মনে উদিত হইতে লাগিল। ইচ্ছা ছিল না, এ স্থান ত্যাগ করিয়া যাই। বেলা অপরাহ্ণ হইতে চলিল, ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ান দুই জন ডাকের উপর ডাক দিতে লাগিল। শেষে বলিতে লাগিল, "তোমাদিগকে আজ বাঘে খাইবে, আমাদের দোষ নাই।" অগত্যা সেই বশিষ্ঠ আশ্রম ত্যাগ করিয়া আমাদিগকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেই ঘোড়ার গাড়ীতে আসিয়া বসিতে হইল। তখন সন্ধ্যার অধিক বিলম্ব ছিল না। অশ্বচালকেরা ঘোড়ার উপর অবিরাম চাবুকবৃষ্টি করিতে লাগিল। তাহারা অসহ্য যন্ত্রণায় প্রাণভয়ে আমাদিগকে লইয়া ছুটিতে লাগিল। বশিষ্ঠাশ্রম ছাড়িয়া আসিলাম, স্মৃতিটুকু কেবল বক্ষে করিয়া লইয়া আসিলাম। বশিষ্ঠাশ্রমের স্মৃতি চিরদিন হৃদয়ের সহিত জড়াইয়া থাকিবে।

বাসায় আসিয়া দেখি, অর্জ্জুন ঠাকুর কতকগুলি বড় বড় কাঁঠাল সকলের অগোচরে ছিঁড়িয়া লইয়া আসিয়াছে এবং কতকগুলি "লটকা ফল"ও পাহাড়ের জঙ্গল হইতে সংগ্রহ

করিয়া আনিয়াছে। এই "লটকা ফলগুলি" পাহাড়ের জঙ্গলের মধ্যে ভগবান কাহার জন্য যে সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন, তিনিই বলিতে পারেন। এই ফলগুলি ছোট ছোট "নারেঙ্গা লেবু"র মত। ভিতর শাঁসে পরিপূর্ণ, খাইতে অতি সুস্বাদু। এই ফল খাইয়া মনে হইল, মানুষ অরণ্যের মধ্যে যদি পানীয় ও আহারীয় দ্রব্য না পায়, তবে ফলের উপরই নির্ভর করিয়া এক মাস স্বচ্ছন্দে জীবন ধারণ করিতে পারে। দুইটী লটকা ফল খাইলেই পিপাসা দূর হইয়া যায় ও ক্ষুধার উপশম হয়। পর্ব্বতের বিজন অরণ্যের মাঝে ভগবানের করুণা ছড়ান দেখিয়া চক্ষে জল আসিল। যখন আমরা গৌহাটীর বাসায় আসিয়া পৌছিলাম, তখন রাত্রি নয় ঘটিকা অতীত হইয়া গিয়াছে। আসিয়াই সকলে আমরা শয্যাগ্রহণ করিলাম।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

অদ্য প্রভাতে উঠিয়া ব্রহ্মপুত্র-তীরের বাঁধা রাস্তা দিয়া বহুদূর বেড়াইয়া আসিলাম। আজ প্রাতঃকাল হইতেই সকলে প্রফুল্লিত অন্তরে চন্দ্রনাথ যাত্রার আয়োজনে রত হইয়াছিল। আজ বাস্তবিকই মহানন্দের দিন। নয়টার সময় বেড়াইয়া বাসায় আসিয়া দেখিলাম, তাড়াতাড়ি আহারাদির উদ্যোগ আয়োজনের ধুম লাগিয়াছে। সকলের মুখই আজ প্রফুল্লতামাখান। আহারাদি শেষ হইয়া গেল, জিনিস-পত্র বাঁধা ও গুছান পর্ব্ব আরম্ভ হইল। প্রফুল্লতার মধ্যে কিন্তু আমাকে চিন্তাজালে জড়িত হইতে হইতেছিল। গৌহাটী হইতে চন্দ্রনাথ গমন বড়ই দুরূহ ব্যাপার। পূর্ণ দুই রাত্রি ও এক দিন গাড়ীতে যাইতে হইবে। ছোট ছোট বালকবালিকাদিগকে লইয়া দুই রাত্রি ও এক দিন রেলে থাকা বড় সহজ ব্যাপার নহে। এ পথে কোনও দিন যাই নাই, পথে শিশুদের দুগ্ধ মিলিবে কি না তাহাও জানি না। বাধ্য হইয়া মাষ্টারকে তিনবার ষ্টেশনে পাঠাইলাম। কোথায় কখন গাড়ী বদল করিতে হইবে, কোথায় নামিতে

উঠিতে হইবে, একখানি রিজার্ভ গাড়ীর বন্দোবস্ত হইতে পারে কি না প্রভৃতি অনেক কথাই বুঝাইয়া দিয়া ষ্টেশনে পাঠান হইল। হ্যাটকোটধারী মাষ্টার তিন বারই ঘুরিয়া আসিয়া বলিল, "Allright। ষ্টেশনের একজন ট্রেণ-কর্ম্মচারীর সহিত Friendship করিয়া ফেলিয়াছি। কোনও চিন্তা নাই বাবু, এ সব কাজে আমি পাকা। আমি আপনার আশীর্ব্বাদে অনেক জায়গায় ঘুরিয়াছি।"

কলিকাতা হইতে বহুদূর যাইবার সময় মাষ্টারের অভয় বাণী শুনিয়া বিপরীত ফল পাইয়াছি। সুতরাং এক্ষেত্রে তাহার অভয় বাণী কিরূপ ফল প্রসব করিবে, তাহা দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম।

৫॥০টার সময় লগেজ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি একখানি ঘোড়ার গাড়ীতে বোঝাই দিয়া মাষ্টারকে অগ্রেই ষ্টেশনে পাঠাইয়া দিলাম এবং বলিয়া দিলাম সমস্ত বন্দোবস্তই যেন ঠিক হইয়া থাকে। আমরা ৬॥০টার সময় ষ্টেশনে আসিয়া দেখি গাড়ী আসিয়া ষ্টেশনে দাঁড়াইয়াছে। মাষ্টারকে বলিলাম "গাড়ীর ঘণ্টা পড়িল আপনার সব ঠিক হইয়াছে ত।" মাষ্টার তাহার হ্যাটটী বগলে করিয়া ছড়িটী ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিল "বাবু আমার সেই বন্ধুটীকে দেখিতে পাইতেছি না।"

বড়ই বিরক্তি আসিল। রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম "তাহা হইলে কোনই বন্দোবস্ত হয় নাই বলুন,।" মাষ্টার তাহার টুপিটী ডান হাতে ধরিয়া বলিল "No Sir"

মাষ্টারের "No Sir" কথাটী আমার শরীরে অগ্নিবৃষ্টি করিল ; এখনই গাড়ী ছাড়িয়া যাইবে লগেজ পর্য্যন্ত হয় নাই, কি বিপদেই আজ পড়িতে হইবে তাহা ভগবানই জানেন। মাষ্টারকে কোনও কথা বলা অরণ্যে রোদনমাত্র। একটী টিকিট কলেক্টারকে আমার দুরবস্থার কথা জ্ঞাপন করিলাম। তিনি দয়াপরবশ হইয়া দুই মিনিটের মধ্যে আমার সব বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। কয়েকটী মুদ্রা তাঁহার পকেটে ফেলিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি সকলকে লইয়া গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলাম। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। সে দিন সেই ভদ্রলোকটীর সাহায্য না পাইলে রাত্রে মেয়েছেলেদিগকে লইয়া কত অসুবিধা ও বিপদে যে পড়িতাম, তাহা পাঠকগণকে না বলিলেও চলে।

চারিদিকে বিরাট অন্ধকার। সেই ভীষণ অন্ধকাররাশি মথিত করিয়া গাড়ী ছুটিতে লাগিল। গাড়ীর জানালা দিয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সেই জমাট অন্ধকারের মধ্যে কিছুই দেখিতে পাইলাম না। অন্য কথা

মনে স্থান পাইল না। কেবল মাষ্টারের কথা চিন্তা করিতে করিতে গাড়ীতে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলাম।

অতি প্রত্যুষে যে স্থানে আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল সেটী একটী আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের জংশন ষ্টেশন। এই ষ্টেশনটীর নাম লমডিং। সেই সবে মাত্র উষার আলোক দেখা যাইতেছে। পাহাড়ীয়া পাখীগুলি প্রভাতীসুরে সঙ্গীতের রব তুলিয়াছে। দুইদিকে পাহাড় ও ভীষণ অরণ্য। মধ্যস্থলে ষ্টেশন। এই স্থানে আমাদিগকে গাড়ী বদল করিতে হইবে; প্রায় একঘণ্টা এখানে গাড়ী অপেক্ষা করিবে। যে গাড়ীতে আমাদিগকে যাইতে হইবে সেই গাড়ী হইতে তিনবার গাড়ী পরিবর্ত্তন করিলে তবে চন্দ্রনাথ যাওয়া যাইবে। ভাবিলাম এই সমস্ত লগেজ, জিনিষপত্র লইয়া তিন তিনবার গাড়ী বদল করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। আবার তিনবারই গভীর রাত্রে গাড়ী বদল করিতে হইবে। আমি নানা আশঙ্কায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলাম। বহু অনুসন্ধানের পর অবগত হইলাম লমডিং হইতে রেলওয়ের মালপত্র ও ক্যাস লইয়া দুইখানি গাড়ী বরাবর চন্দ্রনাথ যাইবে। ইহার মধ্যে একখানি মধ্যম শ্রেণীর গাড়ী আছে। এই গাড়ীতে যাইতে পারিলে কোথাও আর change করিতে হইবে না। সমস্ত দিন ও সমস্ত রাত্রি এই গাড়ীতে

বসিয়া থাকিতে হইবে। এই গাড়ী অন্যান্য ষ্টেশনে কাটিয়া দিয়া যাইবে। লমডিংএর ষ্টেশন মাষ্টারকে বলায় তিনি আমাদিগকে এই গাড়ীতে যাইতে অনুমতি দিলেন। আমরা গাড়ীখানি অনুসন্ধান করিয়া তাহাতে গিয়া বসিলাম। আমি যখন ঐ সব কাজে ব্যস্ত, মাষ্টার তখন তাহার টুপীটি বগলে ফুরিয়া চা পানে রত। তখন তাঁহার তিলার্দ্ধের অবসর ছিল না।

আজ এই লমডিং ষ্টেশনে আসিয়া বহুদিনের এক পুরাণ কথা মনে পড়িয়া গেল।

সে বহুদিনের কথা। এই লমডিং ষ্টেশন হইতে কয়েক মাইল দূরে "কপিলী" চা-বাগান। কপিলী চা-বাগানে কয়েক মাস আমি চাকরী করিতে গিয়াছিলাম। তখন আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে বা এই লমডিং ষ্টেশনের কোনও অস্তিত্বই ছিল না। কেবলমাত্র আসাম রেলওয়ে হওয়া কর্ত্তব্য কিনা এই লইয়া কাগজ কলমে লেখালেখি হইতেছিল। আমার বয়স তখন দ্বাবিংশ বর্ষ। সেই মাত্র লেখাপড়া ত্যাগ করিয়াছি। যৌবন গর্ব্বে তখন কত নব নব আশা হৃদয়ে উঠিতেছে। কত অনুরাগ কত বিরাগ পলে পলে হৃদয়ে উঠিতেছে, আবার লয় প্রাপ্ত হইতেছে। তখন চাকরী কি বস্তু ও কেমন করিয়া চাকরী

করিতে হয় তাহা জানিতাম না। জগজ্জয়ী আশা লইয়া তখন আমার জন্মভূমিতে কেবল বেড়াইয়া বেড়াইতাম। জননী তখন সংসারের সর্ব্বে সর্ব্বা। সংসারের ভাবনা চিন্তা আমার কিছুই ছিল না।

আমার এক জ্ঞাতি জ্যেষ্ঠতাত পুত্র আসামের চাবাগানে কেরাণীগিরি করিতে আসিয়া তিনি তখন লক্ষপতি হইয়াছেন। কয়েক বৎসর হইল তিনি এই কপিলী চা-বাগানের ম্যানেজার হইয়াছেন। চা বাগানে আট দশখানি দোকান খুলিয়াছেন এবং অফিংয়ের ব্যবসায় এক চেটে করিয়াছেন; মা লক্ষ্মী শতদ্বার দিয়া তখন অর্থ তাঁহার গৃহে প্রেরণ করিতেছেন। সেই সময়ে তিনি আমার জননীকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন সে পত্রখানি আমার প্রথম চাকরীর স্মৃতি বলিয়া সেদিন পর্য্যন্ত আমার কাছে রাখিয়া দিয়াছিলাম। সে পত্রখানির সার মর্ম্ম এই:—

"খুড়ীমা, ছেলেবেলায় আমার প্রতি আপনার স্নেহ এই বার্দ্ধক্যেও বিস্মৃত হইতে পারি নাই। বাল্যের ভালবাসায় স্মৃতি মানুষ বুঝি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও বিস্মৃত হইতে পারে না। রামপদর কিছু একটা করিয়া দিবার জন্ম আপনি আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন; শুনিলাম রামপদ লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়াছে। অতএব তাহাকে আমার কাছে

শীঘ্র পাঠাইয়া দিবেন, আমি এখানে থাকিতে থাকিতে তাহার একটী ভাল চাকরী করিয়া দিয়া যাইব। আমি কয়েক মাসের মধ্যেই এই কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতেছি।

প্রণতঃ—

(স্বাক্ষর) শ্রীবেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়।

পত্রখানি পাইয়া মা আমাকে আসাম যাইতে অনুমতি দিলেন। একটী শুভ দিন দেখিয়া মায়ের পদধূলি মস্তকে গ্রহণ পূর্ব্বক আসাম যাত্রা করিলাম। যাইবার সময় মা আমার শতবার মুখচুম্বন করিলেন, বিল্বপত্র, আতপ চাউল, সিদ্ধি, কাপড়ে বাঁধিয়া দিয়া অজস্রধারে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মায়ের সেই অশ্রু আজও মনে হইলে হৃদয় ফাটিয়া যায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি তখন আসামে রেলগাড়ী হয় নাই। ষ্টীমার ও গরুর গাড়ীতে একাদশ দিবসে আমি আসামে দাদার নিকট উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম দাদার বাসায় প্রকৃতই অন্নসত্র। পুলিশ ডিপার্টমেণ্ট, ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট, পোষ্টাল ডিপার্টমেণ্ট ইত্যাদি বিভাগের কর্ম্মচারী যে যখন সেদিকে পরিদর্শনে গমন করেন তাঁহারা দাদার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। যে কোন বাঙ্গালী চাকরী উদ্দেশ্যে আসাম যাইত, যত দিন না তাহার চাকরী হইত

দাদার বাসায় আত্মীয়ের ন্যায় আদর যত্ন লাভ করিত। ইহা ব্যতীত দেশে কোনও পূজা তাঁহার বাড়ীতে বাদ যাইত না। দুর্গাপূজা, কালীপূজা, লক্ষ্মীপূজা প্রভৃতি সকল পূজাই তাঁহার বাড়ীতে হইত। তিনি তিনশত টাকা মাসিক বেতন পাইতেন কিন্তু ৫০০৲ টাকার অধিক তাঁহার বাসা খরচে ব্যয় হইয়া যাইত।

দাদার উপার্জ্জনের পন্থা নানারূপ ছিল। তাঁহার অধীনে প্রায় চার পাঁচ হাজার কুলী ছিল। ইহা ব্যতীত লালং কাছাড়ী মিকির প্রভৃতি জঙ্গলী কুলীও দৈনিক তিন চারিশত চা বাগানে কার্য্য করিতে আসিত। দাদা এই চা বাগানে দুই তিনখানি দোকান খুলিয়া রাখিয়াছিলেন। চাউল, ডাউল, লবণ, তৈল, কাপড় এক কথায় জুতা ছাড়া কুলীদের ব্যবহারোপযোগী সমস্ত জিনিসই দোকানগুলিতে থাকিত।

দোকানের জিনিস যে যাহা চাহিবে, তাহাই কুলীদিগকে দিবার জন্ত কর্ম্মচারীদের উপর দাদার আদেশ ছিল। মাসকাবারে বা সপ্তাহান্তে যেদিন কুলীরা বেতন পাইত, দোকানের কর্ম্মচারীরা কুলীদের নামে নামে দেনার ফর্দ্দ আফিসে হাজির করিত। এদিকে নাম ডাকিয়া ডাকিয়া ক্যাসিয়ার যেমনি কুলীদিগকে বেতন দিত, অমনি দোকানের

কর্ম্মচারীরা ঠিক তত টাকাই দেনা দেখাইয়া কুলীদের নিকট
হইতে টাকাগুলি গ্রহণ করিত। কুলীরা তাহাদের মাথার ঘাম
পায়ে ফেলিয়া যে বেতন পাইত, তাহা এক ঘণ্টার জন্ত নাড়া
চাড়া করিয়া বেতন প্রাপ্তির সুখানুভবও করিতে পাইত না।
গরীবের এই প্রকারে রক্তশোষণ করিয়া দিন দিন তাঁহার
শ্রীবৃদ্ধি হইতেছিল।

একদিকে দাদার কারবারের আয় যথেষ্ট ছিল; অন্তদিকে
চা-বাগান হইতেও অনেক অর্থ দাদার লোহারসিন্দুকে
যাইয়া প্রবেশ করিত। চা-বাগানের যাহা কিছু প্রয়োজন
হইত, বাগানের ঝুড়ী, কাঁচি, ছোরা, ঔষধ প্রভৃতি সমস্তই
দাদা নিজ তত্ত্বাবধানে ক্রয় করিতেন। অপরে দালালী
দস্তরী না লইতে পারে, সে বিষয়ে তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল।
এক কথায় তিনি নানা দিক দিয়া যেরূপে অর্থ উপার্জ্জন
করিতেন, সৎকার্য্যে তদ্রূপ ব্যয়ও করিতেন।

আমি দাদার নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি আমাকে
স্নেহভরে গ্রহণ করিলেন। আসামে আসিবার পূর্ব্বে
তাঁহার খুব দৈন্তাবস্থা ছিল। সেই সব দুঃখের দিনের তিনি
আমার কাছে কতই গল্প করিতেন।

কয়েক দিন পরেই তিনি আমাকে তাঁহার সহকারী
করিয়া লইলেন। তাঁহার সাহেবকে আমার জন্ত অনুরোধ

করিয়া যে পত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন, সেই পত্রখানি আমাকে হাসিতে হাসিতে দেখাইলেন।

চাকরীটী ভাল হইলেও, আমার কিন্তু ভাল লাগিল না। বাল্যকাল হইতেই আমার ইচ্ছা, স্বাধীন ব্যবসা করিয়া উন্নতি লাভ করিব। এই জন্যই বোধ হয় চা-বাগানে কার্য্য করিতে আমার ভাল লাগিল না। আমি অধিকাংশ সময়েই "কপিলী নদীর পরপারের দিকে চাহিয়া উদাস প্রাণে বসিয়া থাকিতাম এবং গৃহ হইতে বিদায়কালীন মায়ের সেই অশ্রুবারি সর্ব্বদা স্মরণ করিতাম।

হায় কপিলী নদী! তোমার স্মৃতি এখনও আমি ভুলিতে পারি নাই। তোমার সেই পরপারের ধূ ধূ বালুকারাশি—তোমার পরপারের সেই বিজন অরণ্য—বালুকারাশির উপর হরিণ শিশুদিগের অবাধ ক্রীড়া আজও আমার চক্ষুর সম্মুখে যেন ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

দাদার বাঙ্গালার অনতিদূরেই জঙ্গলের মধ্যদিয়া এই কপিলী নদী প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। শুনিয়াছিলাম, এই কপিলীনদী ব্রহ্মপুত্রে যাইয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছে। প্রতিদিন অপরাহ্নে এই কপিলী নদীর তীরে গিয়া বসিয়া থাকিতাম। কলকল রবে কপিলীনদী বহিয়া যাইত। কপিলীর ওপারে বালুকরাশি ধূ ধূ করিত। বর্ষায় সেই

বালুকারাশি ডুবিয়া কপিলী ভীষণ আকার ধারণ করিত। বালুকারাশির পরেই ভীষণ জঙ্গল। শুনিয়াছিলাম, Forest Department তখনও সেই ভীষণ জঙ্গল জরিপ করিয়া সীমাবদ্ধ করিতে পারে নাই। কপিলীনদীর তীর হইতে সোজাভাবে একজন লোক কয়েকদিন অহোরাত্র অবিশ্রান্ত যদি হাঁটিয়া যায় তবুও জঙ্গলের শেষ সীমায় পৌছিতে পারিত না।

অপরাহ্ণে কপিলীর সেই ধূ ধূ বালুকারাশির দিকে আমি চাইয়া থাকিতাম। যৌবনের নব নব আশায়, নব নব চিন্তায় হৃদয় উদ্বেলিত হইত। যখন সেই বালুকারাশির উপর হরিণ শিশুগণ লাফাইয়া লাফাইয়া খেলা করিত, তখন মনে হইত সন্তরণে কপিলীনদী পার হইয়া হরিণ শিশুগুলিকে ধরিয়া আনি। এক একদিন পরিহিত বস্ত্র কটীদেশে সজোরে বন্ধন করিয়া আবেগভরে কপিলী-নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িতাম। স্রোতে কতদূর ভাসিয়া যাইতাম, আবার সন্তরণ কৌশলে উজান বাহিয়া পুনরায় তীরে উঠিতাম। কপিলীর পর পারে যাইতে পারিতাম না। আজ সেই অতীতদিনের যৌবনসুলভ উত্তম, উৎসাহ মনে পড়িতে লাগিল। হায়! কোথায় কবে তাহাদের অজ্ঞাতসারে হারাইয়া ফেলিয়াছি, তাহার সন্ধান এ জীবনে

বুঝি আর করিতে পারিব না। কপিলী যেন আমার প্রবাস-জীবনের আনন্দময়ী সঙ্গিনী ছিল। তাহার বক্ষে পড়িয়া অবাধে সন্তরণ করিতে কোন দিন মনের মধ্যে ভুলিয়া আশঙ্কার ছায়াটী পর্য্যন্ত পড়ে নাই। কপিলী যেন আমার উদ্দাম যৌবনের সুখদুঃখের সহিত তাহার আনন্দ-উৎসাহ হর্ষ-বিষাদ সমস্ত মিলাইয়া দিয়া এক হইয়া গিয়াছিল। আজ মনে পড়ে, মানুষের জীবনে বোধ হয় এমন শুভমুহূর্ত্ত বুঝি একবারই আসে, যখন সে তার সমস্ত বন্ধন বিস্মৃত হইয়া প্রকৃতিকে ভালবাসিতে পারে। তাই আজ এই বার্দ্ধক্যের দিনে যৌবনের সে সব কথা স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতেছে।

"নালুসর্দ্দারের" স্ত্রী "কৈলি" আমাকে বড় ভালবাসিত। কৈলিকে আমিও খুব ভালবাসিতাম। কৈলি চা-বাগানের কুলি হইয়া আসামে চালান গিয়াছিল বটে, কিন্তু, সে একদিন গৃহস্থ ঘরের বধূ ছিল।

কৈলির পিতা মাতা প্রদত্ত নাম ছিল "শৈলবালা"। "শৈলবালা" হইতে "শৈলি," এবং "শৈলি" হইতে বোধ হয় চা-বাগানে তাহার নাম শেষে দাঁড়াইয়াছিল "কৈলি"। কৈলিকে আড়কাটিরা বিষ্ণুপুরের দুর্ভিক্ষের সময় নানা প্রলোভন দেখাইয়া চা-বাগানের কুলী করিয়া আনিয়াছিল।

চা-বাগানে আসিবার কিছুদিন পরে নালুসর্দ্দারের সহিত তাহার বিবাহ হয়। কৈলি জাতিতে কৈবর্ত্ত ছিল। তাহার এক ভগ্নী ও ভগ্নীপতি ছাড়া এ সংসারে কেহ ছিল না। কৈলির গুণধর ভগ্নীপতি অর্থলোভে তাহাকে 'আড়কাটির' হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন।

কৈলিকে নালুসর্দ্দার খুব ভালবাসিত। কৈলিও নালু সর্দ্দারকে সম্পূর্ণ করায়ত্ত করিয়া লইয়াছিল। নালুসর্দ্দার যাহা উপার্জ্জন করিত, প্রথম প্রথম মদ খাইয়া উড়াইয়া দিত; কৈলি ধমক দিয়া তাহাকে মদ ছাড়াইয়াছিল। কৈলির কথা ছাড়া নালুসর্দ্দার নিজের ইচ্ছায় কিছুই করিতে পারিত না।

অপরাহ্নে আমি যখন কপিলীনদীর তীরে বসিয়া পরপারে হরিণশিশুর ক্রীড়া দেখিতাম, তখন এক একদিন কৈলি তাহার দুই বৎসরের শিশুপুত্রটীকে বুকে লইয়া আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইত। দেশের সুখদুঃখের কত কথাই সে কহিত। এক একদিন মনের দুঃখে সে কাঁদিয়া ফেলিত। আমি তাহাকে কত প্রকারে সান্ত্বনা প্রদান করিতাম। সে আমাকে দাদা বলিয়া সম্বোধন করিত। নিঃসহায় চা-বাগানের মধ্যে সে আমাকে একজন তাহার স্বদেশবাসী আপনার লোক বলিয়া মনে করিত।

আমি যখন কপিলী চা-বাগান হইতে চলিয়া আসি, দুইদিন পূর্ব্ব হইতেই কৈলি বালিকার মত আমার সম্মুখে বসিয়া কেবল রোদন করিয়াছিল।

অনিচ্ছাস্বত্বে তিক্তঔষধ গলাধকরণের ন্যায় ছয় মাস আমি কপিলী চা-বাগানে ছিলাম। অধিকাংশ সময়েই আমি জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। আকাশের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতাম। পরমারাধ্যা জননীর জন্ত চক্ষের জল ফেলিতাম। কপিলীনদীর তীরে বসিয়া হরিণশিশুর আনন্দক্রীড়া দেখিতাম এবং কৈলির সঙ্গে কতই সুখদুঃখের কথা কহিতাম। ইহাই আমার ছয় মাসের দৈনন্দিন চাকরীর কার্য্য ছিল।

একদিন বিরক্ত হইয়া দাদা বলিলেন "তোমার কার্য্যে কিছুমাত্র মন নাই। আমি অবসর গ্রহণ করিলে, তুমি কি করিয়া এখানে চাকরী করিবে?

"আমিও চলিয়া যাইব।" সজলনেত্রে ভয়ে ভয়ে দাদাকে বলিলাম "আমিও চলিয়া যাইব।"।

আশ্চর্য্য হইয়া দাদা বলিলেন "তোমাকে এমন ভাল চাকরী করিয়া দিলাম, তুমি চাকরী করিবে না। আমি বলিলাম—

"না—"

"তবে তুমি কি করিবে?" আমি একটু জোর গলায় বলিলাম "চাকরী করিবার ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি আমার নাই। আমি ব্যবসা করিব।"

আমার দৃঢ়তা দেখিয়া দাদা আর আমায় কিছু বলিলেন না। ইহার অল্পদিন পরেই আমি চাকরীত্যাগ করিয়া দেশে চলিয়া আসিলাম।

লিখিতে অনেকটা সময় লাগিল বটে কিন্তু লামডিং ষ্টেশনে গাড়ীতে বসিয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই এই পূর্ব্ব স্মৃতিগুলি আমার মনোমধ্যে উদিত হইয়াছিল। কতক্ষণ এই সব পূর্ব্বস্মৃতি মনোমধ্যে উদিত হইয়া আমাকে বাহ্যজ্ঞান হারা করিয়া রাখিয়াছিল তাহা জানি না। যখন ষ্টেশনের কুলীরা সজোরে হাঁকিল "হাতিখালী" তখন আমার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

আসাম-বেঙ্গল-রেলওয়ের এই হাতিখালি ষ্টেশনটী ভীষণ জঙ্গলের মধ্যস্থলে অবস্থিত। জঙ্গল মধ্য হইতে "হুয়াহু হুয়াহু" অহরহঃ উল্লুকের ডাক শোনা যাইতেছিল। আমার মধ্যম পুত্র "বচু" উল্লুক ধরিবার জন্য গাড়ীর মধ্যে আহ্লাদে তাণ্ডবনৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল। পর্ব্বত উপরিস্থিত জঙ্গলে কত রঙ্গের পাহাড়ে পাখী দেখিতে পাইলাম। একটী পাখী দেখিলাম, মুখটী কাল, পুচ্ছটী কাল, গাটী লাল। গাড়ী ছুটীতে ছুটীতে ঘোর অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করিল। কেহ কাহারও মুখ দেখিতে পাইলাম না। "বচু" আনন্দে চীৎকার করিতে লাগিল। এই অন্ধকারের মধ্য দিয়া আমরা একটী টনেল পার হইয়া গেলাম। উপরে পাহাড়, চারিদিকে পাহাড়, মধ্যে পাহাড় কাটিয়া রেলরাস্তা গিয়াছে।

কিয়ংক্ষণ পরে গাড়ী লামাটিং ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল। এই ষ্টেশনটী পার হইয়া কিয়ংদূর যাইতে না যাইতে, আবার একটী টনেলের মধ্যে গাড়ী প্রবেশ করিল।

আবার সেই জমাট অন্ধকার। গাড়ীর মধ্যে সকলেই একসঙ্গে বসিয়া আছি বটে, কিন্তু কেহ কাহারও মুখ দেখিতে পাইতেছি না। মনে হইল আমরা অমাবস্যার সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্য দিয়া কোথায় যেন ছুটিয়া চলিয়াছি। উপরে গাছপালা, ভীষণ জঙ্গল। হরিণ ব্যাঘ্র ও ভল্লুক সেই জঙ্গলে বিচরণ করিতেছে। আর সেই পাহাড়ের মধ্য দিয়া মানুষ রেলের উপর বসিয়া রহিয়াছে, রেল পবন গতিতে ছুটিতেছে। গাড়ী হইতে অন্যান্য আরোহীরা বারবার বলিতে লাগিল "ধন্য ইংরাজ-বাহাদুর, ধন্য তাহাদের বুদ্ধি।"

কয়েক মিনিট গাড়ী ছুটীতে না ছুটীতে আবার একটী টনেলের মধ্যে গাড়ী প্রবেশ করিল। আবার সেই জমাট অন্ধকার। আবার সেই ছেলেদের আনন্দোৎফুল্লহৃদয়ের চীৎকার ধ্বনি।

বহুক্ষণ গাড়ী ছুটিবার পর আমরা "মুপা" ষ্টেশনে আসিয়া পড়িলাম। এই ষ্টেশনটীর দুইদিকে পাহাড়, জঙ্গলের মধ্যে ষ্টেশন মাষ্টারের অফিস। এই ষ্টেশনটী পার হইয়া গাড়ী যতই ছুটিতে লাগিল, ততই নিবিড় জঙ্গল দেখিতে পাইলাম। যাইতে যাইতে কখনও দেখিলাম দুইদিকে পাহাড়, কখনও একদিকে পাহাড়, একদিকে জঙ্গল। কোনও স্থানে দেখিলাম, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় একসঙ্গে মিলিত হইয়া সেই স্থানটীকে

যেন পাহাড়ের দেশ করিয়া তুলিয়াছে। দেখিলে মনে হয় যেন অনেক পাহাড় প্রতিবেশীর সহিত মিলিত হইয়া একসঙ্গে তথায় বাস করিতেছে। ইহার পরে আবার টনেল পাইতে আবার সেই পূর্ব্বের ন্যায় ঘন অন্ধকার মধ্যে পতিত হইলাম, আবার গাড়ীর মধ্য হইতে কোলাহল উথিত হইতে লাগিল। এইরূপে একে একে আমরা ভীষণ জমাট বাঁধা অন্ধকারের মধ্য দিয়া পাঁচটি টনেল অতিক্রম করিলাম।

গাড়ী বহুক্ষণ ছুটিবার পর আমরা "মৈবং" ষ্টেশনে পৌছিলাম। এই ষ্টেশনটিরও দুই দিকে পাহাড়; পাহাড়ের মধ্যস্থানে ষ্টেশন এবং চারিদিক জঙ্গলে পূর্ণ। ইহার পর আমরা "দাওতেহাইয়া" ষ্টেশন পার হইলাম। এই ষ্টেশনের পর আমরা ষষ্ঠ সপ্তম অষ্টম নবম একাদশ টনেল পার হইলাম। যখন আমরা একাদশ টনেল পার হইতেছিলাম তখন সকলের দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়া ছিল। এইটী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ টনেল। এই টনেলটী অতিক্রম করিতে বহুক্ষণ সময় লাগিল। আমার মস্তিষ্ক দুর্ব্বল ও শরীর রুগ্ন, তাহার উপর বাষ্পের ধূম নাসিকারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া আমাকে অজ্ঞানের মত করিয়া দিয়াছিল। প্রতিমুহূর্ত্তেই আমার চেতনা নষ্ট হইবার উপক্রম হইতে লাগিল। এরূপ

বড় টনেল এ পর্য্যন্ত দেখি নাই। যখন উহা পার হইয়া বাহিরে আসিলাম তখন আমারা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। ইহার পর আমরা "মাহুর" ষ্টেশনে আসিলাম। এতক্ষণ পরে এই মাহুর ষ্টেশনে পাঁচ ছয়টী প্যাসেঞ্জার গাড়ীতে উঠিতে দেখিলাম, আমরা এত গুলি ষ্টেশন পার হইয়া আসিলাম; ইহার মধ্যে কোনও ষ্টেশনেই লোককে উঠা নামা করিতে দেখিলাম না। দুর্গম পাহাড়ের মধ্য দিয়া রেলপথ যাইতে দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষ কত অর্থ; কত কষ্ট স্বীকার করিয়া যে এই রেলপথ প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই মাহুর ষ্টেশনটী বদরপুর জেলার অধীন। ইহার পর আমরা ক্রমান্বয়ে দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ পঞ্চদশ ও ষষ্ঠদশ টনেল অতিক্রম করিয়া গেলাম। এইবার অষ্টাদশ টনেলের ভিতর প্রবেশ করিলাম। এই টনেলটী অন্যান্য টনেল অপেক্ষা বড়; তবে যে টনেলটী পার হইতে আমাদের শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল, ইহা তত বড় নয় তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ ছোট।

ইহার পর আমরা Lows Haflong ষ্টেশনে আসিলাম। এখানে দেখিলাম, সাহেবদের একটী Refreshment Room আছে। তজ্জন্য গাড়ী অনেকক্ষণ এখানে দাঁড়াইল, তবে

দুঃখের বিষয় এই ট্রেণে একটী সাহেবকেও দেখিলাম না। এই ষ্টেশনের পর আমরা উনবিংশ, বিংশ একবিংশ, দ্বাবিংশ, ত্রয়োবিংশ টনেল পার হইলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে আরও দুইটী টনেল পার হইয়া মোট ২৪টী টনেল পার হইয়া আসিলাম। আসিতে আসিতে এ, বি, রেলওয়ের বিচিত্র ব্যাপার দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে লাগিলাম। যতদূর রেলপথ ছুটিতেছে কেবল পাহাড়ের মধ্য দিয়া ছুটিতেছে। কোনও স্থানে দুই দিকে পাহাড়; কোনও স্থানে সম্মুখে পাহাড়। মধ্যভাগ দিয়া গাড়ী ছুটিতেছে। কোনও স্থানে পূর্ব্বপশ্চিম উত্তরদক্ষিণ চারিদিকেই পাহাড়। আসামবেঙ্গলরেলওয়ের এই টনেলগুলি দেখিবার জিনিষ। একসঙ্গে এত টনেল আর কোনও রেলপথে আছে কি না, জানি না। এই রেলপথের আরও অপূর্ব্ব ব্যাপার এই যে, যেখানে যেখানে রেলপথের উপর ঝরনা নামিয়াছে, সেই সেই স্থানেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে, সুতরাং এই রেলপথের জন্য কত টাকা যে ব্যয় করিতে হইয়াছে, তাহা ধারণাতীত।

আমরা যথাক্রমে ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩টি টনেল পার হইলাম। যখন গাড়ী এই টনেলের মধ্য দিয়া ছুটিতেছিল তখন আমার মনে হইল ইঞ্জিন শত শত পর্ব্বত

ভেদ করিয়া নিজের পথ পরিষ্কার করিয়া যেন চলিয়াছে। আমরা মোট ৩৬টি টনেল পার হইবার পর "দামচেরা" ষ্টেশনে আসিলাম। এই স্থানে দেখিলাম একটি বৃহৎ চ-বাগান, কুলী-বস্তি এবং একটি টেলিগ্রাফ অফিস। সাহেবদের বাড়ী, চা-বাগান বড়ই মনোরম দেখাইতেছিল। ইহার পর আমরা চন্দ্রনাথপুর ষ্টেশনে আসিলাম, এখানেও সুন্দর সুন্দর চা-বাগান দেখিতে পাইলাম। আমরা একে একে আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে ৩৭টি টনেল গণনা করিয়াছিলাম। আরও টনেল আছে কি না তাহা জানি না।

অপরাহ্নে আমাদের গাড়ী বদরপুর ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিল। এই বদরপুরে আমাদের গাড়ী বদল করিতে হইত, কিন্তু আমাদের গাড়ী কাটিয়া মেলে জুড়িয়া দিল। এই বদরপুর ষ্টেশন পার হইবার পর আর আমরা পাহাড় দেখিতে পাইলাম না। বুঝিলাম আসামের পাহাড়ে দেশ-জঙ্গল রাজ্য পার হইয়া এইবার সমতল ভূমিতে আসিলাম। দুইদিকে কেবল জলাভূমি। ছোট ছোট চারা ধান গাছগুলি এই জলাভূমিতে বড়ই শোভা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। এখন আমরা আসাম প্রদেশ ত্যাগ করিয়াছি। যে স্থান দিয়া গাড়ী ছুটিতেছে, ইহা শ্রীহট্ট জেলার অধীন। যেদিকে চাই, সেইদিকেই হরিৎবর্ণ ক্ষেত্র নয়নগোচর হয়।

দেখিলেই মনে হয় প্রকৃতি-রাণী ঠিক যেন হরিৎবর্ণের আসন পাতিয়া রাখিয়া দিয়াছেন।

রাত্রি তিনটার সময় আমরা Laksami ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিলাম। এখানে কতকগুলি চায়ের দোকান দেখিলাম। মাষ্টার আকণ্ঠ পূর্ণ করিয়া চা-পান করিল। এই ষ্টেশনটীর সুখ্যাতি মাষ্টারের মুখে আর ধরে না। বলিল "বাবু যত ষ্টেশন পার হইয়া আসিলাম সর্ব্বাপেক্ষা এই ষ্টেশনটি বড় সুন্দর। এ, বি রেলের যদি সব ষ্টেশনগুলি এরূপ সুন্দর হইত, তবে চায়ের অভাবে এত কষ্ট পাইতে হইত না।' এই ষ্টেশনেও আমাদিগকে গাড়ী বদল করিয়া অন্য গাড়ীতে উঠিতে হইত, কিন্তু এখানেও আমাদের গাড়ী কাটিয়া সীতাকুণ্ডের গাড়ীতে জুড়িয়া দিল। আমরা উঠা নামার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলাম।

পরদিন সকাল ৬৷৷০ টার সময় আমরা সীতাকুণ্ড-ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিলাম। পূর্ণ দুইরাত্রি ও একদিন গাড়ীতে থাকিবার পর সীতাকুণ্ড-ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া সকলের মুখেই হাসি দেখা দিল। আমরা যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। সীতাকুণ্ড-ষ্টেশনে অবতরণ করিবার পর "মহাভারত পাণ্ডার কনিষ্ঠ পুত্রের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। মহাভারতের পুত্র আমাদিগকে খুব যত্নে রাখিবেন

প্রতিশ্রুত হইলেন। সুতরাং তাহার সঙ্গেই আমরা মহাভারত পাণ্ডার বাসায় যাইয়া উঠিলাম। মহাভারতপাণ্ডা আমাদিগকে একটী দ্বিতল ঘরে বাসা দিলেন।

মহাভারতপাণ্ডাকে দেখিয়া আমার ভক্তির উদ্রেক হইল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বড়ই অমায়িক, কথাবার্ত্তা বিনয় মাখান। ব্রাহ্মণ ত্রিসন্ধ্যা ব্যতীত জল গ্রহণ করেন না। আমি অনেক তীর্থে ঘুরিয়াছি, কিন্তু পাণ্ডাদের আচারব্যবহারের জন্য কোনও পাণ্ডাকে কখনও মস্তক নত করিয়া প্রণাম করি নাই। কিন্তু এই বৃদ্ধ মহাভারত পাণ্ডার কাছে সেদিন আমি মস্তক নত করিয়াছিলাম। পথে নানারূপ অনিয়ম অত্যাচারের জন্য আমার দেড় বৎসরের কনিষ্ঠ পুত্রটীর ভীষণ আমাশয় দেখা দিয়াছিল। মহাভারতপাণ্ডা তখনই ডাক্তার আনিতে লোক পাঠাইয়া দিলেন এবং বারবার আমার কনিষ্ঠ পুত্রটীর মঙ্গল কামনা করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

আমরা দুইরাত্রি ও একদিন রেলগাড়ীতে প্রায় অনাহার ও অনিদ্রাতেই ছিলাম সুতরাং এইদিন আসিয়া আমরা সম্পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ করিলাম। অন্য কোথাও যাইলাম না। কেবল অপরাহ্নে মহাভারতপাণ্ডার জ্যেষ্ঠপুত্রের সহিত বাজারের দিকে একটু বেড়াইয়া আসিলাম। দেখিলাম, বাজারে চট্টগ্রামবাসিগণ কেনা-বেচা করিতেছে।

ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ।

৯ই আষাঢ় মঙ্গলবার প্রভাতে উঠিয়া দুইখানি গোশকটে আমরা বাড়বানল দর্শনের জন্ম রওয়ানা হইলাম। এখান হইতে বাড়বানল রেলগাড়ীতেও যাওয়া যায় এবং গো-যানেও যাওয়া যাইতে পারে। রেলগাড়ীর ভাড়া মাত্র তিন পয়সা। আমরা রেলগাড়ীতে স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাদিগকে লইয়া যাওয়া সুবিধা বিবেচনা করিলাম না। তিন টাকায় দুই খানি গো-শকট ভাড়া করিলাম। মহা-ভারতপাণ্ডার বাড়ী হইতে বাড়বানল প্রায় পাঁচ মাইল। রাস্তার দুইপার্শ্বে পর্ব্বতশ্রেণী মস্তক উন্নত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

গাড়োয়ান দুইজন কিয়দ্দূর যাইয়াই চট্টগ্রামী ভাষায় গান গাহিতে আরম্ভ করিল। একে চট্টগ্রামের গ্রাম্য ভাষা—তাহার উপর মুসলমান গাড়োয়ানের গান, সোনায় সোহাগা হইল, আমি ইহার একবর্ণও বুঝিতে পারিলাম না। কেবল এক অভিনব সুর কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। আমরা শকটের উপর বসিয়া দুইপার্শ্বে সবুজবন, ধান্যক্ষেত্র দেখিতে দেখিতে, অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এরূপ ধান্যক্ষেত্র

আর কোথাও দেখি নাই। ধান্যক্ষেত্র দেখিয়া মনে হইল বাস্তবিকই এই স্থান কমলার চির আবাসভূমি।

আমি যে গাড়ীতে যাইতেছিলাম, সেই গাড়ীর গাড়োয়ানের নাম "আমীরহোসেন"। যাইতে যাইতে, পথের সঙ্গী আমীরহোসেনকে তাহার ঘরকন্নার কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। আমীরহোসেন আধা চট্টগ্রামী ও আধা বাঙ্গালাভাষায় তাহার ঘরের কথা বলিতে লাগিল জিজ্ঞাসা করিলাম "আমীরহোসেন তুমি এমন বাঙ্গালা ভাষা বলিতে শিখিলে কোথা হইতে?" সে বলিল, "বা[illegible] আপনাদেরই মত ভদ্রলোককে গাড়ী করিয়া লইয়া যাওয়াই[illegible] আমার ব্যবসা, আপনাদের কথোপকথন শুনিয়াই, আমি একটু একটু বাঙ্গালা বলিতে শিখিয়াছি।" সে আর[illegible] বলিল "আমি কেবল এই গাড়ীরই কাম করি বাবু"—

আমার নানাবিধ প্রশ্নের উত্তরে আমীরহোসেন বলিতে লাগিল, "আমার বাবার তিন বিবাহ। এবার আমা[illegible] মাসীকে সাদী করেছেন। আমি প্রথম সন্তান; এ[illegible] আর আমরা বাবাকে খাটিতে দিই না, গাড়ী চালাই যাহা উপায় করি সব লইয়া গিয়া বাবার হাতে দি। বা[illegible] আমাদিগকে খেতে দেন, কাপড় কিনিয়া দেন, আর য[illegible]

কিছু দরকার হয় তাহাও তিনি দেন; আমাদের হাতে পয়সা রাখবার বাবার হুকুম নাই। তেনার হুকুম মত আমাদিগকে চলতে হয়।”

আমি বলিলাম “তুমি ত খুব তোমার বাবাকে ভক্তি কর—আমীরহোসেন।”

আমীরহোসেন তাহার দীর্ঘ জিহ্বার অর্দ্ধাংশ বাহির করিয়া দুই দন্তপংক্তির দ্বারা কামড়াইয়া বলিতে লাগিল, “ভক্তি কর্ব্বো না বাবু, তেনা হতে আমরা পৃথিবী দেখিয়াছি; বাপ গুরুজন, আপনাদের হুাবতার সমান।”

অশিক্ষিত গাড়োয়ান আমীর-হোসেনের কথা শুনিয়া আমার বড়ই আনন্দ হইল। মনে হইল বহু শিক্ষিত ভদ্র সন্তান অপেক্ষা অশিক্ষিত আমীরহোসেনের পিতৃভক্তি উল্লেখযোগ্য নয় কি?

আমীরহোসেনের সহিত কথা কহিতে কহিতে, গাড়ী একটী পাহাড়ের ধারে যাইয়া দাঁড়াইল। আমীরহোসেন বলিল “এখান হইতে বাড়বানল অর্দ্ধমাইলেরও কম; আর গাড়ী যাইবার রাস্তা নাই, আপনারা হাঁটিয়া চলিয়া যান। আমি এইখানে আপনাদের জন্ম গাড়ী লইয়া থাকিব।”

মনের আনন্দে আমরা “বাড়বানলকুণ্ডের” দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। পূর্ব্বদিকে মনোহর প্রাকৃতিক

দৃশ্যাবলী দেখিতে দেখিতে আমরা অল্পক্ষণ মধ্যেই বাড়বানল কুণ্ডে আসিয়া পৌঁছিলাম।

আমাদের সহিত "শরৎঠাকুর" বলিয়া পুরোহিত আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "বাসী-কুণ্ডে" অগ্রে স্নান করিতে হইবে। বাড়বানল কুণ্ডের জল বাহির হইয়া আসিয়া এই কুণ্ডে পড়িতেছে, এই জন্যই বোধ হয় ইহাকে বাসীকুণ্ড বলে। আমরা সকলে অগ্রে বাসীকুণ্ডে একে একে স্নান করিয়া পরে বাড়বানলকুণ্ডে স্নান করিলাম। বাড়বানলকুণ্ডের মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র প্রাণে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদয় হইল। ভগবানের অপার মহিমা দেখিয়া বারবার তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিলাম। বাড়বানলকুণ্ডের প্রজ্বলিত অগ্নির শোঁ শোঁ শব্দ এক অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য। আমরা কুণ্ডে অবতরণ করিয়া স্নান করতঃ অগ্নিশিখা স্পর্শ করিলাম। শিখা স্পর্শ করিবামাত্র লোলজিহ্বা অগ্নি আমাদের হাতের উপর আসিয়া জ্বলিতে লাগিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! হাতে আদৌ তাপ লাগিল না বা পুড়িল না। ভগবানের কি অনির্ব্বচনীয় লীলা। সেই অগ্নি জলের উপর দিয়া শোঁ শোঁ শব্দে জ্বলিয়া আসিতেছে। কুণ্ডটী যদিও অন্ধকারময়, কিন্তু সেই প্রজ্বলিত অগ্নিতে গৃহের অন্ধকাররাশি দূর হইয়া যাইতেছে। আমরা বার বার সেই পবিত্র হুতাশন স্পর্শ

করিয়া ধন্য হইলাম। এই অগ্নি মহাদেবের নেত্রাগ্নি। আমার মনে হইতে লাগিল মহাদেবের এই নেত্রাগ্নিতে আমাদের শতশত জন্মের পাপরাশি বুঝি দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। বাড়বানলকুণ্ড খুব গভীর, কিন্তু ইহার তলদেশ লৌহ পাতে আবৃত থাকায় স্নানাদি করিবার কোনও অসুবিধা বা আশঙ্কার কারণ উপস্থিত হয় না। পবিত্র বাড়বানল তীর্থের এই অগ্নিশিখা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলাম। বহুদিন হইতে এই অগ্নিশিখার কথা শুনিয়া আসিতেছি, আজ স্বচক্ষে দেখিয়া হৃদয় ও মন পবিত্র করিলাম। ব্রাহ্মণ একে একে স্ত্রীলোকদিগকে স্নান করাইয়া মন্ত্র পড়াইতে লাগিলেন। আমি নির্নিমেষ নয়নে সেই অগ্নির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলাম। বাড়বানলে অহোরাত্রই অগ্নি জ্বলিতেছে; জল দিয়া নিভাইয়া দিলেও আবার তৎক্ষণাৎ অগ্নি জ্বলিয়া উঠে। এই স্থানে আরও অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু মার্ত্তণ্ডদেব তখন মধ্যাকাশে আসিয়াছেন এবং সকলের জঠরাগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। অনিচ্ছাসত্ত্বে বাড়বানল মন্দির হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। এখানে অনেকগুলি ব্রাহ্মণ কিছু পয়সার জন্য বসিয়া আছেন দেখিলাম। যাঁহার যেমন সাধ্য সকলেই ইহাদিগকে কিছু কিছু দিতেছেন। আমরাও

কিঞ্চিৎ বাড়বানল পুণ্যতীর্থের ব্রাহ্মণদের হস্তে প্রদান করিলাম।

ফিরিয়া আসিতে আসিতে পথের মধ্যে জ্বালামুখী কালী দর্শন করিলাম; পাহাড়ের নিম্নে যেস্থানে এই জ্বালামুখী কালীর মন্দির, সেই স্থানটী অতি নির্জ্জন ও মনোরম। পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, অবশ্য সত্য মিথ্যা জানি না, যতদিনের বাড়বানল ততদিনের এই কালী। অনেকক্ষণ মায়ের মন্দিরে বসিয়া রহিলাম। প্রাণমন তৃপ্ত ও শরীর পবিত্র হইল।

জ্বালামুখী কালীর পশ্চাৎদ্দিকে একটী সুন্দর পুষ্করিণী আছে। আমগাছের শীতল ছায়ায় পুষ্করিণীর বাঁধা ঘাটটীকে আরও শীতল ও সুন্দর করিয়া রাখিয়াছে। এই ঘাটে একজন বাঙ্গালী বৈষ্ণব বসিয়া ছিল। সে আমাদিগকে একটী মধুর সঙ্গীত শুনাইল। সেই নির্জ্জন পবিত্রস্থানে এই সঙ্গীত-ধ্বনি হৃদয়কে সাত্ত্বিকভাবে পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। আমরা জ্বালামুখী কালীকে প্রণাম করিয়া গাড়ীতে আসিয়া উঠিলাম। আমীরহোসেন "ডি" "ডি" করিয়া গরু তাড়াইতে লাগিল। গাড়ীতে বসিয়া বাড়বানলকুণ্ডের কথা ভাবিতে ভাবিতে মহাভারত পাণ্ডার বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিলাম। তখন দিবা অপরাহ্ন প্রায়। সেদিন বাসা হইতে আর কোথাও বাহির হইলাম না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

১০ই আষাঢ় বুধবার অতি প্রাতে উঠিয়া সকলে বাহির হইলাম; সঙ্গে সেই শরৎ পুরোহিত। প্রথমেই আমরা যাইয়া ব্যাসকুণ্ডে স্নান ও ভুজ্যোৎসর্গ করিলাম। প্রভাতে উদ্যোগ আয়োজন করিতে গেলে বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা এই নিমিত্ত পূর্ব্বদিন হইতেই বস্ত্র ও চাউল ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া রাখা হইয়াছিল কারণ আজ আমাদিগকে চন্দ্রনাথ পাহাড়ে যাইতে হইবে। স্নানদান ও ভোজ্যাদি উৎসর্গ করার পর আমরা কালভৈরব দর্শন করিলাম। এই কাল-ভৈরবের মন্দিরটী বহু প্রাচীন। মন্দির মধ্যে ভৈরব চণ্ডী মহাদেব ও ব্যাসদেব আছেন। ইহার পর সীতাকুণ্ডু ও রামকুণ্ডু। সীতাকুণ্ডু ও রামকুণ্ডু দেখিবার পর স্বয়ম্ভুনাথের মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলাম। স্বয়ম্ভুনাথকে দর্শন করিয়া ধন্য হইলাম। পূজা করিতে করিতে, কি এক অভিনব ভাবে হৃদয় ভরিয়া উঠিল। সেভাব লেখনী সাহায্যে ব্যক্ত করা যায় না। পূজান্তে পুরোহিত বলিল "মোহন্তকে কিছু প্রণামী দিতে হইবে।" কারণ কি তাহা আর জিজ্ঞাসা

করিলাম না। চন্দ্রনাথ মোহন্তঘটিত ব্যাপার সকলেই প্রায় জ্ঞাত আছেন, সুতরাং মোহন্ত কাহিনী বলিতে আর ইচ্ছা নাই। আমাদের হিন্দুর তীর্থস্থানগুলি মোহন্তগণ আজকাল কিরূপ ভাবে পরিণত করিয়াছেন, তাহা বলিতে গেলে হৃদয় শিহরিয়া উঠে, চক্ষু দিয়া বেদনাশ্রু নিপতিত হয়। দুই একটী তীর্থস্থানের মোহন্ত ধার্ম্মিক ও নিষ্ঠাবান আছেন সত্য, কিন্তু অধিকাংশ মোহন্তই বিলাসী ও লম্পট। মোহন্তগণ ধার্ম্মিক, ত্যাগী, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়—ভগবদ্ভক্ত হইবেন, তাহার পরিবর্ত্তে অধিকাংশ তীর্থের মোহন্তগণ কামান্ধ, অশিষ্ট ও লম্পট মূর্ত্তিতে তীর্থদর্শনেচ্ছু যাত্রীগণের হৃদয়ে ঘৃণা, ক্ষোভ ও ভীতির উদ্রেক করিতেছেন। বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, মোহন্ত তাঁহার আসনে গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করিয়া বসিয়া আছেন।

মোহন্তের সহিত কথোপকথনের বা আলাপ পরিচয়ের সময় না পাইলেও দেখিলাম, ইনি অমায়িক ও শিষ্ট এবং অধিক কথাবার্ত্তা কহেন না। পাণ্ডাদের মুখে ইঁহার চরিত্রের প্রশংসার কথাই শুনিলাম। বর্ত্তমান এই মোহন্তের নাম "কুমুদবন"।

স্বয়ম্ভুনাথের মন্দির হইতে নিক্রান্ত হইয়া আমরা পাহাড়ে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। সে কি কষ্ট, যখন পাহাড়ের

উপরের দিকে চাহিলাম, তখন বিশ্বাস করিতে পারিলাম না যে; এত উচ্চে উঠিয়া চন্দ্রনাথ দর্শন করিতে পারিব। অনেক কষ্টে আমরা "বিরূপাক্ষ" মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। বিরূপাক্ষ দর্শন করিয়া আমরা কৃতার্থ হইলাম। স্থানটী অতি মনোরম। বিরূপাক্ষ-মন্দিরে আসিয়া আমাদের কতকটা ভরসা হইল। বোধ হইল, আমরা উপরে উঠিতে পারিব।

পাহাড়ে উঠিতে উঠিতে এক স্থানে চারিদিকে প্রাচীর-বেষ্টিত একটী ক্ষুদ্র গৃহ দেখিতে পাইলাম। এরূপ পাহাড়ের মধ্যে নির্জ্জনে কোন মহাপুরুষ বাস করিতেছেন কি না, জানিবার জন্ত বড়ই কৌতূহল হইল। পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, ইনি এক জন ধার্ম্মিক ভদ্রলোক। ইঁহার সন্তানাদি সকলেই উপযুক্ত। ছেলেদের হস্তে সমস্ত বিষয়াদির ভার অর্পণ করিয়া বৃদ্ধবয়সে সহধর্ম্মিণীকে লইয়া এই পর্ব্বতে নির্জ্জন বাস করিতেছেন এবং সংসারের সমস্ত বন্ধন ও আসক্তি ত্যাগ করিয়া ইনি ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। ভদ্রলোকটীর এই সুখকর জীবন-যাপনের কথা শুনিয়া তাঁহাকে একবার দেখিবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু সময়াভাব বশতঃ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলাম না।

বিরূপাক্ষের মন্দিরের দ্বারে বসিয়া আমরা চারিদিকের অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিতে লাগিলাম। এই স্থান হইতে ঊনকোটী শিবের বাড়ী যাইতে হয়, কিন্তু এই বর্ষাকালে ঊনকোটী শিবের বাড়ী যাইবার পথটী এতই দুর্গম ও পিচ্ছিল হইয়াছিল যে, আমরা যাইতে সাহস করিলাম না।

এই স্থানটীর দৃশ্য অপূর্ব্ব। চারিদিকে পর্ব্বতশ্রেণী, ঊর্দ্ধে অনন্ত আকাশ। নানাবিধ বিহঙ্গমকুল পর্ব্বতোপরিস্থ তরুশিরে নাচিয়া ফিরিতেছে। আমরা অঞ্জলি অঞ্জলি বিল্বপত্র বিরূপাক্ষদেবের মস্তকে দিয়া প্রাণ ভরিয়া পূজা করিলাম।

পর্ব্বতারোহণে যে কষ্ট ও ক্লান্তি হইয়াছিল, বিরূপাক্ষ দেবকে দেখিয়া ও পূজা করিয়া সকল কষ্ট ও সকল ক্লান্তি মুহূর্ত্তে দূর হইয়া গেল। পূজাদি করিয়া আমরা চন্দ্রনাথদেব দর্শনের জন্য পর্ব্বতের উপরে উঠিতে লাগিলাম। একটু উঠি, আবার বসি, কখনও হামাগুড়ি দিয়া, কখনও লাঠি ধরিয়া, কখনও উভয়পার্শ্বের লতাগুল্মাদি আকর্ষণ করিয়া আমরা উপরে উঠিতে লাগিলাম।

আমরা চন্দ্রনাথ দেবের মন্দির সমীপে যখন উপস্থিত হইলাম, তখন প্রাণ জুড়াইয়া গেল। চারিদিকে অপরূপ অপূর্ব্ব মনোহর দৃশ্য দেখিয়া আনন্দে অশ্রুবারি নিপতিত

হইতে লাগিল। অদূরে বঙ্গোপসাগর দর্শন করিয়া প্রাণ পুলকিত হইয়া উঠিল।

চন্দ্রনাথ পর্ব্বত হইতে সমুদ্রের দৃশ্য অতি মনোহর। যেদিকে চাই, সেই দিকেই অপরূপ দৃশ্যে প্রাণ মোহিত হইয়া উঠে। সে দিন চন্দ্রনাথ পর্ব্বত হইতে দিগন্ত প্রসারিত সুনীল সমুদ্রের যে সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়াছিলাম তাহা জীবনে কখন ভুলিতে পারিব না। বহুক্ষণ নির্নিমেষ নয়নে সমুদ্রের দিকে চাহিয়াছিলাম। যখন পুরোহিত আমাকে চন্দ্রনাথের পূজা করিবার জন্য বার বার ডাকিতে লাগিল, তখন আমার চমক ভাঙ্গিল।

প্রাণ ভরিয়া পূজা করিলাম। পূজান্তে আবার অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। একটী বিল্ববৃক্ষ তলে তিনটী সন্ন্যাসী বসিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকট উনকোটী শিবের দুর্গম রাস্তার কথা শুনিলাম। তাঁহারা বলিলেন, সে রাস্তায় আপনারা যাইতে পারিবেন না। আমরা বহু চেষ্টা করিয়া বৃক্ষলতাদি ধরিয়া কখনও শুইয়া, কখনও গড়াইয়া, কখনও হাঁটু গাড়িতে গাড়িতে উনকোটী শিবের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলাম। চন্দ্রনাথ পাহাড়ের উপর ভীষণ জলকষ্ট। বিন্দুমাত্র জল পাইবার উপায় নাই। শুনিলাম, সেই সন্ন্যাসীত্রয় জলকষ্টের জন্য তাঁহারা পূর্ব্বদিন হইতে কিছু আহার করেন নাই।

চন্দ্রনাথ পর্ব্বতোপরি একদিন বাস করিবার বড়ই ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু শুনিলাম, তথায় রাত্রে কেহ থাকেন না। পুরোহিতেরা দিবাভাগে পূজা করিয়া রাত্রে চলিয়া আইসেন। সাধুসন্ন্যাসীরা কখনও কখনও এই পর্ব্বতোপরি অবস্থান করেন। আমরা যে কষ্ট করিয়া চন্দ্রনাথপাহাড়ের উপর উঠিয়াছিলাম, তাহা লিখিতে গেলে পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি হইয়া পড়ে। চন্দ্রনাথপর্ব্বতের উপর উঠিয়া প্রাকৃতিক দৃশ্য অবলোকনে আমাদের সেদিনকার কষ্ট সার্থক হইয়াছিল। চন্দ্রনাথের দর্শন ও স্পর্শনে মনে হইল ত্রিতাপ জ্বালা জুড়াইবার জন্য কোন অজানিত দেশে আসিয়াছি। মন্দির যখন প্রদক্ষিণ করিতেছিলাম, তখন প্রেমাশ্রুতে আমার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল

দিবা অপরাহ্ণ হইয়া যায় দেখিয়া, অনিচ্ছাসত্ত্বে আমরা চন্দ্রনাথপর্ব্বত হইতে অবতরণ করিতে আরম্ভ করিলাম। চন্দ্রনাথের যে ছবি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া লইয়া আসিলাম, উহা চিরদিন জাগরূক থাকিবে।

চন্দ্রনাথ পাহাড় হইতে নামিতে নামিতে এক অসাধারণ সন্ন্যাসীর দর্শন পাইলাম। তেমন সৌম্যমূর্ত্তি সন্ন্যাসী কোনও তীর্থেই আর কখনও দেখি নাই। সন্ন্যাসী যাহা কিছু পাইতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে সকলকেই বিলাইয়া দিতেছেন।

তাঁহার সম্বলের মধ্যে কেবলমাত্র এক কৌপীন। এই সন্ন্যাসীকে এক জন স্ত্রীলোক কয়েকটী মুদ্রা প্রদান করিয়াছিল। সন্ন্যাসী হাসিতে হাসিতে যাহাকেই সম্মুখে পাইল, তাহাকেই টাকাগুলি বিলাইয়া দিল। সেই পুণ্যস্থানে ত্যাগের আদর্শ-মূর্ত্তি এই সন্ন্যাসীকে দেখিয়া চন্দ্রনাথদর্শনে আশা সার্থক হইল মনে করিয়াছিলাম।

ইহার পর আমরা গয়াকুণ্ডে আসিয়া পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান করিলাম। শ্রাদ্ধাদির পর কালীবাড়ী দর্শন করিয়া পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিলাম। অপরাহ্ণে যখন আমরা বাসায় আসিলাম, তখন সকলেরই ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়াছে। উপর্য্যুপরি সরবৎ পান করিয়াও আমাদের পিপাসার নিবৃত্তি হইল না।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

অদ্য প্রাতে একখানি গো-শকটে আমার মধ্যম দিদি-ঠাকুরাণীকে লইয়া সহস্রধারা দর্শনের জন্য বাহির হইলাম। কনিষ্ঠ পুত্রটীর ভীষণ রক্তামাশয়ের জন্য গৃহিণী প্রভৃতি কেহই সহস্রধারা দেখিতে যাইতে পারিলেন না। এজন্য তাঁহারা বিশেষ মর্ম্মাহত হইলেন। কিন্তু পুত্র-স্নেহের নিকট সকল প্রলোভনই হীনপ্রভ হইয়া গেল। সুতরাং অদ্য "সহস্র ধারা" দর্শনের পুণ্য অপেক্ষা পুত্রের শুশ্রূষা করা গৃহিণীর অধিকতর পুণ্য বলিয়া মনে হইল। আমরা প্রথম "লবণাক্ষ কুণ্ডে" যাইয়া উপস্থিত হইলাম। লবণাক্ষকুণ্ডের জল অত্যন্ত লোনা। এই কুণ্ডে অবতরণ করিয়া দেখিলাম, অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছে। এই কুণ্ডে নামিবার সিঁড়ি আছে। পূর্ব্ব দিন চন্দ্রনাথপাহাড়ে উঠিয়া এবং পিপাসায় অতিরিক্ত সরবৎ পান করিয়া জ্বরভাব হইয়াছিল, তজ্জন্য আমি আর লবণাক্ষকুণ্ডে স্নান করিলাম না; মস্তকে একটু জলের ছিটা দিয়া অন্যান্য ধর্ম্মকার্য্য যাহা করিতে হয় তাহা সম্পন্ন করিলাম। এখানেও হাঁটুর উপরে

কাপড় পরিয়া একজন বসিয়াছিলেন। পুরোহিতকে জিজ্ঞাসায় জানিলাম যে, ইনি এখানের মোহন্ত। তাঁহার আদেশে মোহন্তকে কিঞ্চিৎ প্রণামী দিতে বাধ্য হইলাম।

এই লবণাক্ষকুণ্ডের অন্য দিকে আর একটী কুণ্ড আছে। সেটীকে "বাসীকুণ্ড" বলে। এখানেও অগ্রে এই বাসীকুণ্ডে স্নান করিতে হয়। লোকজনের ভিড় নাই, কেবলমাত্র কয়েক জন ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ বসিয়াছিল।

এই লবণাক্ষকুণ্ডে স্নানাদি করিয়া আমরা সূর্য্যকুণ্ড দর্শন করিতে চলিলাম। এখানে এই কুণ্ড ভিন্ন অন্য কিছু দর্শনীয় নাই। এখানেও একটু জল লইয়া আমি মাথায় দিলাম। ইহার পর আমরা সহস্রধারা দর্শন করিবার জন্য গমন করিতে লাগিলাম। লবণাক্ষকুণ্ড হইতে সহস্রধারা প্রায় কিছু কম এক মাইলের পথ। এই পথটী এত দুর্গম ও ভীষণ যে, প্রতি পদক্ষেপে ত্রাসের উদয় হইতে লাগিল। তীর্থদর্শনে আসিয়াছি, সুতরাং খালি পায়েই আসিয়াছিলাম। কঙ্কর ও প্রস্তরের উপর দিয়া যাইতে যাইতে, পদদ্বয়ে সূচীভেদের ন্যায় যন্ত্রণা হইতে লাগিল। সহস্রধারার পুরোহিতের পুত্র "লবণাক্ষকুণ্ড" হইতে আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া সহস্রধারা দেখাইতে যাইতেছিলেন। পুরোহিত পুত্র বিনা আয়াসে, অবলীলা-

ক্রমে অগ্রে অগ্রে চলিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহার খাি
পায়ে যাওয়া দেখিয়া বার বার নিজেকে ধিক্কার দিে
লাগিলাম। আমাদের পিতৃপুরুষগণ জুতা কি ব
জানিতেন না। কখনও কখনও কাহারও এক যোড়
করিয়া "তালতলার" চটীতেই বিশ বৎসর কাটিয়
যাইত। একথা শুনিলে আজকালকার নব্য শিক্ষিতে
অতিরঞ্জিত গল্প বলিয়া মনে করিবেন সন্দে
নাই।

কিন্তু সত্যসত্যই পূর্ব্বে আমাদের দেশে পাদুকার প্রচল
ছিল না। একটী গৃহস্থের একটি মাত্র "গুয়া পাতার" ছা
থাকিত, সেই একটি "গুয়া পাতার" ছাতায় সংসারের সক
পুরুষেই শীতাতপ হইতে মস্তক রক্ষা করিতেন। মুষলধা
বৃষ্টি ও বৈশাখের প্রচণ্ড দ্বিপ্রহরের রৌদ্র ব্যতীত কেহ সে
ছাতা ব্যবহাঁর করিতেন না। কারণ ছাতা ব্যবহার করিবা
তাঁহাদের প্রয়োজন হইত না। আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেবে
মুখে শুনিয়াছি যে, আমার* পিতামহ মহাশয় কখনও ছা

---

* মৎপ্রণীত "জীবন-সংগ্রাম" নামক পুস্তকে এই পিতাম
দেবের কথা ও শতবর্ষ পূর্ব্বে আমাদের দেশের অব
কি প্রকার ছিল, তাহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত হইয়াছে।

বা জুতা ব্যবহার করেন নাই। আজকাল আমরা জুতার দাস হইয়া পড়িয়াছি। ঘরে বাহিরে জুতা না হইলে আমাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকে না।

খালি পায়ে চলিতে চলিতে পা ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল। উপলখণ্ডের উপর দিয়া যাইতে যাইতে, মাঝে-মাঝে আমাদিগকে জল ভাঙ্গিতে হইল। এরূপ দুর্গম পথ চন্দ্রনাথে আসিয়া আর কোথাও দেখি নাই। আমরা যে কষ্টে সেই পথ অতিক্রম করিলাম, তাহা লিখিয়া অপরকে হৃদয়ঙ্গম করান দুঃসাধ্য। এখনও সহস্রধারা যাইবার সেই দুর্গম পথের কথা মনে হইলে শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠে। বহু কষ্টে সেই দুর্গম পথ অতিক্রম করিবার পর অদূরে সহস্রধারা দেখিতে পাইলাম।

সহস্রধারা দর্শন করিয়া সকল কষ্ট বিদূরিত হইল। প্রকৃতির নিভৃত প্রদেশে এই সহস্রধারা অবস্থিত। চতুর্দ্দিকে পর্ব্বত ও ভীষণ জঙ্গল। আমরা দিবাভাগে এই সহস্রধারার কাছে আসিয়া যখন চারিদিক অবলোকন করিলাম, তখন আমাদের হৃদয় যেরূপ অপূর্ব্ব আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল, অন্যদিকে তেমনি হিংস্র জন্তুদের ভীষণ গর্জ্জন শুনিয়া ক্ষণে ক্ষণে অন্তর শিহরিয়া উঠিতে লাগিল।

ভীম নামক পর্ব্বতের উপর হইতে সহস্রধারা মন্দাকিনীর জল নিম্নে পতিত হইতেছে। ভীষণ শব্দে চারিদিক মুখরিত। সহস্রধারা হইতে প্রায় বিশ হস্ত দূরে আমরা দণ্ডায়মান ছিলাম। সেই জল এত তীব্রবেগে উপর হইতে পতিত হইতেছে যে, সেই বিশ হস্ত দূরে জল-কণা আসিয়া আমাদিগকে একপ্রকার স্নান করাইয়া দিল।

আমাদের সঙ্গে একজন সন্ন্যাসী সহস্রধারায় গিয়াছিলেন। যাঁহারা কেবল ভগবানের নাম লইয়া জগতে বিচরণ করিতেছেন, তাঁহাদের শক্তি বুঝি অসীম। ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ সন্ন্যাসীদের তেজ দেখিলে, আমাদের ন্যায় সংসারী জীবকে তাঁহাদের পদে সদাসর্ব্বদা মস্তক নত করিয়া থাকিবার ইচ্ছা হয়।

এই সন্ন্যাসী অকুতোভয়ে সহস্রধারার নিম্নে গিয়া মস্তক পাতিয়া দিলেন এবং সে স্থান হইতে স্নানান্তে তাঁহার লোটা এই পবিত্র বারিপুর্ণ করিয়া লইয়া অসিলেন। আমাদের ন্যায় রুগ্ন দুর্ব্বল ব্যক্তি এইরূপে সহস্রধারার নিম্নে গিয়া স্নান করিলে তুষার শীতল জলে শরীর অসাড় হইয়া যাইত, অথবা সজোরে পতিত সেই জলরাশিতে মেরুদণ্ড ভগ্ন হইত। শুনিয়াছিলাম, এই সহস্রধারার নিকট আসিয়া হর হর ব্যোম ব্যোম রবে করতালি প্রদান করিলে

উপর হইতে জলরাশি অধিক পরিমাণে পতিত হয়। আজ সেই কথা স্বয়ং আসিয়া পরীক্ষা করিয়া আশ্চর্য্য ও স্তম্ভিত হইলাম।

ভগবান কি উদ্দেশ্যে কোথায় কোন্ জিনিস সৃষ্টি করিয়াছেন তিনিই জানেন। আমাদের কেবল বিস্ময়ে চিন্তা করা ব্যতীত তাঁহার উদ্দেশ্য জানিবার কোনও শক্তি নাই। সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কিরূপে এই অসম সাহসিকতার কার্য্য করিলেন। উপর হইতে যেরূপ সতেজে জল আসিয়া পড়িতেছে, তাহাতে আপনার জীবন-নাশের সম্ভাবনা ছিল। আপনার কি জীবনের প্রতি মায়া নাই?"

সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন, "বাবা! আমরা যাঁহার আশ্রিত, যিনি আমাদের রক্ষাকর্ত্তা, সেই ভগবানের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করি বলিয়াই জীবন ও মৃত্যু উভয়ই আমরা সমান জ্ঞান করি। এই যে ভীষণ জঙ্গল দেখিতেছ, ঐ যে হিংস্র জন্তুগণ আহারীয় বস্তুর অন্বেষণ করিতে করিতে চীৎকার করিতেছে—তাঁহার নাম করিতে করিতে ঐ ভীষণ স্থানে দিনের পর রাত্রি ও রাত্রির পর দিন অতিবাহিত করিয়াছি। হিংস্র জন্তুগণ সম্মুখে পাইয়াও আমাদিগকে আহার করে নাই। এমন দয়াবান ভগবানের

উপর মানুষ নির্ভর না করিয়া কেন নিজের উপর নির্ভর করে! বাবা, তাঁহার উপর আত্মনির্ভর করিতে শিক্ষা কর; পথ পরিষ্কার হইয়া যাইবে। এখানে যাহাদিগকে আপনার জন মনে করিতেছ, তাহারা প্রকৃতই "আপনার" নহে। "আপনার বলিতে সেই ভগবানকে আশ্রয় কর, জীবনে বিমল শান্তি পাইবে।

সন্ন্যাসী আরও কত কি বলিলেন। তাঁহার উপদেশামৃত পান করিতে করিতে আমরা "গুরুধুনী"তে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সহস্রধারার অনতিদূরেই "গুরুধুনী"। অতি সঙ্কীর্ণ পিচ্ছিল পথ ধরিয়া গুরুধুনীতে যাইতে হয়। গুরুধুনীর যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম, ততই পথ আরও দুর্গম বলিয়া বোধ হইল। বড় বুড় পাথরের উপর দিয়া কখনও হাঁটু গাড়িয়া, কখনও অর্দ্ধ শয়নাবস্থায় এই পথ অতিক্রম করিতে হইল।

পর্ব্বতের পাদদেশ হইতে লোলজিহ্বা বিস্তার করিয়া অগ্নিশিখা বহির্গত হইতেছে। ইহাকে "গুরুধুনী" বলে। গুরুধুনীর আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিয়া বার বার ভগবানের চরণে মস্তক নত করিলাম। আমাদের সঙ্গীর সন্ন্যাসী সহস্রধারা হইতে যে একলোটা জল আনিয়াছিলেন, তিনি সেই জল গুরুধুনীর অগ্নিশিখার উপর ছড়াইয়া দিলেন।

অগ্নিশিখা আরও সতেজে পর্ব্বত গাত্র হইতে বাহির হইতে লাগিল। গুরুধুনীর অত্যাশ্চর্য্য শক্তি দেখিয়া, বিস্ময়াবিমুগ্ধনেত্রে চাহিয়া রহিলাম। সন্ন্যাসীর হর হর ব্যোম ব্যোম শব্দে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিল। যতই হর হর, ব্যোম ব্যোম শব্দ হইতে লাগিল, অগ্নিশিখা ততই বাহিরের দিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। এরূপ আশ্চর্য্য কাণ্ড আর কখনও কোন তীর্থে দেখি নাই। ধন্য দেবাদিদেব মহাদেবের আশ্চর্য্যলীলা; ধন্য চন্দ্রনাথ মহা তীর্থ। মহাদেব বলিয়াছেন—

"বিশেষতঃ কলিযুগে বসামি চন্দ্রশেখর"।

ভগবানের এই বাক্যের সার্থকতা আজ "সহস্রধারায়" ও গুরুধুনীতে আসিয়া দেখিলাম। এরূপ মহিমা কোনও তীর্থে দেখিতে পাই নাই।

সীতাকুণ্ড ষ্টেশন হইতে বাড়বানল ৫ মাইল দক্ষিণে ও লবণাক্ষ ৫ মাইল উত্তরে। এই দশ মাইল স্থান "চন্দ্রনাথ তীর্থ"। চন্দ্রনাথ তীর্থ প্রকৃতি দেবীর লীলাভূমি। "চন্দ্রনাথ" পর্ব্বত "গুরুধুনী" "বাড়বানল" "সহস্রধারা" "লবণাক্ষ কুণ্ড" প্রভৃতিতে দেবাদিদেব মহাদেব স্বয়ং বাস করিতেছেন। এই স্থানের মাহাত্ম্য ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য এক মুখে বর্ণনা করা যায় না।

চন্দ্রনাথে আরও অনেকগুলি পবিত্র তীর্থ আছে। সেগুলি সমস্ত দর্শন করিতে আমরা সক্ষম হইলাম না। ব্রহ্মচর্য্য পরায়ণ সাধুসন্ন্যাসীরাই এখানকার সমস্ত তীর্থগুলি দর্শন করিতে পারেন। দুরারোহ অগম্য ভীতি-সঙ্কুল পর্ব্বত মধ্যে তীর্থগুলি অবস্থিত। আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল রুগ্ন বাঙ্গালীর পক্ষে সেই সমস্ত দুরারোহ অগম্য পর্ব্বত মধ্যে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব। এখানে আসিয়া আমরা যে কয়েকটী তীর্থে গিয়াছিলাম, সমস্ত গুলিই পর্ব্বতের অতি নির্জ্জন স্থানে অবস্থিত ও সৌন্দর্য্যে সমালঙ্কৃত। দেখিলেই ভগবৎ প্রেমে প্রাণ মুগ্ধ হইয়া যায়। পর্ব্বত, বিটপী ও লতা পরিবেষ্টিত প্রকৃতির রমণীয় লীলাক্ষেত্র যিনি এই পবিত্র তীর্থগুলি দেখিবেন, তিনিই মুগ্ধ হইয়া যাইবেন। চন্দ্রনাথে আসিয়া যিনি একবার মহাদেবের নেত্রাগ্নি "জ্যোতির্ম্ময়" দর্শন করিবেন, তিনি বিধর্ম্মী হউন আর নাস্তিকই হউন, তাঁহাকে নিশ্চয়ই হিন্দু ধর্ম্ম ও হিন্দুর তীর্থগুলির উদ্দেশ্যে মনে মনেও মস্তক অবনত করিতে হইবে। চন্দ্রনাথ স্বভাবের মনোরম মূর্ত্তিতে বিরাজমান।

শাস্ত্রে লিখিত আছে, শম্ভুনাথ দর্শন করিলে—

"অশ্বমেধ সহস্রস্য বাজপেয় শতস্য চ,
সর্ব্বপাপ বিনির্ম্মুক্তো ধনধান্যসুতান্বিতঃ।
এতদীশ মুখং দৃষ্টা ফলমাপ্নোতি মানবঃ,
শিবত্বং লভতে মর্ত্ত্যঃ পুনর্জ্জন্ম বিবর্জ্জিতঃ।

বিরূপাক্ষ দর্শন করিলে শাস্ত্রে লিখিত আছে—

"যস্য কটীদেশ সংস্থো, বিরূপাক্ষো মহেশ্বরঃ।
রুদ্রলোকমবাপ্নোতি যস্তত্রারোহতে নরঃ।

চন্দ্রনাথপর্ব্বতের মস্তকোপরি মহাতীর্থ বাবা চন্দ্রনাথকে দর্শন করিলে ও চন্দ্রনাথপর্ব্বতে আরোহণ করিলে শাস্ত্রে লিখিত আছে—

"চন্দ্রশেখরারোহে মুক্তিমাপ্নোতি মানবঃ।
কুলবিংশতি সংযুক্তঃ শিবলোকে মহীয়তে।

চন্দ্রনাথে আসিয়া আমাদের তীর্থদর্শন এই স্থানেই শেষ হইল। গুরুধুনী হইতে আমরা যখন বাসায় আসিয়া পৌছিলাম, তখন দিবা ৪ ঘটীকা অতীত হইয়া গিয়াছে। বাসায় আসিবামাত্র গৃহিণী বলিলেন, "ছোট খোকার রক্তা-মাশয় পীড়া অতি ভীষণ মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছে।" সুতরাং অন্য দুই একটী তীর্থে যাইবার ইচ্ছা থাকিলেও ঘটিয়া উঠিল না। কলিকাতা ফিরিয়া আসিবার ব্যবস্থা করিতে হইল।

আসিবার দিন সীতাকুণ্ডুর ষ্টেশন মাষ্টার আমাদের বিশেষ উপকার করিয়াছিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গাড়ী রিজার্ভের (Reserve) ব্যবস্থা করিয়া না দিলে রুগ্ন খোকাকে লইয়া আসিতে আমাদের বিশেষ কষ্ট পাইতে হইত।

আসিবার সময় মহাভারত পাণ্ডাকে কয়েকটি মুদ্রা প্রণামী দিলাম। হাসিমুখে টাকা কয়টী গ্রহণ করিয়া তাহাতেই তিনি খুব সন্তুষ্ট হইলেন। অন্যান্য তীর্থের পাণ্ডা অপেক্ষা মহাভারত পাণ্ডার অনেক বিষয়ে পার্থক্য দেখিলাম। সন্ধ্যা ৭টার সময় পুরোহিত ও পাণ্ডার ভৃত্যদিগকে যথাসাধ্য কিছু কিছু দক্ষিণা ও পুরস্কার দিয়া আমরা রাত্রি ৯ ঘটিকার পর গাড়ীতে উঠিলাম। সমস্ত রাত্রি গাড়ীতে আসিয়া ভোরের সময় চাঁদপুরে অবতরণ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে চাঁদপুরঘাটে ষ্টীমারে উঠিলাম। তখনও ফর্শা হয় নাই, সূর্য্যদেব উদিত হইবার অনেক বিলম্ব ছিল। আমরা ষ্টীমারে উঠিবার অল্পক্ষণ পরেই ষ্টীমার ছাড়িয়া দিল। ষ্টীমার ছাড়িয়া দিলে, ষ্টীমারের উপর ও নীচের তলায় চারিদিকে বেড়াইতে লাগিলাম। ষ্টীমার হুসহুস শব্দে তখন ছুটিতেছিল। নিম্ন-তলের একস্থানে দেখিলাম, একজন সন্ন্যাসীকে কয়েকজন ভদ্রলোক বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। সন্ন্যাসী মধুর

স্বরে ভক্তিগদগদ প্রাণে উচ্চৈঃস্বরে গান গাহিতেছেন। সন্ন্যাসীর ভক্তি প্রস্রবণ উথলিয়া উঠিয়া চক্ষু দিয়া দর-বিগলিত ধারায় অশ্রু নিপতিত হইতেছে। অতি সুমধুর সঙ্গীত। সন্ন্যাসীর সেই সঙ্গীতটি সম্পূর্ণ এখন আর আমার মনে নাই। কয়েকছত্র মাত্র এখনও আমার কানের কাছে ঝঙ্কার দিতেছে। সন্ন্যাসী গাহিতেছিলেন—

"ষঠচক্র রথ মধ্যে শ্যামা মা আমার বিরাজ করে।"
তিনটী কাছি * কাছাকাছি, যুক্ত বাঁধা মূলাধারে।
পাঁচ ক্ষমতা সারথী তার, রথ চালাচ্ছে দেশ দেশান্তরে।

... ...

তীর্থে গমন মিথ্যা ভ্রমণ মন উচাটন করোনারে
+ ত্রিবেণীর ঘাটে বইস, শীতল হবে অন্তঃপুরে।
প পাঁচজনে পাঁচস্থানে গেলে পোড়াইবে দেহটারে।

... ...

ভক্ত সন্ন্যাসীর হৃদয়ের মধুর সঙ্গীতে প্রাণ মাতোয়ারা হইয়া উঠিল। সন্ন্যাসীর কোনওদিকে দৃষ্টি নাই। আপন

---

* ইড়া, পিঙ্গলা, সুষম্না

\+ হৃদিপদ্ম, কুলকুণ্ডলিনী, মানস সরোবর।

প ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম।

মনে ভক্তি-গদগদকণ্ঠে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া গান করিতেছেন। সন্ন্যাসীর মস্তকে জটাভার, দীর্ঘ শ্মশ্রুতেও কয়েকটী জটা পাকাইয়া গিয়াছে; সর্ব্বাঙ্গ ভস্ম মাখা, কটিদেশে কেবল-মাত্র একটী গেরুয়া রংয়ের কৌপীন, চিমটা; কমণ্ডলু, বা উত্তরীয়, সন্ন্যাসীর সঙ্গে কিছুই নাই। সন্ন্যাসীকে উলঙ্গ বলিলেও বলা যায়। মূর্ত্তি সৌম্য, তেজঃপুঞ্জ মুখমণ্ডল। সেই অপূর্ব্ব মুখমণ্ডলে পবিত্র জ্যোতিঃ।

মনে হইল সন্ন্যাসীকে বহুকাল পূর্ব্বে যেন কোথাও দেখিয়াছি। অনেকক্ষণ চিন্তা করিলাম, কোথায় কি অবস্থায় দেখিয়াছি। স্মৃতিপথে উদিত হইল না। ভাবিলাম বোধ হয় কোনও তীর্থস্থানে দেখিয়া থাকিব। সন্ন্যাসীর মুখমণ্ডল হইতে আমি চক্ষু ফিরাইতে পারিলাম না। যত দেখি ততই যেন আমায় দেখিবার ইচ্ছা প্রবল হইতে থাকে। যেন কত কালের পূর্ব্বের স্নেহবন্ধনে আমি এই সন্ন্যাসীর কাছে বাঁধা ছিলাম। মনে হইতে লাগিল, সন্ন্যাসী যেন আমার কত আপনার, যেন কত আত্মীয়।

সন্ন্যাসীকে কোথায় দেখিয়াছি, মনে করিতে না পারিয়া নির্নিমেষনয়নে সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চাহিয়া সেইস্থানে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

সঙ্গীত থামিয়া গেল। সন্ন্যাসী চক্ষুরুন্মীলন করিলেন না ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া রহিলেন। দেখিয়া মনে হইতে লাগিল সন্ন্যাসীর বাহ্যজ্ঞান নাই; দেহ স্পন্দন রহিত। যাহারা সঙ্গীত শুনিতে আসিয়াছিলেন, সঙ্গীত বন্ধ হইল দেখিয়া একে একে তাঁহারা সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। সেদিকে আর কেহ আসিল না।

আমার পা উঠিল না। সেস্থান ত্যাগ করিবার ইচ্ছাও হইল না। আমি পূর্ব্বের ন্যায় একই ভাবে সৌম্যমূর্ত্তি সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

বহুক্ষণ পরে সন্ন্যাসী চক্ষু উন্মীলন করিয়া আমার দিকে চাহিলেন। আবার চক্ষু মুদিলেন আবার চাহিলেন। কয়েকমুহূর্ত্ত পরে আবার চাহিলেন আবার চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

এবার অনেকক্ষণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিবার পর আমার মুখের দিকে চাহিলেন। আর চক্ষু মুদ্রিত করিলেন না। সন্ন্যাসীর দৃষ্টি আমার মুখের উপর সংবদ্ধ হইয়া রহিল। সে দৃষ্টি কি স্নেহমাখা! আমার মনে হইতে লাগিল সন্ন্যাসীর পদতলে লুটাইয়া পড়ি। হায়! কোথায় কবে এই সন্ন্যাসীকে দেখিয়াছি। স্মৃতিশক্তিকে ধিক্কার দিতে লাগিলাম।

সন্ন্যাসী স্নেহভরে আমাকে তাঁহার সম্মুখে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। সন্ন্যাসী বসিতে ইঙ্গিত করায় আমার আনন্দের সীমা রহিল না। আমি তাঁহার সম্মুখে যাইয়া উপবেশন করিলাম। সন্ন্যাসীর এত নিকটে যাইয়া বসিলাম, যে মাঝে অৰ্দ্ধ হস্ত মাত্র ব্যবধান রহিল।

মধুমাখা স্নেহস্বরে সন্ন্যাসী আমার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার বাড়ী কোথায় বাবা? কোথায় গিয়াছিলে? কোথা হইতে এখন আসিতেছ?"

আমি শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে কোথায় গিয়াছিলাম ও কোথা হইতে আসিতেছি, সংক্ষেপে সমস্ত পরিচয় দিলাম। শেষে বলিলাম "আমার বাড়ী কলিকাতা।"

বাড়ীর কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন "কলিকাতায় কতদিন বাস করিতেছ? আমি বলিলাম, "দ্বাদশ বর্ষ অতীত হইয়া গিয়াছে।" "তোমার জন্মভূমি কি ত্যাগ করিয়াছ? আমি বলিলাম "আজ্ঞে হাঁ" ভীষণ ম্যালেরিয়ার দৌরাত্ম্যে জন্মভূমি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি।

মৃদু হাসিয়া সন্ন্যাসী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার মাতুলালয়ে কত দিন যাও নাই?" আমি বলিলাম—"সেত আজ প্রায় ১২ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে।"

সন্ন্যাসী কোনও প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বেই আমি বলিলাম, "আমি কোথায় কবে যেন আপনাকে দেখিয়াছি। এক সময়ে আমি যেন আপনার কণ্ঠস্বর শুনিয়াছি; কিন্তু কোথায় কবে দেখিয়াছি, তাহা আমি এত চেষ্টাতেও মনে আনিতে পারিতেছি না। আপনার যদি মনে থাকে কৃপা করিয়া আমাকে বলুন। জানিবার জন্য আমার বড়ই কৌতূহল হইতেছে।

সন্ন্যাসী একবার হাসিলেন। পরক্ষণে চক্ষু মুদিলেন; আবার আমার দিকে চাহিলেন, আবার চক্ষু মুদিলেন। এবার আমি খুব দৃঢ়তার সহিত বলিলাম, "নিশ্চয়ই আপনার সহিত আমার পূর্ব্বে কোথায় পরিচয় হইয়াছিল। কৃপা করিয়া বলুন, কোথায় আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আপনার এই সৌম্যমূর্ত্তি আমার যেন পূর্ব্ব পরিচিত।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "বাবা! তোমাকে আমি প্রথম দেখিয়াই চিনিয়াছি। পরিচয় দিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু বারবার তোমার অনুরোধ এড়াইতে পারিতেছি না। তোমার মাতুলালয়ের পার্শ্বেই আমার বাড়ী ছিল। আমাকে সকলে "চূড়ামণি" বলিত মনে পড়ে কি?

"চূড়ামণি" এই কথাটী কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার পূর্ব্বস্মৃতি ফিরিয়া আসিল। সন্ন্যাসীর ক্রোড়ে

মাথা রাখিয়া আমি বালকের ন্যায় ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলাম। আমার আর কথা বলিবার শক্তি রহিল না।

সন্ন্যাসীর ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া আমি শান্তি-সিন্ধুতে ডুবিয়া গেলাম। হায়! আজ কত দিন এই সন্ন্যাসীর স্নেহ হইতে দূরে গিয়া পড়িয়াছি। আবার যে ইঁহাকে দেখিতে পাইব—জীবনে আর কখনও যে ইঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে, তাহা কোনও দিন স্বপ্নেও ভাবি নাই। শিলং-পাহাড় যাওয়া আজ আমার সার্থক, জীবনও সার্থক। শিলং-পাহাড় যদি না যাইতাম এই মহাপুরুষকে দেখিতে পাইতাম না।

মানুষ যে বিষয় চিন্তা করে—যাহা পাইবার জন্য তাহার দৃঢ় আকাঙ্ক্ষা হয়, একদিন পরে হউক, দশ দিন পরে হউক, দুই মাস পরে হউক, দুই বৎসর পরে হউক, তাহা সে প্রাপ্ত হইবেই হইবে; ইহা গুরুর মুখে শুনিয়াছিলাম। ইহজীবনেও যদি আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হয়, তবে পরজীবনেও তাহা পূর্ণ হইবে। আজ এই সন্ন্যাসীর দর্শন পাইয়া গুরুবাক্যের যথার্থতা অন্তরের সহিত অনুভব করিলাম।

সন্ন্যাসীর ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। সে ক্রন্দনে যে কি সুখ, কি আনন্দ, কি শান্তি, তাহা ভাষায়

বুঝাইবার নয়। ক্রন্দনেও যে এত সুখ ও শান্তি পাওয়া যায়, তাহা সন্ন্যাসীর ক্রোড়ে সেদিন মাথা রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছিলাম।

আমি কত দিন এই সন্ন্যাসীকে দেখিবার জন্য কাঁদিয়াছি। তীর্থে ভ্রমণ করিয়া সন্ন্যাসী দেখিলেই, তাঁহাদিগকে ইঁহার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কিন্তু কেহই তাঁহার কোনও সংবাদ দিতে পারে নাই।

এই সন্ন্যাসীর পরিচয় দিতে হইলে, এই পুস্তকের কলেবর অতি দীর্ঘ হইয়া পড়িবে। যদি কখনও সময় ও সুবিধা ঘটে, তবে পৃথক্ পুস্তকাকারে সন্ন্যাসীর সমস্ত কথা লিপিবদ্ধ করিবার মানস রহিল।

সন্ন্যাসী সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া শিলং-পাহাড়ের উপসংহার করিব।

এই সন্ন্যাসী আমার মাতুলের প্রতিবাসী ছিলেন। ইঁহার নাম চূড়ামণি তামুলী। দেশে সকলেই ইহাকে "চুড়ো তামুলী" বলিত। ইহার সন্তানাদি ছিল না। কেবলমাত্র সহধর্ম্মিণীকে লইয়া মনের সুখে সংসার পাতিয়াছিলেন। সংসারে অন্য অভিভাবক আর কেহই ছিল না।

বাঁশের খুঁটী, মাটীর দেওয়াল, চালে খড় দেওয়া একখানি তার শয়ন গৃহ ছিল। সেই ঘরের পশ্চিম দিকে একটী চালা

নামাইয়া।তাহাতে চূড়ামণির মুদিখানার দোকান হইত। চাউল, ডাউল, লবণ, তৈল, গুড়, চিঁড়া, মুড়ী, মুড়কী, খেজুরে গুড়ের মোওয়া প্রভৃতি সকল জিনিসিই চূড়ামণির দোকানে পাওয়া যাইত। পুঁজি অল্পই ছিল, সুতরাং দশ সেরের অধিক কোনও জিনিস একসঙ্গে চূড়ামণির দোকানে পাওয়া যাইত না।

চূড়ামণির দাশরথী নামে একটী চাকর ছিল। দাশরথী জাতিতে বাগদী, এই দাশরথী প্রত্যহ দুইবার, কোনও দিন তিন বার চারি মাইল দূরে আরামবাগ সবডিভিসন (Subdivision) হইতে মনিবের দোকানের জন্য জিনিসপত্র ক্রয় করিয়া লইয়া আসিত। আরামবাগের বাজারে বড় বড় গোলদারী দোকান আছে। কারণ এই আরামবাগের পার্শ্ব দিয়া নদী প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। বহু দূর দূরান্তর হইতে নৌকাযোগে এখানে জিনিসপত্র বড় বড় মহাজনেরা আমদানী করিয়া থাকে। আরামবাগ হুগলী জেলার একটী সবডিভিসন।

চূড়ামণি ইচ্ছা করিলে দোকানে বিশ হাজার টাকার মাল রাখিতে পারিত। পাকাবাড়ী, পুষ্করিণী, তেজারতী, মহাজনী, জমি-জায়গা সমস্তই করিতে পারিত, কিন্তু চূড়ামণি সে চেষ্টা কোন দিনই করে নাই। কেন করে

নাই সে কথার উত্তর—এতদিন পরে বুঝিতে পারা যায়, তখন কিছুই বুঝিতে পারি নাই। পঞ্চাশ টাকার অধিক চূড়ামণির দোকানে পুঁজি থাকিত না। মুদিখানা দোকানটী চূড়ামণির ভৃত্য দাশরথীই চালাইত।

তীর্থ-যাত্রীরা তীর্থে যাইবার সময় দূর হইতে যেমন ভক্তি-গদগদ হৃদয়ে—তীর্থের নাম স্মরণ করে, তীর্থের কথা মনে হইলে সর্ব্বদা যেমন মানুষের মনে শ্রদ্ধা ভক্তি ও ধর্ম্মভাবের উদয় হয়—"চুড়ো তামলীর দোকান" এই কথাটীও লোকে সেইরূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত উচ্চারণ করিত। চূড়ামণির দোকানে যাইতেছি এই কথা বলিলেই লোকে মনে করিত, পবিত্র তীর্থ স্থানে যাইতেছি। বড় বড় গোলদারী দোকান, বড় বড় মহাজনের কারবার পরিত্যাগ করিয়া দুই তিন ক্রোশ দূর হইতে খরিদ্দারেরা "চূড়ামণির" দোকানে জিনিসপত্র খরিদ করিতে আসিত। প্রাতঃকাল হইতে রজনী এক প্রহর পর্য্যন্ত চূড়ামণির দোকানে খরিদ্দারের জনতার বিরাম থাকিত না। উপযুক্ত মনিবের উপযুক্ত ভৃত্য দাশরথী খরিদ্দারকে ওজন যোল আনার পরিবর্ত্তে সতর আনা দিত। জিনিষপত্র খরিদ্দারকে যে দরে বিক্রয় করিত, লাভ অল্পমাত্রই থাকিত। কিন্তু বিক্রয় এত অধিক হইত যে, বড় বড় মহাজনের বড় বড় কারবার অপেক্ষা চূড়ামণির

এই পঞ্চাশ টাকার মূলধনের কারবারের লাভ তাহাদের অপেক্ষা অধিক হইত। চূড়ামণি মামার এই কারবারে কিরূপে এত অধিক লাভ হইত, তখন বুঝিতে পারিতাম না; কিন্তু ব্যবসাক্ষেত্রে নামিয়া বুঝিয়াছি,ধর্ম্মপথে থাকিয়া অল্পমাত্র লাভে খরিদ্দারগণকে লাভবান করিতে পারিলে, কারবারের লাভ অধিক হয়। নিজের "ক্ষতি হয় হউক, কিন্তু খরিদ্দারের ক্ষতি না হয়" ইহাই কারবারের মূলমন্ত্র হওয় কর্ত্তব্য।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

চূড়ামণি প্রভাতে উঠিয়াই দোকানের ক্যাসবাক্সটী খুলিত ও অতি সন্তর্পণে পয়সা ও সিকি দুয়ানীগুলি অঞ্চলে বাঁধিয়া লইয়া ধীরে ধীরে দোকান হইতে বাহির হইয়া যাইত। চূড়ামণি এমন গোপনভাবে প্রত্যুষে তাহার গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইত যে, কোনও দিন কেহই তাহাকে দেখিতে পাইত না। চূড়ামণি কোথায় যাইত, তাহা অপরে কেহই জানিতে পারিত না। কেবল কতকটা জানিত চূড়ামণির স্ত্রী ও উহার ভৃত্য দাশরথী। চূড়ামণিকে অনেকেই "বোকা" বলিয়া দোষ দিত এবং তিরস্কার করিয়া বলিত "তুমি কোথায় পাগলের মত ঘুরিয়া বেড়াও, তুমি কারবারটা এতদিন যদি নিজের চক্ষে দেখিতে তাহা হইলে লক্ষপতি হইয়া যাইতে। নিজের কারবার নিজে না দেখিলে কি চলে। যাহারা পঞ্চাশ হাজার টাকার কারবার করিতেছে তাহাদেরও এত খরিদ্দার নাই। অন্য লোক হইলে এতদিন জমিদারী কিনিত, পাকা বাড়ী করিত, স্ত্রীর গায়ে বিশ হাজার টাকার গহনা দিত ইত্যাদি। ইহাদের

অনেকেরই বিশ্বাস যে, চূড়ামণির ভৃত্য দাশরথী দোকানটীর আয় সমস্তই আত্মসাৎ করিত। কেহ কেহ বলিত দাশরথী মাসিক হাজার টাকার উপর চূড়ামণির দোকান হইতে চুরী করিয়া টাকাগুলি মাটীতে পুঁতিয়া রাখিতেছে। যাহার যেরূপ মন সে সেইরূপই দাশরথী সম্বন্ধে বিচার ও নিষ্পত্তি করিত। চূড়ামণি এই সকল কথা শুনিয়া তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া কেবল হাসিত, কোনও উত্তর প্রদান করিত না।

দোকানের ক্যাসবাক্স হইতে চূড়ামণি পয়সা ও সিকি দুয়ানী ছাড়া কখনও টাকা লইত না। কারণ চূড়ামণি ইহা বুঝিত, যে টাকাগুলি লইলে দাশরথি দোকানের জন্য মাল খরিদ করিতে পারিবে না।

অতি প্রত্যূষে পয়সা ও রেজকীগুলি কাপড়ে বাঁধিয়া গামছাখানি স্কন্ধে ফেলিয়া চূড়ামণি "তারা আমায় ঘুরাবি কত চোখ ঢাকা বলদের মত" অনুচ্চস্বরে এই গানটী গাহিতে গাহিতে মাঠ পার হইয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া যাইত।

চূড়ামণি প্রথমেই গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইয়া যাহাদের আপনার বলিতে কেহ কোথাও নাই—যাহাদের পীড়ায় শুশ্রূষা করিবার লোক নাই—কবিরাজ ডাকিবার মানুষ নাই—পথ্য কিনিবার পয়সা নাই—তাহাদের ঘরে ঘরে গিয়া

সংবাদ লইত। কাহার কি অভাব স্বচক্ষে দেখিত, তাহার পর কাহারও জন্য কবিরাজ ডাকিতে ছুটিত; কাহারও ঔষধের অনুপান যোগাড় করিত, কাহাকেও পথ্য প্রস্তুত করিয়া দিত। এইসব করিতেই চূড়ামণির অনেকটা বেলা হইয়া যাইত। তাহার পর চূড়ামণি বাগ্দী, দুলে, হাড়ী মুচী প্রভৃতি গরীব নীচ জাতিদের ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইত। তাহারা চূড়ামণিকে দেখিলেই কেহ মনে করিত স্বয়ং ভগবান স্বহস্তে আজ আহার করাইবার জন্য আসিয়াছেন। কেহ ভাবিত, আমার পরম আত্মীয় আপ-নার জন আসিয়াছে, আজ আর আমাদিগকে অনাহারে থাকিতে হইবে না। এই সমস্ত নীচ জাতিদের মধ্যে যাহাদের খাটিয়া খাইবার শক্তি নাই ও যাহারা অন্ধ, রুগ্ন, বৃদ্ধ বা খঞ্জ কেবল চূড়ামণি তাহাদেরই ঘরে যাইত। যাহাদের দেখিত কটিদেশে কৌপীন ছাড়া আর কিছুই নাই, লজ্জায় যাহারা গৃহের বাহির হইতে পারিতেছে না, চূড়ামণি তাহাদের জন্য দুই ক্রোশ দূরে বাজারে ছুটিত, সেখান হইতে নূতন বস্ত্র কিনিয়া আনিয়া তাহাদিগকে পরিধান করাইয়া দিত।

এই সমস্ত কাজ করিতেই চূড়ামণির অপরাহ্ন হইয়া যাইত। কোন কোনও দিন সন্ধ্যার অন্ধকারে চূড়ামণি

অভুক্ত অবস্থায় গৃহে ফিরিত। চূড়ামণি যতক্ষণ না গৃহে আসিয়া আহার করিত, ততক্ষণ পর্য্যন্ত চূড়ামণির সহধর্ম্মিণী স্বামীর অপেক্ষায় দরজার ধারে একমনে বসিয়া থাকিত। দোকানে বসিয়া ভৃত্য বেচা-কেনা করিত ও এক একবার পথের দিকে চাহিত। প্রভু গৃহে আসিয়া স্নানাহার না করিলে, চূড়ামণির সহধর্ম্মিণীর সহস্র অনুনয় বিনয়েও ভৃত্য দাশরথী কোনও দিনই আহার করিতে স্বীকৃত হইত না।

চূড়ামণি গৃহে আসিয়াই কোনও দিনই নিজ গ্রামের দীন দুঃখীদের সংবাদ না লইয়া আহারে বসিত না। যদি শুনিত কাহারও অসুখ হইয়াছে বা কেহ কোনও বিপদে পড়িয়াছে, তাহা হইলে চূড়ামণি গামছাটী কাঁধে ফেলিয়া তথায় ছুটিয়া যাইত। চূড়ামণি যাহার যাহা উপকার করিত বা যাহাকে যাহা দিত, তাহা অতি সন্তর্পণে এবং অতি গোপনে পাছে কেহ দেখিতে পায় বা জানিতে পারে। কিন্তু, পল্লীগ্রামে সব সময় সব কথা গোপন থাকিত না। চূড়ামণি উপকার করিয়াছে, এই কথা প্রকাশ হইলে চূড়ামণি লজ্জায় মরিয়া যাইত। চূড়ামণি লজ্জায় অধোবদন হইয়া অতি বিনয়ের সহিত বলিত "ওটা কিছু নয় বাবা, সঙ্গে কিছু ছিল, তাই তাকে দিয়াছিলাম। তাহার হাতে পয়সা

আসিলেই সে আবার আমাকে শোধ দিয়া যাইবে। এসব কথা ছাড়িয়া দাও অন্ত কথা বল।"

এইরূপে সে কথাটী যত শীঘ্র চাপা পড়ে চূড়ামণি তাহার চেষ্টা করিত। চূড়ামণির স্ত্রী স্বামীর উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী ছিল। হায়! ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে যাহা দেখিয়াছি, আজ আর কোথাও কোন গৃহে তাহা দেখিতে পাই না কেন? ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে পল্লীগ্রামের কুলবধূরা যাহা ছিল, এখন আর বুঝি তাহা নাই। ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুর ঘরে মেয়েদের সেই দান, ধর্ম্ম, ব্রত, দেবদ্বিজে ভক্তি, অতিথিসৎকার প্রভৃতি যাহা দেখিয়াছি, তাহার বহু পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। কে বলিয়া দিবে কেন হইয়াছে? চূড়ামণির সহধর্ম্মিণীর ন্তায় ঘরে ঘরে যদি হিন্দু রমণী অধিষ্ঠান করিত তাহা হইলে এই মর্ত্ত্যেই স্বর্গের ছায়া দেখিতে পাইতাম।

চূড়ামণি প্রত্যুষে উঠিয়া গৃহের বাহির হইয়া যাইত। চূড়ামণির স্ত্রী গৃহকার্য্যাদি সম্পন্ন করিয়া গ্রামে কাহার কি অভাব গোপনে তাহার অনুসন্ধান লইত।

স্বামীকে ভোজনে বসাইয়া একখানি তালপত্রের পাখার দ্বারা স্বামীকে ব্যজন করিতে করিতে বলিত "কৈলাস হাড়ীর ছোট মেয়েটীর শুনিলাম খুব জ্বর; আহা কেবল খেজুরের চাটা বুনিয়া বিক্রয় করিয়া তাহাতেই দিন গুজরান

করে। তাহার ঘরে এই বিপদ। রাত্রে একবার সংবাদটা লইও। যদি বাড়াবাড়ি হয়, তবে কবিরাজ ডাকিয়া আনিতে হইবে। তাহার তো আর সাধ্য নাই যে, কবিরাজ ডাকিবে।”

“ননী তাঁতীর মাকে সেই যে তুমি নূতন কাপড়খানি দিয়াছিলে, আজ দোকানে এসেছিল দেখলুম, তার সে কাপড়খানি ছিঁড়িয়া গিয়াছে। আহা তাহাতে দশ জায়গায় তালি দিয়া পরিতেছে। বুড়োমানুষ, চোখে দেখতে পায় না যে তাঁত বুনবে। হাঁটিবারও শক্তি নাই। আমার ইচ্ছা হয়েছিল যে, আমার নূতন কাপড়খানি তাকে দিই। কিন্তু পাছে সে লালপেড়ে কাপড় না পরে—এই জন্যে আমি দিতে সাহসী হই নাই।

“দক্ষিণপাড়ার—মুখুয্যেগিন্নী বাতে পঙ্গু হইয়া আজ তিন দিন যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে। আজ তাহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। ছেলেটীর জন্য চীৎকার করিয়া কাঁদতে লাগল। আহা, মুখুয্যেগিন্নীর ছেলেটী যদি আজ বেঁচে থাকিত, তবে কি তাহার আজ এত কষ্ট হইত; একমাত্র উপযুক্ত বয়স্ক পুত্র—মুখুয্যে গিন্নীকে ছেড়ে আজ তিন বৎসর চলে গেছে। আজ তিন বছর কেবল আধমরা হ’য়ে বেঁচে আছে বই তো নয়। এই পুত্রশোকের উপর

বাতের যন্ত্রণা। মুখুয্যেগিন্নীর কষ্টের কথা মনে হইলে বুক ফাটিয়া যায়। তুমি কাল সকালে একবার নিজে গিয়া মুখুয্যেগিন্নীর একটা ব্যবস্থা করিও।”

স্বামী-স্ত্রীতে যতক্ষণ না নিদ্রা যাইত, কেবল এই সব পরামর্শই হইত। চূড়ামণির আহারাদি শেষ হইয়া গেলে, চূড়ামণি উচ্চৈঃস্বরে—ভৃত্য দাশরথীকে আহার করিবার জন্য ডাকিত।

ভৃত্য বলিত, “আপনি হাত ধুইয়া একবার দোকানে বসিলে, আমরা মায়েপোয়ে দুটী খাইয়া লইব।”

রাত্রি এক প্রহরের পর দোকান বন্ধ করিয়া তাহারা কত কথাই কহিত। কাহার চালে খড় নাই, কাহাকে খাজনার জন্য আজ জমীদারের পাইক আসিয়া কত লাঞ্ছনা ও গালাগালি করিয়া গিয়াছে; চূড়ামণি এই সব ভৃত্যের নিকট শুনিয়া অজস্রধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিত।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বলিত, “ভগবান যদি আমাকে বড়লোকদের মত টাকা দিতেন, তাহা হইলে এই সব লোকের কি এত কষ্ট থাকিতে দিতাম। কি করিব ভগবান গরীব করিয়া পাঠাইয়াছেন, দুঃখীর দুঃখ দেখিয়া রোদন করা ভিন্ন অন্য উপায় নাই।”

"শুনিয়াছি জমীদারদের অনেক টাকা, তবু খাজনার জন্য গরীব প্রজাকে এরূপ ভাবে শাসন করে কেন?" চূড়ামণি আর কথা বলিতে পারিত না। চক্ষের জলে তাহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইত। চূড়ামণি আর জমীদারদের গৃহে যাইয়া কাহারও জন্য উপরোধ অনুরোধ করিতে সাহস করিত না। কারণ গরীব বৃদ্ধ "হারু কলুর" জন্য একবার অনুরোধ করিতে যাইয়া চূড়ামণি জমীদার বাবুর নিকট অকথ্য ভাষায় গালাগালি খাইয়াছে। চূড়ামণি জমিদার বাবুকে বলিয়াছিল, "হারু কলু গরীব ও বৃদ্ধ, তাহার খাটিয়া খাইবার শক্তি নাই; তাহার ভিটার খাজনা তিন বৎসরের ১৫৲ টাকা বাকী পড়িয়াছে। গরীবকে অর্দ্ধেকটা মাপ করিয়া দিন।"

ইহাতেই জমীদার বাবু ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া গালাগালি করিয়াছিলেন। সেই হইতে চূড়ামণি জমীদারের বাড়ীতে আর কখনও যাইত না।

আমার মাতামহী মৃত্যু সময়ে—তাঁহার একমাত্র পুত্রকে চূড়ামণির হস্তে সমর্পণ করিয়া বলিয়া গিয়াছিলেন— "বাবা চূড়ামণি! এই বালকটীর ভার তোমার উপর দিয়া গেলাম।" সেই দিন হইতে চূড়ামণি আমার মাতুলকে সর্ব্বক্ষণ স্নেহদৃষ্টিতে দেখিত। আমার একমাত্র মাতুল চূড়ামণির ইঙ্গিতে চলিতেন। বাল্যকাল হইতে চূড়ামণি নিজের মত

করিয়া আমার মাতুলকে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। যৌবনের সীমা অতিক্রম করিতে না করিতে, আমার মাতুল যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইলেন, তখন চূড়ামণি চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "তোকে যে বামুন খুড়ী আমার হাতে সমর্পণ করিয়া দিয়া গিয়াছিল; আমাকে ফেলিয়া তুই কোথায় যাস্‌রে।" চূড়ামণির ক্রন্দন দেখিয়া সেদিন গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা কাঁদিয়াছিল। চূড়ামণির সেদিনকার সেই ক্রন্দনের কথা শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমার মনে থাকিবে। আমার মাতুলকে চূড়ামণি এত স্নেহ করিত যে, তাহার মৃত্যুর পর দিন হইতেই চূড়ামণি সংসারে বীতশ্রদ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। ইহার পর হইতেই চূড়ামণিকে বলিতে শুনিতাম, "সংসারটাকে সত্য ভাবিও না বাবা, এটা একটা প্রকাণ্ড মিথ্যা; স্বপ্নের সঙ্গে এই সংসারটার বিশেষ কিছু প্রভেদ নাই, স্বপ্নটা অল্পক্ষণ স্থায়ী। আর আমাদের এই জাগ্রতাবস্থার স্বপ্ন তদপেক্ষা কিছু বেশীক্ষণ স্থায়ী।"

হায়! বাল্যকালে এই চূড়ামণি মামার নিকট কত উপদেশ পাইয়াছি। চরিত্রগঠনের জন্য কত তিরস্কার খাইয়াছি। চূড়ামণি মামা কতদিন বক্ষে করিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে লইয়া গিয়াছেন; চূড়ামণি মামার স্ত্রী কত উপাদেয় দ্রব্য স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইয়াছেন। ইহার স্নেহ, ভালবাসা

এ জীবনে ভুলিবার নয়। পিতামাতার স্নেহ হারাইবার পরেও চূড়ামণি মামার স্নেহে কতদিন তাপিত প্রাণ শীতল হইয়াছে।

চূড়ামণি মামার সহধর্ম্মিণীর মৃত্যুর দুই সপ্তাহ পরে তাঁহাকে আর কেহ দেখিতে পাইল না। চূড়ামণি মামার সহধর্ম্মিণী মৃত্যু সময়ে স্বামীর চরণধূলি মস্তকে লইতে লইতে বলিয়া গিয়াছিলেন "তুমিতো আর গৃহে থাকিবে না তাহা আমি জানি। কিন্তু দরিদ্র অনাথেরা তোমার জন্য কত কাঁদিবে। দাশরথীর উপর তাহাদের ভার দিয়া যাইও।" দাশরথীকে ডাকিয়া চূড়ামণির স্ত্রী বলিল, "বাবা চিরদিন আমাকে গর্ভধারিণীর ন্যায় দেখিয়া আসিয়াছ, আজ মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞা কর যেন অনাথদিগকে ফেলিয়া পালাইবে না।"

একদিন আমি মাতুলালয়ে চূড়ামণি মামার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য যাইয়া দেখি, দাশরথী চূড়ামণির ঘরের মেঝেয় পড়িয়া ছটফট করিতেছে। সজোরে মাথার চুল ধরিয়া টানিতেছে। কখনও নিজের বুকে নিজে ঘুসী মারিতেছে; কখনও চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে। কখনও বলিতেছে "মা বেটীই আমাকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়াছে; তা না হইলে কেমন করিয়া ফেলিয়া পলাইতে দাশরথী দেখিয়া লইত।"

আমাকে দেখিয়াই দাশরথী সজোরে বুকে চাপিয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল "তোর মামা আমাদিগকে জন্মের জন্য ফেলিয়া পলাইয়াছে।"

হায়! সে দিনের কথা লিখিতে গেলে আজও চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যায়। সেই দিন হইতে নানাস্থানে "চূড়োমামার" অনুসন্ধান করিয়াছি, কোথাও পাই নাই। জানি না কি পুণ্যে আজ তাহার ক্রোড়ে মাথা রাখিতে পাইলাম।

কতক্ষণ তাঁহার ক্রোড়ে মাথা রাখিয়াছিলাম কিছুই মনে নাই। আমি তাঁহার ক্রোড়ে নিদ্রিত ছিলাম কি জাগ্রত ছিলাম; আমার চেতন ছিল কি অজ্ঞান অবস্থায় ছিলাম— আনন্দে আত্মহারা হইয়া বাহ্যজ্ঞানকে হারাইয়াছিলাম— কি দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া হতচেতন হইয়া তাঁহার ক্রোড়ে পড়িয়াছিলাম কিছুই আমার মনে নাই। দুই বাহুতে সস্নেহ আলিঙ্গন করিয়া যখন আমাকে সন্ন্যাসী উঠাইলেন, তখন বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল; চাহিয়া দেখিলাম সেটা গোয়ালন্দ ঘাট। যাত্রীরা সকলেই নামিয়া গিয়াছেন আমি জ্ঞানে আসিলাম কি অজ্ঞানে আসিলাম জানি না; কে যেন আমাকে শূন্যে ষ্টীমার হইতে তুলিয়া আনিয়া গোয়ালন্দ

মেলে বসাইয়া দিল। সন্ন্যাসী আমার মস্তক চুম্বন করিয়া বলিল, "বাবা! এখনই গাড়ী ছাড়িয়া দিবে, আমি চলিলাম। আশা রাখিও না, দুঃখ পাইবে না, আসক্তি রাখিও না, কষ্ট হইবে না।"

গাড়ীতে মুখ গুঁজিয়া আমি পড়িয়া রহিলাম। সন্ন্যাসীর জন্য আমার প্রাণ বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

সেদিনকার অবস্থা ভাষায় বর্ণনা করিবার নয়।

জনকোলাহলপূর্ণ, পুতিগন্ধময়, নানা প্রলোভনের আকর, বিংশ-শতাব্দীর লীলাস্থল, মিথ্যা প্রবঞ্চনা কপটতার আবাস ভূমি কলিকাতা নগরীতে সন্ধ্যার সময় পৌঁছিয়া মনে হইল হায়! কোথায় "শিলং-পাহাড়।" কিন্তু কে যেন পশ্চাৎ হইতে মধুর কণ্ঠে বলিল, "বাবা আশা রাখিও না, দুঃখ পাইবে না, আসক্তি রাখিও না, কষ্ট হইবে না।"

সমাপ্ত।